শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনী

সম্পাদনা

ডক্টর প্রদ্যোত সেনগুপ্ত
অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্র স্থ না
৮বি, কলেজ রো
কলিকাতা—৭০০০০৯

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ ঃ দেশবিদেশের ভৌতিক কাহিনী

বিদ্যাসাগরমশাইয়ের পর বাংলা সাহিত্যে প্রথম ভৌতিক গল্প লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর একমাত্র ভৌতিক কাহিনী তিনি অসমাপ্ত রেখে মারা যান। পরে তাঁর দৌহিত্র দিব্যেন্দু সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তা প্রকাশিত হয়। তাই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনী সংকলনে বঙ্কিমচন্দ্র অনিবার্য ভাবেই আমাদের অনন্য আকর্ষণ তবে বাংলা সাহিত্যের নদীপ্রবাহের সমস্ত ধারার ন্যায় ভৌতিক উপাখ্যান রচনায় রবীন্দ্রনাথই প্রকৃত পথিকৃৎ। ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা ও নিশীথে এক অনবদ্য সৃষ্টি। মনিহারা গল্পটি কবি কুচবিহারের রানীকে শুনিয়েছিলেন। রানীজি ভূতের গল্প শুনতে খুব ভাল বাসতেন। গল্পটি পরে রবীন্দ্রনাথ গল্পাকারে লিপিবদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথের নিশিথে একটি ভূতহীন ভৌতিক গল্প। মানসিক উত্তেজনা, অনুতপ্তচিত্ত ও অসুস্থমানসপ্রকৃতি এক ভৌতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। প্রমথ চৌধুরী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্র রায় প্রমুখ লেখকগণ ভৌতিক সাহিত্যের মরা গাঙ্গে এক জোয়ার সৃষ্টি করেছেন। সেই ধারার অনুসরণে আজ ব্রতী হয়েছেন মুসতফা, অতীন, শীর্ষেন্দু প্রমুখরা। তবে ভারতীয় সাহিত্যে ভৌতিক অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বেদের কাল হতে। অথর্ব বেদেও ভূতের কথা আছে।

গ্রীক ও রোমক সাহিত্যে আমরা ভূত ও অতিপ্রাকৃতের প্রভূত বর্ণনা দেখতে পাই। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩০ অব্দে রচিত "ওডেসিতে" আমরা ইউলিসিসকে বারংবার ভৌতিক অস্তিত্বের মুখোমুখি হতে দেখি। সম্ভবত: সমস্ত মহাকাব্যেই ভৌতিক বা অতিমানবিক ঘটনা মহাকাব্যের মূল সুরের অনুগামী। সেক্সপিয়রের জুলিয়স সিজারে ভূতকে ব্রুটাসের সম্মুখীন হতে দেখেছি। সিজারের মর্মান্তিক মৃত্যুর পূর্বে ভূতের মুখে ভবিষ্যত বাণী শুনেছেন সিজার পত্নী Calphurnia। আবার সেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটকে ভৌতিক দৃশ্যপট নিশ্চয় নাটকটির এক অনন্য আকর্ষণ। চসারের লেখায় মধ্যযুগীয় ব্লাক ম্যাজিকের উত্তরন ঘটে।

ভার্জিলের লেখায় আমরা ভৌতিক বর্ণনায় শিহরিয়া উঠি। "এনিডে" আমরা যে ভৌতিক বর্ণনা পাই তা আধুনিক ভৌতিক গল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

"Twas in the dead of night when sleep repairs
Our bodies worn with toils, our mind wi h cares
When Heotcr's ghost before my sight appears ;
A bloodly shroud be seemed and bathed in tears.

উত্তর ইউরোপের হিমেল বাতাসে ভৌতিক অস্তিত্বের প্রাদুর্ভাব এক অনাস্বাদিত পূর্ব সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা। স্কাণ্ডিনেভিয়া হতে হল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত নিসর্গ প্রকৃতির নিঃসীম আঙ্গিনায় বিহারী মানুষের রাজ্যে ভৌতিক গল্পের জমাট বাজার। সার্লকহোমসের স্রষ্টা পুরুষ কোনান ডয়েল সাহেবও ভৌতিক অস্তিত্বের এক উজ্জ্বল প্রবক্তা। ইংলণ্ডের রোমান্টিক যুগের কবি কল্পনায় ও স্পর্শ করে স্যার ওয়ালটারস্কটের রচনায় ইতিহাসের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভৌতিক অস্তিত্বের এক অনস্বীকার্য অনুভূতির শিহরণ জাগে।

পরবর্তী কালে কবি "ওয়ালটার ডি লা মেয়ার" তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনায় রহস্য ও অতি প্রাকৃতকে এক উল্লেখ যোগ্য স্থান দান করেন। কবির কানার্টানী

যাদুও অনির্দেশ্যতাময়তার মধ্যে ভৌতিক ইঙ্গিত দেখা যায়। হার্ডির লেখাতেও ভৌতিক অস্তিত্ব মাঝে মাঝে উকিঝুঁকি মারে। তবে ইংরাজী সাহিত্যে ভিক্টোরিও যুগের শেষ হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত যত ভৌতিক কাহিনী লেখা হয়েছে তার মধ্যে Walter De La Mare অনন্যতার দাবি রাখে। তবে তাঁর লেখায় ডিকেন্স, লে ফার্ম ও হেনরি জেমস্-এর ভৌতিক গল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিপলিং সাহেবের নাম এদেশে খুবই পরিচিত। তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা বিধৃত যুদ্ধ কাহিনীগুলি ভৌতিক আবহাওয়া দ্বারা সতত: আপ্লুত।

তাই যুগে যুগে ভূত দেখেছেন হাজার হাজার মানুষ। যাঁরা দেখেছেন তাঁদের দলে আছেন দিগ্‌বিজয়ীবীর হতে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা মহারাজা। আছেন ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক। ইগলুবাসী এস্কিমো হতে অত্যাধুনিক লণ্ডনবাসী সকলেই ভূত দেখেছেন। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এমন সময় এমন পরিবেশেই ভূত দেখেছেন যে তা প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না। ভূত দেখা যায় গভীর রাত্রে, উত্তেজিত স্নায়ু মণ্ডলীতে একলা চলা পথে অথবা ভাঙা রাজবাড়ীর ততোধিক পাড় ভাঙা কাজল কালো দিঘিকার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া অন্ধকার খানাখন্দ ভরা গলিপথে। ভূত দেখা যায় চামচিকা বাদুড় অধ্যুষিত পরিত্যক্ত রুদ্ধদ্বার রাজপ্রাসাদের তিমিরান্ধকার গবাক্ষের গহ্বরে।

ইংরাজী সাহিত্যে ভৌতিক গল্পের পটভূমিকায় Haunted House অর্থাৎ পরিত্যক্ত হানাবাড়ীর অবদান অসামান্য। আমাদের দেশের শত সহস্র ধ্বসে পড়া জমিদার বাড়ীর দেউল মন্দির আর প্রাসাদকে কেন্দ্র করে বহু ভৌতিক উপন্যাস রচিত হতে পারে। ইতিহাসাশ্রয়ী ভৌতিক আখ্যান আমাদের অধিক আকৃষ্ট করে।

তাই সুদূর মধ্যভারতের নির্জন প্রান্তর পেরিয়ে ক্ষুধিত পাষাণের আর্তক্রন্দন আমাদের হাতছানি দেয়। ভগবানে বিশ্বাস করেন অনেকেই। কিন্তু ভূতে বিশ্বাস করেন সকলেই।

তাই ভূত প্রসঙ্গে আর অধিক অগ্রসর না হয়ে জনসনের ভাষায় বলি "all arguments are against it but all belief is for it"

শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনী আজ প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: প্রদ্যোত সেনগুপ্ত মশাই। তাঁর কাছে আমরা সম্পাদনা ও অনুমতি সংগ্রহের ন্যায় দুরূহ কাজ সম্পাদনের জন্য একান্তভাবে ঋণী। এছাড়া সপ্তর্ষি সহ-সম্পাদক পিনাকীরঞ্জন গুহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আমাদের সাহায্য করেছে। আমাদের কর্মী ভক্তি ভূষণ সরকারকে তার নিরলস শ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

শতবর্ষের ভৌতিক গল্পের গল্প নির্ব্বাচনে অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের স্বনির্বাচনের সুযোগ পাওয়া গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহু বিচার বিবেচনার পর শ্রেষ্ঠ লেখাটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র, হরিনারায়ণ চট্টো:, আশাদেবী ও তারাদাস বন্দ্যো: কে অনুমতি ও পরামর্শ দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। আরও জানাই যে আমাদের "বিদেশী ভৌতিক কাহিনী" প্রকাশের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে।

ভূমিকা

অতিপ্রাকৃত চেতনা মানুষের একটি চিরায়ত সংস্কার। অনেক সময় তা মজ্জাগত স্বরূপ-পরিচয়ের মতোই লালিত হয়। অতিপ্রাকৃত চেতনাকে কেন্দ্র করে রচিত গল্পের মধ্যেও ওই একটি স্বকীয় পরিবেশের স্বাতন্ত্র্য আছে, তার নিজস্ব পরিবেশ ও প্রভাবের আবেদন আনুষঙ্গিক রূপ নিয়ে আমাদের অনুভূতিলোকে যখন সমুপস্থিত হয়—তখন তা সহজেই আমাদের ভাবলোকে আন্দোলন এবং রসস্পন্দন সৃষ্টিতে সার্থক হয়। মানুষের সবচেয়ে প্রবল ও আদিম অনুভূতি হল অজানিতের ভয় এবং সেই ভয়ানক রসের রসরহস্যকে সে যুক্তিমার্গীয় পথে সব সময় ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণে সমর্থ হয়নি। যুক্তির অগোচরে এই ভয়প্রবণ মানসিকতার মধ্যে একজাতীয় চিত্তাকর্ষক পূর্ব্ব-প্রস্তুতি ভৌতিক গল্পের মধ্যে স্বাদিষ্ট অনুভব এনে দেয়। কাব্যরসাস্বাদের মতো নিবিড়তায় তখন ভৌতিক গল্পেরও কুশলী বৈচিত্র্য অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। সংগতি ও অসংগতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষের মধ্যে আপাত বৈপরীত্য তখন লুপ্ত হয়ে যায়। বিশ্বাস প্রবণতার যাদুশক্তিতে তখন মনোলোকের যে বৃত্ত রচিত হয়—মনের উন্মুখতায় সেখানে সমস্ত 'সিচুয়েসনেরই' স্বতন্ত্র স্বাদ আসে। সংশয়দীর্ণ চিত্তের নানা কুটিল জিজ্ঞাসা বা উদ্যত যুক্তির আলো সেখানে অচল। অবিশ্বাসমুক্ত মানিয়ে নেওয়া মন সেখানে মুগ্ধ মানসিকতায় রূপান্তরিত হয়। প্রত্যক্ষের অগোচর বাস্তব কায়াহীন একধরনের ধূম্র চেতনার মধ্যে মানুষ নিজের নিঃসীম নিঃসঙ্গতাকে স্থাপন করে—অবাস্তব সংসার সেই পরিবেশে মনের গহনে একটা অভিভূত শঙ্কা-শিহরণ অথচ ভয়ঙ্কর করুণ শিহরণ সৃষ্টি করে। মানুষের মনের এই ধূম্র ছায়া-প্রীতি তাই অহেতুক রোমান্টিক রসে আদ্র' হয়ে শিল্পরসের ঔজ্জ্বল্য লাভ করে—এক দুর্জ্ঞেয় অপ্রত্যক্ষ রহস্য অনুভূতির অধীন হয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এই জাতীয় চিরন্তন দুর্বলতায় মানুষ প্রায় ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও সমধর্মী। আলোছায়ার বিচিত্রিত এই রসরহস্যের জগতে বুদ্ধিদীপ্ত অতি আধুনিক মনও খানিকটা অসহায়ত্ব অনুভব করে। এই অসহায়তাজনিত অহৈতুক ভয় অনির্দেশ্য আতঙ্কের প্রতীক। অতিপ্রাকৃত গল্প বা অলৌকিক কাহিনীর মধ্যে এই প্রতীক দ্যোতনাকেই শিল্প রসসংস্কার রূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ভয়ের উদ্দীপন ভাব রসাদর্শের সমুন্নতিতে যদি ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, অতি-লৌকিক গল্প তাহলে সূক্ষ্ম রসপরিণামী হতে পারে। অতি-প্রাকৃতকে নিরস্ত কল্পনার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার না করে জীবন ও মৃত্যুর চিররহস্যকে রোমান্টিক কল্পনায় উজ্জীবিত করে তোলা চলে। অতি-প্রাকৃত বা অপার্থিব চরিত্র এবং ঘটনাবিন্যাস, অপ্রত্যাশিতের সমন্বয় তখন রসবৈচিত্র্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। বাহ্য বস্তুর বিরোধিতা সত্ত্বেও কল্পলোক সম্ভব যে নির্বিশেষ রোমান্টিক রস উদ্ভূত হয় তার উৎসভূমি মানুষের কল্পলোক। এই কল্পনার উদ্ভব জ্ঞাত-অজ্ঞাত, পরিচিত-অপরিচিত প্রকৃত আদর্শ, জাগতিক-আধ্যাত্মিক, প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের সংঘাতোত্থিত। প্রকৃতি বা স্বভাবের নিয়ম বহির্ভূত হলেই তা অতিপ্রাকৃত। অর্থাৎ—"That is above nature

transcending the powers or the ordinary course of nature, এবং 'existing by, due to, or exercising powers above the forces of nature, outside the sphere of natural Law'. মানুষের ধর্মীয়-তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক পর্যালোচনার বা চর্যার মধ্যেও এই অতিপ্রাকৃতের স্বরূপ সন্ধান মেলে ব্যাপ্তার্থে অতিপ্রাকৃত ধর্মীয় রসসংস্কারেরও অঙ্গীভূত। তাই অতিপ্রাকৃত ভাবসংস্থান মানুষের ধর্মে সাহিত্যে - জীবন ধারণায় ও চর্যায় নানাভাবেই বিশেষ স্থান গ্রহণ করে আছে। ধর্মপ্রভাব যুক্ত হয়ে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনাই প্রাচীনকালে মানুষকে বিস্ময়াবহ করে তুলত – কিন্তু প্রশ্নহীন আনুগত্যে সে বিস্ময় ধর্মোপলব্ধির সংগে আত্মলীন হয়ে গেছে। প্রাচীন ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীতে এই জাতীয় 'মিরাকেল' এর সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় এবং Miracles belong to the level of popular religion, which is the same every where and at all times ' উপনিষদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই 'মিরাকেল'—এর প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ কমে আসছিল। প্রথম পর্যায়ে এই দুর্জ্ঞেয়-আকর্ষণের মনোভংগী ভীতিরস থেকে উদ্ভূত ছিল—পরে তা ক্রমসংবদ্ধ দর্শনের অভিমুখী হয়ে পড়েছে। 'মিরাকেল' এব প্রকৃতি সম্পর্কহীন কল্প-বিস্ময় রস 'অতি প্রাকৃতে' প্রকৃতি-সম্পর্কিত বস্তুতে কাল্পনিক বিস্ময়বোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভয় মিশ্রিত রোমাঞ্চ বা ভয়-ভীষণ বীভৎসতা।

অতিপ্রাকৃতও রহস্যময়। তবে এই রহস্যময়তার প্রকার-প্রকরণের মধ্যেও গুণগত লক্ষণীয় পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। এই রহস্য ভৌতিক আতঙ্কসঞ্জাত হতে পারে, বিজ্ঞান-ভিত্তিক হতে পারে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকায় এ প্রসংগে বলা হয়েছে : "At first a tale of wonder and terror concerned largely with supernatural matters, it later, became a subsidiary of romance · · · To day a mystery story is loosely, any story containing a mystery. It may be, and frequently is, a tale of horror and terror but it may also be a pseudo – scientific fantasy"

১. "Romanticism is the endeavour, in the face of growing factual obstacles to achieve, to retain, or to justify that view of the universe and of human life which is produced by an imaginative fusion of the familia and the strange, the known and the unknown, the real and the ideal, the finite and the infinite, the material and the spiritual, the natural and supernatural." - The Romantic Quest : H. N. Fairchild.

অতিপ্রাকৃত রসের মধ্যে ভৌতিক গল্পের স্বাতন্ত্র্য রসাস্বাদ আছে এবং তা নিরঙ্কুশভাবেই অতিপ্রাকৃত আবহাওয়ার অধীন। ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম যুগে ভৌতিক কাহিনীর আবির্ভাব ঘটলেও মধ্যযুগে গল্পগুলি স্বাতন্ত্র্যে রসমণ্ডিত হয়। একদা অতিপ্রাকৃত রস 'গথিক' উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য রসবৈশিষ্ট্যে উপাদান-রূপে

গৃহীত হয়েছিল। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে: "The literature of ghosts is as old as time. The middle after took over the dark heritage of antiquity and amplified it with academically formulated magic and cabalism. Perhaps the ghostly angle complicated by devil, ghouls, ruined castles, subterranean passages and such like medieval claptrap began to emerge most clearly as department of romance in the 19th century. with what is called the Gcethic tale." বাংলা সাহিত্যেও এই ভৌতিক গল্প আসর পেতেছিল স্মরণাতীত কালে। যুগ পরিবর্তনের সংগে সংগে মানুষের সংস্কার ও দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনশীল মানসিকতার সংগে সংগতি সম্পর্ক বজায় রেখে অতিপ্রাকৃত ভৌতিক রসের গল্পও প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের হাতে নব তাৎপর্য লাভ করেছে। আধুনিক জগতের মনোবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির সংগে সম্পর্কান্বিত হয়ে ভৌতিক গল্পও অভিনব অর্থ গৌরবের ব্যঞ্জনায় তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাহিনীতে তন্ত্র-মন্ত্র জিন-ভূত-পরী ইত্যাদি অসম্ভাবী ঘটনার যে উল্লেখ আমরা পাই তা বাস্তব জীবনের সংগে সর্বতোভাবে সমন্বিত হয়ে হয়তো দেখা দেয়নি। লোকজীবন ও লোকসমাজের নানা আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস বিশিষ্ট লৌকিক উপাদান হিসেবে ক্রমশ: সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়েছে। সমাজের আভ্যন্তর বাস্তবতা সাহিত্যে যত গভীর ভাবে প্রতিফলিত হতে লাগল ততই লোকায়ত উপাদানের ব্যাপকতর প্রয়োগের মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের ভাবজীবনকে প্রত্যক্ষ পন্থায় সাহিত্যে উপস্থাপিত করার রীতি আধুনিক সাহিত্যের সম্পন্নতাকেই সূচিত করে। মানব মনস্তত্ত্বের সংগে এই লৌকিক ভাব বা রসসংস্কারকে সমন্বিত করে আপাত অলৌকিককেও স্বাভাবিক রসতাৎপর্যে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে। মধ্যযুগীয় রোমান্স কাহিনীগুলির অতিপ্রাকৃত রসের সংগে আধুনিক অতিপ্রাকৃত রসের এখানেই পার্থক্য—"Mcre recently they have began to develop into abnormal psychology, using the double self, the death instinct, dream symbolism and the more curious manifestations of ambivalence in there stories to give them new meanings and greater conviction.'—Great Tales of Fantasy and Imagination: Philip Van Daren Stern. আধুনিক সাহিত্যে অতীন্দ্রিয় প্রসংগ, দেবদেবীর অস্তিত্ব পূর্ব নির্ধারিত লৌকিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং সেই আদিম সংস্কৃতির স্বরূপধর্ম মানুষের ভাগ্যকেও একটি বিশেষ 'মোটিফ' হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। যাদুবিশ্বাস, লোকাচার-ঘটিত ক্রিয়াকলাপ, ভৌতিক প্রসংগ, ডাইনীতন্ত্র লোকবিশ্বাসকে উদ্দীপ্ত করেছে, মনস্তত্ত্বের সংগে এই বিশেষ লোক সংস্কারের সংযোগ-সেতু রচনা করেছে আবার সাহিত্যে লৌকিক উপাদানেরও লক্ষণীয় বিস্তারকে সম্ভবপর করে তুলেছে। লোকায়ত-জীবন ও উৎসের সংগে সমন্বিত করে বিচার করতে অতিপ্রাকৃত চেতনারও জীবনমুখী সমাজতত্ত্বগত পর্যালোচনা সম্ভবপর।

২

ভৌতিক বিশ্বাস (Ghost belief) লোকবিশ্বাস এবং লোক সংস্কারের একটি দৃঢ়মূল সংস্কার। এই লৌকিক সংস্কারের শ্রদ্ধাশীল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের মনের শত স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও এক সমধর্মী বিচিত্র জগতে বিহারের কথাই বড় হয়ে ওঠে। এক দুর্জ্ঞেয় অপ্রত্যক্ষ রহস্যানুভূতির প্রতি অচ্ছেদ্য আসক্তিই বড় কথা হয়ে ওঠে। বুদ্ধিদীপ্ত উগ্র আধুনিক মনও কিঞ্চিৎ অসহায় হয়ে পড়েন। সমাজের যে সুনির্দিষ্টতার বাতাবরণে মানুষের বাস, সেখানে লোকবিশ্বাসও ধর্মেরই অন্তর্লীন হয়ে যায়। ভৌতিক বিশ্বাস এবং আশা সম্পর্কীয় সংস্কার আদিম যুগ থেকে লোক সমাজে চিরপ্রবাহিত ধারা। পৃথিবীর সব জাতি এবং জনগোষ্ঠী একে একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি রূপে চিহ্নিত করে লোকায়ত সমাজে অশুভ আত্মার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। লোকায়ত সমাজ—অনেক সময় উচ্চ সমাজও একে ভূত-প্রেত বা দৈত্য দানো রূপে কল্পনা করেছে। বাংলা ছড়াতেও এই, 'অপদেবতা'র প্রসঙ্গোল্লেখ লোকায়ত সংস্কারকেই সমর্থন করে :

১ "ভূত আমার পুত শাখ্‌নী আমার ঝি,—
মাছ-পোড়া দিয়ে ভাত খেয়েছি করবি আমার কি ?
(প্রচলিত কথান্তর : 'পেত্নী আমার ঝি,। রামলক্ষ্মণ
বুকে আছে করবি আমার কি ?')
২ "ঠিক দুপ্পুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা,
পায়ে পড়ল রসি, হাটু গেড়ে বসি।"

সনাতন সমাজে পুরুষকারের অনিবার্য ব্যর্থতা একদা ঝাড়-ফুঁক বা ভেল্কির আশ্রয়কে উৎসাহিত করেছিল। আবার সমাজ যখন সংহতিমুখীন তখন বহু জটিলতায় গোষ্ঠীচেতনার মধ্যে ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্যের সুর যথা প্রভুত্বে উন্মুখ হতে চাইল, তথা মৌখিক সাহিত্যশাখায় মারণ, উচাটন বা বশীকরণের মন্ত্রতন্ত্রের মধ্য দিয়েও লোকসংস্কারের একটি বিশেষ ধারাকেই আমরা প্রবহমান দেখেছি। সেখানে সংশয়, অবিশ্বাস বা তর্কের উদ্ধত প্রশ্নকে সাময়িকভাবে সরিয়ে রেখেছি। দেহবন্ধন, মচ্‌কা ঝাড়া, চোর ফেরানি, বাটি চালা, হাতচালা, ভূতদংশন ঝাড়ন, ডাইনী ঝাড়া, তেলপড়া, জলপড়া, বাণমারা, দিদিমা-ঠাকুরমাদের মন্ত্র, মেয়েলি ব্রতের ফুসমন্তর ইত্যাদি নানা অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে 'ক্রিয়া চালানোর মধ্যেও প্রকাশ্যে বা গোপনে অতি-লৌকিক সংস্কারের পোষকতা লক্ষ্য করা যায়। 'বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও নিখাদ ভয়ের রাজ্যে' মানুষের মানসিকতা স্ব-স্থিত। হেতু নির্ণয় বা প্রমাণ উপস্থাপনা এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজন এবং অসিদ্ধ। রসশীল পর্যালোচকের ভাষায়—"মানুষ দৈবে যেমন বিশ্বাস করেনা, আবার অবিশ্বাসও করে না, কিংবা জ্যোতিষ গণনায় এবং ভবিষ্যৎবাণীতে পুরোপুরি আস্থা না রেখেও যেমন হাতটি বাড়িয়ে ধরে, তেমনি ভূত আর আত্মায় বিশ্বাসী না হয়েও একেবারে এই অদৃশ্য অস্তিত্ব-প্রতীতিকে উড়িয়ে দিতে পারে না। মানুষের মজ্জায় ও রক্তের মধ্যে রয়েছে এই কায়াহীন ছায়ার রহস্যময় প্রীতি-আকর্ষণ।"

৩

হিউমের মতে অতিপ্রাকৃত বা মিরাকেল ঘটতেই পারে না। টিণ্ডাল-এর মতে জগতে মিরাকেলের স্থান নেই। যা প্রকৃতিতে ঘটে, যা প্রকৃতির অন্তর্গত —তা-ই প্রাকৃত। অতিপ্রাকৃত অর্থে প্রকৃতিকে যা অতিক্রম করে। যা ঘটে তা-ই যখন প্রাকৃত, তখন অতিপ্রাকৃত ঘটনা অর্থহীন প্রলাপোক্তি বলে কথিত হতে পারে। তবে অজ্ঞাতপূর্ব বা অদ্ভুত হলেই তা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ হয় না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তর্কের মধ্যেও অনিঃশয়িত 'কিন্তু'র অস্তিত্ব হয়তো থেকেই যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'মিডিয়াম' গল্পটির মুখপাত থেকে কিছুটা প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি: "বিজ্ঞানের চোখে ভূতের অস্তিত্ব অচল। পাড়াগাঁয়ের ভূতের ভয় থেকে প্ল্যাঁসেৎ, মিডিয়াম তত্ত্ব, রাত বিরেতে সম্ভব অসম্ভব ছায়ামূর্তি দেখে চমকে ওঠা—এ সব অনেক কিছুই তর্কের উপাদান যোগায়। ভৌতিক অস্তিত্বও ঈশ্বরের মতোই নানা মতবাদে বিড়ম্বিত - সেখানে আস্তিক, নাস্তিক, স্কেপ্‌টিক্ বা অ্যাগনষ্টিক কারুরই অভাব নেই। সোজা কথায়, যুক্তির জগতে ভূতের জায়গা নেই ভূত মানতে গেলে চোখ বেঁধে পিছু হঠতে হয় একেবারে প্যালিয়োলিথিক আদিমযুগে। সুতরাং অশরীরী তত্ত্বে যারা আস্তিক্যবাদী, তাঁদের সংগে আজ আর তর্ক চলবে না—চরম নিষ্পত্তির জন্যে হাতাহাতি করতে হবে।" বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ জগৎকে কতকগুলি প্রত্যয়ের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু বলতে পারা যায় না। এই প্রত্যয়গুলি মানসিক পদার্থ—প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র মানসিকতার মধ্যে ক্রম সজ্জায় সজ্জিত করে আপন আপন জগৎ তৈরী করে নেয়। এই জগৎ বিনির্মাণ প্রসংগে দর্শন শাস্ত্রের শব্দত্রয়ীকে গ্রহণ করলে বিষয়টি অবধারণার সুবিধে হয়। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন পর্যায়ে মানুষের জাগতিক এবং মানসিক পরিপ্রেক্ষিতে জগৎকে পর্যালোচনা করতে দেখা যায়, জাগরণের অবস্থায় জগৎ ও জাগতিক অভিজ্ঞতা সুবিন্যস্ত। স্বপ্নাবস্থায় বিচ্ছিন্ন ও শৃঙ্খলাশূন্য। সুষুপ্তির অবস্থায় জগৎ প্রায় নাস্তিত্বে লীন। আবার জাগরণের মধ্যেও চেতনার কিয়দংশ স্বপ্নমগ্ন থাকতে পারে। কাজেই মানস-প্রক্রিয়ার বৈচিত্র্যের মধ্যেও লক্ষণীয় অতিপ্রাকৃত, অজ্ঞাতপূর্ব বা অদ্ভুতের প্রকাশ ঘটতে পারে—যা সব সময় প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ অর্থশূন্য প্রলাপ বাক্য হয়। মনের নানা পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি বিচিত্র ঘটনা নানাভাবেই আমাদের মনকে আন্দোলিত করে থাকে। চোখ কিংবা মনের ভুল বলে সেক্ষেত্রে স্পষ্টতঃ কোন রায় দেওয়া চলে না। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে জাগ্রত জীবনের অনেক বাস্তব ঘটনারও ব্যাখ্যা চলে না। বর্তমান কাল পর্যন্ত স্বপ্নের উৎপত্তি ও পরিণতি নিয়ে যে তাত্ত্বিক ধারা-নির্দেশ পাওয়া যায়—জীবনের অভিজ্ঞতায় সে স্বপ্নেরও ব্যাখ্যাতীত ভূমিকাকে অনেক ক্ষেত্রে স্বীকার করে নিতে হয়। অজ্ঞাত এবং অদৃষ্টের প্রতিপাদ্যকেও আকাঙ্ক্ষিত সত্য বলে মনে হয়।

কাজেই ব্যাখ্যাতীত পর্যায়ে কায়াহীন ছায়া বা তার নানা অনুষঙ্গের প্রতি মানুষের রহস্যময় প্রীতির আকর্ষণ রয়েছে, যা আপাতযুক্তিতে অচল হলেও সত্য। ভূতের ভয় অবিশ্বাস্য অথচ অনিবার্য মৃত্যু চেতনার সংগে জড়িয়ে আছে। সত্য

২। অন্তভুবন: বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মানেই জীবনের পূর্ণচ্ছেদদ্যোতক কিনা থিওসফিষ্ট সেই তান্ত্রিক চিন্তায় আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা এটুকু স্থূল বক্তব্যেরই বোদ্ধা যে, দেহান্তরের পর আমরা এমনই নির্বিশেষ বা বায়ুভূত যে দৃশ্যমান জগতে অস্তিত্বের পুনরাবির্ভাব সম্ভব নয়। আর দেহের বিলয়ান্তে জাগরূক স্মৃতি যদি অবয়ব ধারণ করে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়ে সামনে দাঁড়ায়—জীবনান্তের অজানা জগৎ বিভীষিকায় ভারী হয়ে ওঠে। ভূতের ভয় মৃত্যুভয়ের সংগে সমার্থক হয়ে আছে। আরও ব্যাপ্তার্থে অজানার বিভীষিকা। জীবনের প্রতি অপরিমেয় মমত্ব আছে বলেই মৃত্যুভয়-প্রসূত কোন ভাবনা বা অলীক প্রতিভাস দেখে শিউরে উঠি, উদ্বিগ্ন হই। আমাদেব আত্মকেন্দ্রিকতা বর্তমানকে স্তব্ধ হতে দিতে নারাজ। অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই প্রসংগটির সুন্দর ব্যাখ্যা করে বলেছেন : "ভূত কি—না অতীত, আর প্রেত মানে সম্যকরূপে গত, পলায়িত। অতএব, বর্তমান যখন হঠাৎ থেমে গেল, তখন ভূত এলো।"

অশরীরী আত্মা, পারত্রিক অবস্থা, ইহলোকে মাঝে মধ্যে প্রত্যাবর্তন এই বিষয়ক চিন্তা বা ধারণার মধ্যে সামান্য প্রায় সকল জাতির মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। মিশর-সুমেরু-ব্যবিলন, ঈজিয়ান গ্রীক, চীন ভারতীয় পারসিক প্রায় সকল সভ্যতার মধ্যেই মৃত্যু পরবর্তী অন্তভূবন বিষয়ে বিশ্বাস ও সংস্কার চলে আসছে, ভূত প্রেত এবং পরলোকে অস্তিত্বের আস্থা একজাতীয় কাল্পনিক শৃঙ্খলার প্যাটার্ণে বাঁধা পড়েছে। লৌকিক অভিপ্রায় ও প্রথার পার্থক্য সংস্কার এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বাতন্ত্র এনেছে। কিন্তু মনে-প্রাণে সেই আদিম প্রত্যয় এবং আতঙ্কের শিহরণ থেকে স্বভাবতই দূরবর্তী সেই আদিম হতে পারিনি। Thompson, R. Cau pbell তাঁর বিখ্যাত 'Semetic Magic' গ্রন্থে এই অপদেবতা-প্রত্যয়কে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করেছিলো। মৃত্যুর পর নরশরীর আত্মা কোনরূপে মূর্তি পরিগ্রহ না করে অদেহী অবস্থায় থাকে। কখনও পৃথিবীর সংগে সম্পর্কহীন নৈর্বক্তিক শক্তি মানুষের অকল্পনীয় শক্তি বা মূর্তিরূপে আবিভু'ত হতে পারে। মৃতকে যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দাহ বা সমাহিত না করলে তাঁর আত্মা সতত সঞ্চরণশীল হয় এবং নানাবিধ মানসিক অকল্যাণের জন্য দায়ী হয়। তাই লোকায়ত সমাজে ভূত-প্রেত প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বশীভূত বা পরাভূত করার জন্য নানা ক্রিয়া-কৌশলের আশ্রয় দেওয়া হয়। পূর্ব বাঙলায় 'পারসী' পূজানুষ্ঠান এই জাতীয় একটি রূপক—অলক্ষ্মী অর্থাৎ যাবতীয় ভূত-প্রেত দৈত্য-দানোর অপশক্তিকে বিদায় দিয়ে সৌভাগ্যের দেবী বা শস্যের দেবীকে গৃহালয়ে প্রতিষ্ঠিত করার আকৃতি লক্ষ্য করা যায়। অতীন্দ্রিয় শক্তির উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে যেমন দেব-দেবী কল্পনা হয়েছে, তেমনি এই একই শক্তির উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে ভূত-প্রেত ইত্যাদির কল্পনাও হয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক শক্তি এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির সমষ্টির কারণে এই জাতীয় যাদু অনুষ্ঠানের লৌকিক রীতি। বাংলা সাহিত্যে গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ী' উপন্যাসটিতে এই জাতীয় লৌকিক অভিপ্রায়ের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। পাটকাঠির ছোট ছোট জলন্ত অংশ নিয়ে ধূম পান, কাশতে কাশতে ভূতের মন্ত্রোচ্চারণ, ভূতপ্রেত সংক্রান্ত বিধিনির্দেশ,

বাগ্দী বৌ মলার ভূত তাড়ানোর বর্ণনা, গুণিন বা সর্দারের মতো বাংলার লোকায়ত সমাজের ওঝা ইত্যাদিরও উল্লেখ আছে

৪

ভূতে বিশ্বাসী বা ভূত প্রত্যক্ষকারীরা ভূত দেখা ব্যাপারটিকে সব সময়েই দৃষ্টিভ্রমাত্মক বলে স্বীকার করতে রাজী নন। দৃষ্টিবিভ্রম ভয়সঙ্কেত—তাই বলে সকল ক্ষেত্রেই তা নয়। পরলোকে অশরীরী আত্মার যে অস্তিত্ব থাকে এবং সেই আত্মা ইচ্ছা করলেই কাউকে অবলম্বন করে মর্ত্যে নেমে আসতে পারে—এ তথ্য প্রমাণেও অনেকে আগ্রহী। পাশ্চাত্য দেশে জজ এডমণ্ড, জেমস্ বার্নস, জে. জে. মোর্স, মিসেস ইমা, এইচ্. ব্রিটো. মাদাম এইচ্. পি. ব্লাভাটস্কি, ভুলকট, অলিভার লজ প্রভৃতি পরলোকতত্ত্ববিদেরা পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা করে এটাই প্রমাণ করেছেন যে, মৃত্যু পরবর্তী পর্যায়ে আত্মাকে প্ল্যানচেট্ প্রভৃতি চক্রমাধ্যমে এনে তার সংগে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিদেহরাজ জনকের সভায় ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে যে ভূতে-পাওয়া গল্পটি আছে—সেটিই আমাদের দেশের তথাকথিত আদি ভৌতিক কাহিনী। ব্রাহ্মণ গৃহেও পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে এক শ্রেণীর অশরীরী আত্মার প্রসঙ্গ আছে। অথর্ব বেদে ভূত-কাহিনীর সংগে ভূত-ছাড়ানো মন্ত্রোল্লেখও রয়েছে। বৈদিক পরবর্তী সংস্কৃত পালি প্রাকৃত সাহিত্যেও ভৌতিক কাহিনীর সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। কিংবদন্তী বা নীতি উপদেশমূলক গল্পে যক্ষ-রক্ষ--ভূত-প্রেত-পিশাচ ইত্যাদি নিবিড় ঔৎসুক্য শিহরণে যথেষ্ট পরিমাণে ভীতি-রসোদ্রেকে সার্থক নয়। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়—"তবে লোমহর্ষক আখ্যান অথবা বীভৎস ঘটনা ভূতের একমাত্র কিংবা প্রধান উপাদান মনে করা ভুল। ভূতের গল্পের রসবস্তু হচ্ছে বর্ণনাকৌশলে ভীতিজনক সোৎকম্প পরিবেশের অবতারণা করে ছায়াতরল বিমূঢ় অনির্দেশ্য আতঙ্কের সৃষ্টি।" নীতি-আশ্রয়ী ও উপদেশাত্মক গল্পে এই জাতীয় প্রগাঢ় ভীতিরসের সামগ্রিকতা অনুপস্থিত। অর্বাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে ভোজ প্রবন্ধের গল্পে পটভূমিকায় হানাবাড়ির প্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও ভীতিরস সৃষ্টির ঐক্য-উদ্দেশ্য ব্যাহত। দু'তিন শত বৎসর পূর্বের আমাদের দেশের 'সত্যমূলক' ভৌতিক কাহিনীর নিদর্শন হিসেবে ডঃ সুকুমার সেন একটি 'পাতড়া'র উল্লেখ করেছেন। 'পাতড়া'টি একটি 'ভাষ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র। এতে দেখা যায় জনৈক রামকানাই দেবশর্মণের শয্যাগতা ভ্রাতৃবধূ শয্যা থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। শেষে বাড়ি থেকে চার-পাঁচ বিঘা দূরে একটি পুষ্করিণীতে তাকে পাওয়া গেল এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হল—"নিশ্চয় করিলাম নিতান্ত ভৌতিক বিষয় নতুবা অচল ব্যক্তি কিমতে আইসে ····· তারপর প্রমাদমৃত্যু নিশ্চয় করিয়া ঔর্ধদেহাদি ক্রিয়া সমস্ত করা গিয়াছে।" ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও ব্যাপারটিকে ভৌতিক ভেবে ব্যবস্থা অনুমোদন করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন— "এতৎ 'লপ.থানুসারেনৈতং ভৌতিকচরণং অত ঔর্ধদেহিকী ক্রিয়া নিষ্কেয়ি শাস্ত্রাৎ প্রজ্ঞা।"

৫

অতিপ্রাকৃত জগৎ কম্বন্ধে কৌতূহল বিশ্বজাগতিক। ফলে এই জগৎ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা বা কল্পনার রোমাঞ্চকর স্বতন্ত্র আকর্ষণ আছে। থিয়সফি বা পরলোকতত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত এই জাতীয় কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনাও ভৌতিক গল্পের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এই বিশিষ্ট তত্ত্বই কখনও মানসমুকুরে অতর্কিত ছায়াভাস, কখনও অবচেতন অনুভূতির নানা অনুষঙ্গ, কখনও বা অদৃশ্য বা অস্পৃশ্য বিচিত্র স্বপ্নরূপে সাহিত্যে চিহ্নিত হয়ে থাকে। একটি অলীক জগৎ সৃষ্টি করে তারই বৃত্তি স্বাভাবিক মানুষকে প্রতিষ্ঠা করা, প্রকৃত ঘটনার চেয়ে তার মূল্য কোন অংশেই ন্যূন হয়। সত্যকার ভূতের গল্প হয়ে ওঠে কল্পনা-প্রসূত ভূতের গল্পই। পাকা লেখকের পরিবেশন নৈপুণ্যে, কুশলী পর্যবেক্ষণের সামর্থ্যেই 'কাল্পনিকও' 'বাস্তবিকের' মতো হয়ে ওঠে। এ বিষয়ের সফলতা বা বিফলতাই অভ্রান্তরূপে লেখকের মুন্সীয়ানা প্রমাণ করে, প্রমাণ করে সেগুলি কতোখানি আর্টের ভেতর ধর্তব্য। কৌতূহল এবং ভয়োদ্রেক অতিপ্রাকৃত ভৌতিক গল্পের প্রাথমিক সর্ত যা তাকে অনিবার্য রস-পরিণামী করে তোলে। ভয়হীন ভূতের গল্প নির্ভয়ে পাঠ করা গেলেও তাতে মানসিক তৃপ্তি মেলে না। রবিনসন ক্রুশো-র লেখক ডানিয়েল ডি. ফো-র Mrs. Veal নামক ভৌতিক গল্পটির কথা হয়তো এই প্রসংগে স্মরণ করা চলে। সেকস্‌পীয়রের হার্মিয়া ভূতের গল্প শুনতে চেয়ে এই ভীতিরসকেই চেয়েছিল :

> "Come on, sit down : come on and do your best
> To frighten me with your sprites, you are
> powerful at it"

এই ভীতি অপ্রত্যক্ষ বা অগোচর বাস্তব কায়াহীনতা থেকে আগত তো, বটেই—নিঃসহায় একাকীত্বের অনির্দেশ্য আতঙ্ক থেকেও এই অসহায়-ভীতিও এর পশ্চাতে কার্যকর। এই ভীতির জগতে সময়ের সীমা অতিক্রান্ত হয়। সূক্ষ্ম মনের অবচেতন সংযোগ, সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা লুপ্ত করণ অদ্ভুতভাবে এর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। এই প্রসংগে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধার করছি : "ডিটেকটিভ গল্প যত আধুনিক হয় ততই ভালো। কিন্তু অতি আধুনিকতা ভূতের গল্পকে খানিকটা দুর্বল করে ফেলে তার ঘটনাকালকে অতীতের দিকে অন্তত: পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পিছিয়ে দিলে রস বেশী জমাট হবার সুযোগ পায়। কিন্তু ঘটনা যতই প্রাচীন হোক্ না, আখ্যানবস্তু এমন কৌশলে প্রস্তুত করতে হবে যে, তার যোগসূত্র গাঁথা থাকে যেন অতি আধুনিক পাঠকের সংগেও। তবে এ বিষয়ে নিয়মের কান বাঁধাবাঁধি নেই, কারণ কোন

বিখ্যাত ভূতের গল্পের ঘটনা ঘটেছে একেবারে আধুনিক কালে।" ভূতের গল্পকেও এক বিশেষ শ্রেণীর ছোটগল্প বলে চিহ্নিত করতে পারি। মানুষের জীবনের বা মনের বিশেষ একটা দিকের উপরেই তা আলোকপাত করে। ভৌতিক গল্পে লেখকের আসল সার্থকতা হল একটি ভৌতিক পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করে ভয় দেখানো। শ্রেষ্ঠ আর্টের মধ্যে সুখ-দুঃখ-শোকের পরিণতিও যেমন স্বতন্ত্র উপভোগ্যতা লাভ করে— ভূতের গল্পের ভয়কেও সেই শ্রেণীর শিল্পসম্মত রস বলে চিহ্নিত করা চলে। লেখকের সংগে তাঁর স্ব-রচিত মনোলোকে প্রবেশ করতে না পারলে এই ভয়ের রসোপলব্ধি সম্ভব নয়।—এই সত্য বা সত্যকল্প জগতের মূল কথা—willing suspension of disbelief; গল্পে ভূত নেই অথচ ভূতের ভয় আছে—'সুপারন্যাচরল' বা প্রিটারন্যাচরল গল্পের ক্ষেত্রে কাম্য প্রত্যক্ষের অতীত শক্তির বা পরিবেশের অনায়ত্ত আতঙ্ক। এ বিষয়ে অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন "এ-পার ও-পার আলাদা, কিন্তু এ-পার থেকে ও-পারে অনায়াস যাতায়াতটাই আসল যাদু। সেই যাদু কার্যকরীও স্থায়ী হতে পারে যদি মনের উন্মুখতা থাকে··· প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, অভিজ্ঞতা ও কল্পনা, সংগতি আর অসংগতি এই দুই বিপরীত খণ্ড জগৎকে যিনি এক অস্পষ্ট অথচ উজ্জ্বল বাষ্পসেতু দিয়ে বাঁধতে পারেন, তিনিই সার্থক স্রষ্টা। তবে এ সেতু বড হালকা, ক্ষুধিত পাষাণের উপর নৃত্যললিত লঘুপদের সঞ্চারটুকু সহ্য করতে পারে। তার বেশি নয়।" (বাংলা অলৌকিক গল্পের নানান দিক) ভৌতিক গল্পের উপজীব্য বা বিষয়বস্তুর মধ্যে মোহিনী দৃষ্টি বিভ্রমের সংগে অনৈসর্গিক মনোবিভ্রমের সুনিপুণ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এই গুণেই কাল্পনিক ভূতের গল্পও সত্যিকার ভূতের গল্প হয়ে ওঠে। কাজেই এক্ষেত্রে প্রয়োজন অপার্থিব ভয়াবহকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে যথার্থ বর্ণনা এবং সংকেতবাহী ইংগিতময়তার নৈপুণ্য। সেকালের ভূতের গল্প বর্ণনা বা বিবৃতি প্রধান—এ কালের ভৌতিক গল্পে আর্টের সুপটু ইংগিতই বড় কথা। অসীম যত্নে, নিপুণ ভাষাশিল্পে অতিপ্রাকৃতের রহস্য আবেষ্টনী সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্বর ও শব্দ অনুচ্চ হয়েও বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে নিরবয়ব জগতেরও রসসম্মত গ্রন্থিমোচন ঘটে।

৩. শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায় আমাকে হেমেন্দ্র কুমার রায়ের "ভূতের গল্পের ইতিহাস" প্রবন্ধটির মূল পাণ্ডুলিপি দিয়েছেন—তাঁর কাছে আমি এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞ।

৪. পাশ্চাত্য সাহিত্যে ভৌতিক উপন্যাসও অপ্রতুল নয় কার্টোমারিয়াটের The Phantam ship, ব্রাম স্টোকারের Dracula জি. পি. আর জেম্‌সের Castle of Ethrenstien.

৬

প্রাচীন মিশর, গ্রীস ও ভারতের বিভিন্ন লেখকেরা এই কায়াহীন অবচেতন জগতের 'যুক্তিহীন নিজস্ব লজিকের দ্বারা অভিভূত হয়ে 'সম্ভাবিত সম্ভবপর'

বিষয়ে নানা গল্প রচনা করেছেন। কল্পনাশ্রিত হয়েও সে গল্পগুলি বিভিন্ন রসাশ্রয়ী—ভয়াল, মধুর, হাস্যরস উদ্রেককারী, (অস্কার ওয়াইল্ডের The Contesville Ghost ও এইচ. জি. ওয়েলসের The Inexperienced Ghost), আবার কখনও অলীক দর্শনও মনোবিকলনের প্রত্যক্ষতায় বৈজ্ঞানিক, কল্পনাভিত্তিক উপাদানও মনস্তত্বসম্মত। চীন ও জাপানে সুলিখিত ভূতের গল্পের সংখ্যা কম নয়। প্রত্যেক দেশের রূপকথাতেই ভূতের জনতাকে মূল্য দেওয়া হয়েছে। জার্মানীতে ডাইনী-তন্ত্রের চর্চা এবং গ্যেটের 'ফাউস্ট'-এর 'Broken Heart' পাহাড় বিখ্যাত হয়ে আছে। শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয়ের কাহিনী নিয়ে লেখা বহু গল্প য়ুরোপে। ইংরেজী রোমান্টিক কবিতার ধারায় (১৭৮০—১৮৩০) ভীতি-অভিপ্রায় বা 'হরর 'মোটিফ', রোমান্টিক কবিতায় 'হরর রোমান্টিসিজম, ওয়র্ডস্বর্থ—কোলরিজ-শেলীর কবিতায় 'হরর-স্টেইনের' পরিচয় পেয়েছি ; Ancient Mariner, Christabel এবং Kubla khan-এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত উপাদানের সূক্ষ্ম রসগত তাৎপর্য লক্ষিত হয়। কীটসের 'imaginative development' এবং 'medieval romantic Tales'—এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত উপাদান Beddoes-এর 'Ghost-lyric' শেলীর Witch of Atlas-এর 'super-terrestrialism', Keats-এর Isabella, the Eve of St. Agnes, Lamia-র মধ্যে অতিপ্রাকৃতের সংস্থান ওয়র্ডস্বর্থ এবং কোলরিজের চেয়ে স্বতন্ত্র—"It is nearly akin to the romantic feeling itself for remoteness, strangeness and beauty. The grosser elements—ghostly, elfin or magical,—are reprcduced by an imaginative process finer and more tactile, no longer circumscribed by the preconception of a tragic power discharged on human life from the invisible world."

প্রসিদ্ধ ইংরেজ ভৌতিক গল্প-লেখকদের মধ্যে স্কট, হ্যারিসন এনসওয়ার্থ, ডিকেন্স, উইলি কলিন্‌স, লিটন, লে ফেন্যু, মিসেস অলিফান্ট ষ্টিভেনসন্‌ টমাস হার্ডি, মাইকেল আর্লেন, আর্নল্ড বেনেট, আর্থার ম্যাচেন, অলিভার ওনিয়ন্‌স, কনান ডয়েল, ফরেস্ট রীড্‌, অল্যারসন ব্ল্যাকউড, এস. আর. জেমস। ফরাসী সাহিত্যে ভূতের গল্পের শ্রেষ্ঠ লেখক জর্জ সাঁৎ, ডুমা, মপাঁসা, বালজাক্‌, গোতিয়ে। জার্মানীও ভূতের গল্পের বিপুল ভাণ্ডারী। ও দেশে যথার্থ সাহিত্য রসাশ্রিত ভৌতিক গল্পের জন্য অতুলনীয় শিল্প-ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি হলো ই. টি. হফ্‌ম্যান। আমেরিকানদের মধ্যে উইলিয়ম অষ্টিস, এড্‌গার এ্যালান পো, লাফকেডিয়ো হার্ণ, মেরিয়ন ক্রফোর্ড, হেনরি জেম্‌স। অতিপ্রাকৃত রস এবং ফ্যান্টাসি রচনায় এডগার অ্যালানপো-র ভূমিকা স্মরণীয়। তিনিই বিশ্ব ছোট গল্পের ইতিহাসে মৃত্যুহিম পরিবেশ, আতঙ্ক পাণ্ডুর শিহরণ, প্রেত-পিঙ্গল রহস্য চেতনা সৃষ্টি করে অলৌকিক রসকে উচ্চতর শিল্পরসে উন্নীত করেছেন। পো শিষ্য ষ্টিভেনসনের মধ্যেও বীভৎসতা ও অসুস্থ মনোবিকার উপস্থিত।

৫. The Supernatural in English Romantic Poetry Dr. Sukumar Dutt.

বাংলা সাহিত্যের বহু লেখক অতিপ্রাকৃত রসকে ছোট-গল্পের একটা বিশেষ আঙ্গিক রূপে মনে করে ভৌতিক গল্প রচনা করেছেন। মনের জল্পনা বা অনুভূতির সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম রূপ দিয়েছেন। ভৌতিক গল্পের আস্বাদ-উৎপাদন-বৈচিত্র্য এবং আঙ্গিকের পাশ্চাত্য রীতি বা কলাবিধি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আলোচ্য 'শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনী' এই পরিচয়ের সূত্রে ও পারম্পর্যে বিধৃত গল্পসংকলন। বাংলা ভৌতিক গল্পের ক্রমবিবর্তিত পরিচায়নে গ্রন্থটির একক মূল্য প্রমাণে ইতিহাস-চেতনারও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সুরু করে একালের শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত বিশিষ্ট লেখকদের ধ্যানধৃত অন্তভুবনের নানা অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, জল্পনা ও কল্পনার মধ্য দিয়ে ভৌতিক অলৌকিক রসের বিচিত্র পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্টেট, তখন দিগম্বর বিশ্বাস সেখানকার সাবজজ্। দিগম্বরের পুত্র তারকনাথ বিশ্বাস 'বঙ্কিমবাবুর জীবনকথা' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের ভৌতিক বিশ্বাস এবং নানা ভৌতিক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুর জেলার নেগুয়া অর্থাৎ বর্তমান কাঁথির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্—তখন কার্যোপলক্ষে ঐ মহকুমার এক জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্রকে রাত্রিবাস করতে হয় এবং প্রেতিনী দর্শনে তিনি ভীত হন। এই প্রেতিনী-দর্শনের কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও বলেছিলেন। 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী' নামে ভৌতিক কাহিনীটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য লিখছিলেন। কিছুটা লিখে তাঁর মৃত্যু হয়। এই লেখাটির মূলে নাকি নেগুয়া মহকুমার সেই প্রেতনীদর্শনের প্রভাব কার্যকরী। দিব্যেন্দু 'নারায়ণ' পত্রিকার ১৩২২ সালে বৈশাখ মাসে রচনাটির মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছিলেন। এই জাতীয় প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করে ছিলেন প্যারিচাঁদ মিত্র। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ছয় বৎসর 'অলৌকিক রহস্য' নামে মাসিক-পত্রিকা সম্পাদন করতেন। পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত ভৌতিক কাহিনী মুদ্রিত করতেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'ভারতী' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক পরলোকতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করতেন। অপার্থিব ভৌতিক গল্প রচনায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কায়াহীনের কাহিনী' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্র বৈঠকী ভূতের গল্প কথনে পারঙ্গম হলেও এদিকে সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হননি। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্মশান বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশ স্মরণ করা যেতে পারে।

বাংলা ভৌতিক গল্পে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে বৈঠকী কথা ভংগীর মধ্যে নিরাসক্ত সমাজ-সমালোচক সব ছিল। তাঁর 'মুক্তামালা', 'লুল্লু', 'বীরবালা' "কথাবৰী' প্রভৃতি রচনায় উদ্ভট তত্ত্ব প্রচারের রঙ্গরসিকতাই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভূতের অস্তিত্ব বা পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতিতে আস্থাশীল ছিলেন না। ভূত সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তে তিনি পোঁচেছেন: "যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়।"

বাংলা গল্পে অতিপ্রাকৃত উপাদানকে স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ক্ষুধিত পাষাণে স্পর্শাতুর একটি ভাবপ্রবণ মনকে তিনি রোমান্টিক মায়ার ইন্দ্রজাল এবং জীবনব্যঙ্গ তার মধ্যে উদাহৃত করেছেন। 'নিশীথে' গল্পে অলৌকিক রহস্যময়তার সংগে মনস্তত্ত্বের সূত্রকে বিরল প্রতিভায় সমন্বিত করে দিয়েছেন। 'মণিহারা গল্পে অতিলৌকিক পরিবেশের মধ্যে বাস্তবের কতকগুলি সত্যকে কবি এনেছেন। মণিমালার স্মৃতির মধ্যে আত্মলীন ফণিভূষণ বস্তুসীমার বাইরে যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপলোকের বাসিন্দা হয়ে পড়েছে। অতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মর্মভেদী আকুতি আর প্রবল স্মৃতি রোমান্টিক অপ্রাবৃত পটভূমিকা সৃষ্টি করেছে। বাইরের জীবিত জগতের উপর একটা আত্মসমাহিত আবরণ মগ্ন চৈতন্যের অস্তিত্বকেই গল্পটির মধ্যে ব্যক্ত করেছে। জীবনের প্রতি সুগভীর আসক্তি এবং কল্পনাশক্তি এর উৎসমূলে কার্যকর।

বাংলা ভৌতিক গল্পের দুই অনন্য সাধক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে প্রেমময় মমত্ব অনুভব করেছেন এবং মধুর রসের কাম্য সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন সেখানে অতিপ্রাকৃত ভয়ঙ্কর রসের সাধনায় সিদ্ধি বিস্ময়কর। এ হল তাঁর লোকসন্ধানী মানসিকতার ফল। জীবন ও মৃত্যুর সমস্ত রহস্য তাঁর অধ্যাত্মবাদী এবং বিশ্বাসপ্রবণ মনকে সদা উজ্জীবিত রেখেছে। শরদিন্দুর গল্পে ভৌতিক রহস্যলোক অদ্ভুতরসের দ্যোতক মৃত্যু ও পুনর্জন্মের তমসাবৃত রহস্যের তিনি ব্যাখ্যাতা। পরশুরামের 'ভূশণ্ডীর মাঠে' ভৌতিকতা আশ্রয়, রঙ্গ ও রূপকের সমাবেশে বাংলা সাহিত্যের এক কালের নীতি ও লতার বিরোধকে রূপায়িত করা হয়েছে। 'ভূতপুরাণে' তারাশঙ্কর ভূততত্ত্ব নিয়ে এক রসঘন গবেষণা করেছেন। 'অক্ষয়বটোপাখ্যানম্' তারই পরিশিষ্ট।

'শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনী' তে বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমুদায় লেখককেই তাঁদের এই বিষয়ক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিসহ আমরা উপস্থিত করেছি। বিশিষ্ট কয়েকজন লেখকের রচনা, যেমন অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, জগদীশ গুপ্ত, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, তুষার কান্তি ঘোষ প্রমুখের রচনা সন্নিবিষ্ট করতে পারিনি।

সংকলনের সামগ্রিকতার ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা বিষয়ে সচেতন থেকেও এই অপূর্ণতার জন্য আমরা দুঃখিত।

যে সমস্ত লেখক তাঁদের লেখা প্রকাশে আমাদের সাগ্রহ স্বীকৃতি দিয়েছেন—তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের গল্পটিকে এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। মণিলালের রচনাটি শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনাটি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার রায়ের আন্তরিকতা এবং আনুকূল্য বিস্মৃত হবার নয়। তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর গল্প-অন্তর্ভুক্তির সম্মতিমাত্র নয়—এই সংকলনের পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের জন্যে তাঁর শুভেচ্ছা আমাদের প্রেরণা দিয়েছে। তারাশঙ্করের বিখ্যাত রচনাটি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করার সম্মতি দিয়ে শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীমতি আশা বসু পরশুরামের 'ভুশণ্ডীর মাঠে' মুদ্রণের সম্মতি দিয়ে সংকলনের পূর্ণতা দিয়েছেন। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর লেখাটির অনুমতির জন্যে আমরা ডঃ উমা রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর রচনাটি তাঁর পুত্র বন্ধুবর তুষারাভ রায়চৌধুরী সংযোজনার অনুমতি দিয়েছেন। দীনেশ সেনের রচনাটির ব্যাপারে তাঁর পরিবারবর্গের সংগে যোগাযোগ করে অনুমতি এনে দিয়েছেন 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার শ্রীযুক্ত শ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়। শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। শ্রীশোভন বসু শরদিন্দুর গল্পটির অনুমতি এনে দিয়েছেন।

ব্যক্তিগতভাবে নানা দিক দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন শ্রদ্ধেয় বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং বিশু মুখোপাধ্যায়। আমার প্রতি তাঁদের স্বতোৎসারিত স্নেহ আমার পরম সম্পদ। লেখক-জীবনী রচনায় শ্রীপিনাকীরঞ্জন গুহ এবং তুষারকান্তি পাণ্ডে মহাশয়ের কৃতিত্ব স্মরণীয়। বন্ধুবর তুষারকান্তি পাণ্ডে এ গ্রন্থের শুধুমাত্র প্রকাশক নন—তিনি বাংলা গল্প সাহিত্যের রসশীল পর্যালোচকও বটেন। তাঁর আন্তরিকতা ও আগ্রহেই এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হল। আমার স্নেহভাজন কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সক্রিয় সহযোগিতাও এ প্রসংগে স্মরণীয়—তাঁরা হলেন অধ্যাপক নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান সুধাংশু মাহাতো, শ্রীমান সম্প্রীতিরঞ্জন মল্লিক, শ্রীমতী মিতা দাস ও শ্রীমতী বন্দনা দাস। প্রকাশনার আনুষঙ্গিক ব্যাপারে পরিশ্রম করেছেন শ্রীভক্তিভূষণ সরকার।

গ্রন্থখানি পাঠকের রসানুমোদন লাভ করলে পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

বিনীত

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

১৩৬৭

অকুতোভয়তা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ফরাসি দেশে দেশুলিয়র নামে এক সদ্বংশ-সম্ভূতা কামিনী ছিলেন। তিনি কবিত্বশক্তি দ্বারা স্বদেশে বিশিষ্টরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, এবং সর্বপ্রকার লোকের নিকট বিলক্ষণ আদরণীয় হয়েন।

একদা তিনি লুসিবেলের কৌন্ট ও কৌন্টেসের (১) সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, তাঁহাদের বাসস্থানে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে, কৌন্ট ও কৌন্টেস, তাঁহার সমুচিত সমাদর ও পরিচর্যা করিয়া কহিলেন, রাত্রিবাসের নিমিত্ত, আপনি ইচ্ছানুসারে গৃহ মনোনীত করিয়া লউন; কিন্তু একটি গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া কহিলেন, কেবল এই গৃহে থাকিতে পাইবেন না; ইহাতে রাত্রিকালে ভূতের আবির্ভাব ও উপদ্রব হয়। কেবল আমরা উভয়ে ঐরূপ ভাবি, এরূপ নহে; এই বাটীতে যত লোক আছে, দেখিয়া শুনিয়া সকলেরই ঐরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। এই গৃহের মধ্যে রাত্রিতে প্রায় সর্বদাই বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। এজন্য, কেহ সাহস করিয়া রজনীতে, এই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না।

এই কথা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, দেশুলিয়র কহিলেন, অদ্য আমি, এই গৃহেই রজনী যাপন করিব, এবং কি কারণে ঐরূপ বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিব। কৌন্ট মহাশয়, তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, আমরা কোন ক্রমে আপনাকে এই ভয়ঙ্কর গৃহে রাত্রিবাস করিতে দিব না; প্রভূত কৌতূহল বশতঃ, এক্ষণে আপনকার এরূপ ইচ্ছা ও সাহস হইতেছে বটে, কিন্তু অকিঞ্চিৎকর কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া, পরিণামে আপনার অসুখ ও যন্ত্রণার সীমা থাকিবেক না; অধিক কি, আপনকার প্রাণসংশয় পর্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব আমি আপনকার এই অসমসাহসিক অধ্যবসায়ে কোন মতে অনুমোদন করিতে পারি না।

এই রূপে তিনি অনেক বুঝাইলেন ও অনেক ভয় দেখাইলেন, কিন্তু দেশুলিয়র কোন ক্রমেই বিচলিত হইলেন না। কৌন্টেসও তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন ও বিস্তর বাদানুবাদ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। দেশুলিয়রের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, লোকে সচরাচর যে ভূতের গল্প করে ও ভূতের উপদ্রব বর্ণনা করে, সে সকল নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক ও কুসংস্কার জনিত; দুর্বলচিত্ত লোকেরাই তাদৃশ কল্পিত বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই সংস্কার বশতঃ, কিছুতেই তাঁহার সাহস সঙ্কুচিত বা ব্যতিক্রান্ত হইল না। তদ্দর্শনে, কৌন্ট ও কৌন্টেস, ভয় ও দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, যথোচিত বিনয় করিলেন, ভৎসনা করিলেন, দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে অবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে বিরত করিতে পারিলেন না; অবশেষে, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অনন্তর, দেশুলিয়র, এক পরিচারিকা সমভিব্যাহারে, শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং পরিচ্ছদ পরিহার পূর্বক, পল্যঙ্কে আরোহণ করিয়া, পরিচারিকাকে

(১) কৌন্ট—ফ্রান্স প্রভৃতি ইওরোপীয় জনপদে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের পদবী বিশেষ।

কহিলেন, পল্যঙ্কের শিখরের দিকে একটি বড় বাতী জ্বালিয়া রাখ, এবং দৃঢ়রূপে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যাও। সে, তদীয় আদেশানু-রূপ কার্য সমাধা করিয়া, প্রস্থান করিলে পর তিনি শয়ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পুস্তক পাঠ করিলেন, এবং পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

কিঞ্চিৎ কাল পরে, বিকট শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অবিলম্বে দ্বার উদ্ঘাটিত, ও পদসঞ্চারধ্বনি আরব্ধ হইল। শ্রবণমাত্র, দেশুলিয়র স্থির করিলেন, বাটীর সকলে যাহাকে ভূত ভাবিয়া, ভয় পাইয়া থাকে, সে এই। পরে তিনি, অবিচলিত চিত্তে ও অসঙ্কুচিত স্বরে, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি যে হও না কেন, আমি তোমায় স্পষ্ট কহিতেছি, কিছুতেই ভয় পাইব না, এবং বাটীর সকলের যে অমূলক ভয় ও সংস্কার জন্মিয়া আছে, আজ তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিব বলিয়া যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কোন কারণে তাহা হইতে বিচলিত হইব না; যদি আমায় ভয় দেখাইয়া, তাহা হইতে বিরত করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তুমি কদাচ কৃতকার্য হইতে পারিবে না, আমার ভাগ্যে যাহা ঘটুক না কেন, আমি শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হইব না।

দেশুলিয়র এই বলিয়া বিরত হইলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। তিনি পুনর্বার সেইরূপ কহিলেন, তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। পল্যঙ্কের অতি সন্নিকটে একটি কাষ্ঠের পরদা ছিল, উহা উলটিয়া মশারির উপর পতিত হওয়াতে, একটা বিকট শব্দ হইল। যাহাদের ভূতের ভয় আছে, এরূপ অবস্থায় ঐরূপ শব্দ শুনিলে ও ঘটনা দেখিলে, তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশও চৈতন্যধ্বংস হয় তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু দেশুলিয়রের মনে ভয় বা উদ্বেগের অণুমাত্র সঞ্চার হইল না। তাঁহার এই সন্দেহ হইল বাটীর কোন ভৃত্য আমায় ভয় দেখাইতে আসিয়াছে। যাহা হউক, তিনি সেই রাত্রিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কি জন্যে এখানে আসিয়াছ, বল, তুমি কখনই, এরূপে ভয় প্রদর্শন করিয়া আমায় ব্যাকুল বা বিচলিত করিতে পারিবে না। উহা কোনও উত্তর দিল না, প্রশান্ত ভাবে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, উহা জ্বলন্ত বাতীর নিকটে উপস্থিত হইল। অবিলম্বে, বৃহৎ বাতী ও বাতীর প্রকাণ্ড আধার উলটিয়া পড়িল। ভয়ানক শব্দ ও গৃহ অন্ধকারময় হইল। তাহাতেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না।

অবশেষে, সেই রাত্রিচর পল্যঙ্কের পাদদেশে উপস্থিত হইল। তখনও দেশুলিয়রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র ভয়সঞ্চার হইল না। ভাল হইল, তুমি কি পদার্থ এখনই আমি অনায়াসে তাহা নির্ণয় করিতে পারিব; এই বলিয়া, গাত্রোত্থানপূর্বক, পল্যঙ্কের পাদদেশে হস্ত প্রসারণ করিয়া, তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই কর মখমলের ন্যায় কোমল দুই কর্ণে সংলগ্ন হইল। তিনি বলপূর্বক, সেই দুই কর্ণ ধরিলেন, এবং যাবৎ রাত্রিশেষ ও সূর্যোদয় না হয়, ছাড়িবেন না, স্থির করিলেন; কিন্তু কাহার কর্ণ ধরিলেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। এইভাবে অবস্থিত হইয়া তিনি রজনীর অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, এই অদ্ভুত ব্যাপারের স্বরূপ নির্ণয় হইল। ঐ বাটীতে এক বৃহৎ কুক্কুর ছিল। দেশুলিয়র দেখিলেন, ঐ কুক্কুরের কর্ণ ধরিয়া আছেন। ভয়ঙ্কর ভৌতিক ব্যাপারের ঐরূপে পর্যবসান হওয়াতে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন, অনন্তর সেই কুক্কুরের কর্ণ পরিত্যাগ পূর্বক, নিশ্চিন্ত হইয়া, শয়ন করিয়া রহিলেন।

এদিকে, কৌণ্ট ও কৌণ্টেস, শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ ও দুর্ভাবনায় রজনী যাপন করিলেন, একবারও নয়ন [illegible] করিতে পারিলেন না। তাঁহারা

এই বিষয়ের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। অবশেষে, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া, দেশুলিয়রের প্রাণত্যাগ হইয়াছে, অবধারিত দেখিতে পাইব। রজনী অবসন্না হইবামাত্র, তাঁহারা শয়নাগার হইতে বহির্গত হইয়া, বিষন্ন বদনে, অবসন্ন গমনে ভূতাবিষ্ট গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, সাহস করিয়া সহসা সেই, গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রবেশ করিয়াও, কথা কহিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। রাত্রিতে কি সর্বনাশ ঘটিয়াছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, উভয়ে দণ্ডায় মান রহিলেন।

তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া, দেশুলিয়র মশারীর অভ্যন্তর হইতে বিনির্গমনপূর্বক, প্রাতঃ কর্তব্য নমস্কারসম্ভাষণাদি করিয়া, সহাস্য মুখে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে জীবিত, অক্ষতশরীর ও প্রফুল্লহৃদয় দেখিয়া, তাঁহাদের কলেবরে প্রানসঞ্চার হইল রাত্রিতে যার পর যে ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদয় তিনি অবিকল বর্ণন করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। অবশেষে, দেশুলিয়র কৌন্ট মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এ বিষয়ে আপনকার বিলক্ষণ ভ্রম জন্মিয়া আছে, এবং প্রশ্রয় দেওয়াতে, সেই ভ্রম ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, আর আপনার তাদৃশ অমূলক কুসংস্কার থাকা উচিত নহে। আপনারা যাহাকে ভূত বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ দেখুন, সে শুইয়া রহিয়াছে। এই বলিয়া, অঙ্গুলিনির্দেশ পূর্বক, তিনি ঐ কুক্কুর দেখাইয়া দিলেন, এবং হাস্যমুখে রাত্রি বৃত্তান্তের শেষ ভাগের বর্ণনা করিলেন।

সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর দেশুলিয়র পুনরায়, কৌন্টকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, ভাবাদৃশ ব্যক্তির ঈদৃশ কুসংস্কারের বশীভূত হওয়া উচিত নহে, দেখুন, এই অমূলক কুসংস্কারের দোষে আপনাদের অন্তঃকরণে কত শঙ্কা জন্মিয়াছিল, গত রাত্রিতে, আমার কি বিপদ ঘটে, এই দুর্ভাবনায় আপনারা, কত অসুখে কালযাপন করিয়াছেন, বলিতে পারি না। লোকে যে সকল ব্যাপারের প্রকৃত কারণের নির্ণয় করিতে না পারে, উহাদিগকে অলৌকিক ঘটনা জ্ঞান করিয়া থাকে তৎপরে, তিনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রত্যহ চাবি দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, অথচ, কুক্কুরে কিরূপে দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিবেক, এই সংশয়চ্ছেদন করিবার নিমিত্ত দ্বার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; অবিলম্বে দেখিতে পাইলেন, উহার কল প্রভৃতি এত শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, কিঞ্চিৎ বলপূর্বক ধাক্কা মারলেই কপাট খুলিয়া যায়।

এইরূপে গৃহপ্রবেশ অনায়াসসাধ্য হওয়াতে, কুক্কুর প্রত্যহ অধিক রাত্রিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিত, কিয়ৎক্ষণ ইতঃস্তত ভ্রমণ করিয়া পল্যঙ্কে আরোহণপূর্বক তদুপরি নিদ্রা যাইত, এবং রাত্রিশেষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, স্বস্থানে গিয়া অবস্থিতি করিত। সে রাত্রিও, পল্যঙ্কে আরোহন করিবার অভিপ্রায়ে, উহার পাদদেশে গমন করিয়াছিল; বোধহয়, দেশুলিয়র বলপূর্বককর্ণে ধরিয়া না রাখিলে, তদুপরি আরোহণ করিত। যাহা হউক, কৌন্ট ও কৌন্টেস্, এইরূপে ভৌতিক বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত হওয়াতে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দেশুলিয়রের সাহস, বুদ্ধিকৌশল ও অকুতোভয়তা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি, স্ত্রীলোক হইয়া, সাহস ও অকুতোভয়তার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পুরুষজাতির মধ্যেও, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুষ্প্রাপ্য এই ভৌতিক রচনাটি মুদ্রিত হল—সঃ।

নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ভাল সারি, সত্য কথা বল দেখি, তোমার বিশ্বাস কি, ভূত আছে ?"

বরদা, ছোট সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যার পর, টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল। একটু রোষ্টমটন প্লেটে করিয়া ছুরি কাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল।

সারদা, প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুকরা রোষ্টে উত্তম করিয়া মাষ্টার্ড মাখাইয়া বদন মধ্যে প্রেরণপূর্বক, আধখানা আলুকে তৎসহবাসে প্রেরণ করিয়া, একটু রুটি ভাঙ্গিয়া বাম হস্তে রক্ষাপূর্বক, অগ্রজের মুখপানে চাহিতে চাহিতে চর্বণ কার্য সমাপন করিল। পরে, এতটুকু সেরি দিয়া, গলাটা ভিজাইয়া লইয়া বলিল, "ভূত ? না।"

এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ সেন পরলোকগত এবং সুসিদ্ধ মেষশাবকের অবশিষ্টাংশকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

বরদাকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, "rather l-

সারদাকৃষ্ণের রসনার সহিত রসাল মেষমাংসের

তছিল, অতএব সহসা উত্তর করিল না। যথা

র প্রাপনান্তর তিনি বলিলেন, "Laconic ? ব

বলিয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে ভূত অ

(অসমাপ্ত)

, বৈশাখ ১৩২২

বলিলেই হইত "না।" আমি বলিয়াছি, "ভূত; না।" "ভূত" কথাটা বেশী বলিয়াছি। কেবল তোমার খাতিরে।"

"অতএব তোমার ভ্রাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ, এই স্বর্গপ্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ দেওয়া গেল।" এই বলিয়া বরদা আর কিছু মাটন কাটিয়া ভ্রাতার প্লেটে ফেলিয়া দিলেন। সারদা অবিচলিত চিত্তে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিল।

তখন বরদা বলিল "Seriously সারি, ভূত আছে বিশ্বাস কর না?"

সারি। না।

বরদা। কেন বিশ্বাস কর না?

সারদা। সেই প্রাচীন ঋষির কথা। প্রমাণাভাবাৎ। কপিল প্রমাণ অভাবে ঈশ্বর মানিলেন না, আমি প্রমাণ অভাবে ভূত মানিব?

এই বলিয়া সারদা এক গেলাস সেরি মেষের সৎকারার্থ আপনার উদর মধ্যে প্রেরণ করিল।

বরদাকৃষ্ণ চটিয়া উঠিল। বলিল, "কোথাকার বাঁদর? ভূত নাই! ঈশ্বর নাই! তবে তুমিও নেই, আমিও নেই?"

সারি। তাই বটে। তোমার মটন রোষ্ট ফুরাইল দেখিয়া, আমি নেই। আর আমার আহারের ঘটা দেখিয়া, বোধ হয়, তুমিও নেই।

বরদা। "কই, খেলি কই?" এই বলিয়া অবশিষ্ট মাংসটুকু কাটিয়া ভাইয়ের প্লেটে সংস্থাপিত করিয়া, গ্লাসে সেরি ঢালিয়া দিলেন। সারদা যতক্ষণ মাংসের ছেদন, বিদ্ধন, মুখে উত্তোলন এবং

কা
যাহা হর্ডর্গ ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত, ততক্ষণ বরদা চুপ করিয়া রহিল। পরে
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই ইলে, সারদা জ্যেষ্ঠকে বলিল, "তুমি নাই আর আমি
চমৎকৃত হইয়া, মুক্ত
তিনি, স্ত্রীলোক হইয়া য় Philosophilcally true—কেননা, আমরা "...ere
সুধোও, সচরাচর সেরূপ possibilities of sensation" আর ...

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হৃষ্ট, ইহাও না করার মধ্যে জানিবে। কে...

possible sensation-গুলার মধ্যে কতকগুলা sensation হইল মাত্র।

বরদা। সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভূত দেখা, ভূতের শব্দ শোনা, এ সব possible sensation নহে?

সারদা। ভূত থাকিলে possible.

বর। ভূত নাই?

সার। তা ঠিক বলিতেছি না, তবে প্রমাণ নাই বলিয়া ভূতে বিশ্বাস নাই, ইহাই বলিয়াছি।

বর। প্রত্যক্ষ কি প্রমাণ নহে?

সার। আমি কখনও ভূত প্রত্যক্ষ করি নাই।

বর। টেম্‌স নদী প্রত্যক্ষ করিয়াছ?

সার। না।

বর। টেম্‌স নদী আছে মান?

সার। যাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায়, এমন অনেক লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বর। ভূতও এমন লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

সার। বিশ্বাসযোগ্য এমন কে? একজনের নাম কর দেখি?

বর। মনে কর আমি।

এই কথা বলিতে বরদার মুখ কালো হইয়া গেল—শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

সার। তুমি?

বর। তা হইলে বিশ্বাস কর?

সার। তুমি একটু imaginative, একটু sentimental—রজ্জুকে সর্প ভ্রম হইতে পারে।

বর। তুমি দেখিবে?

সার। দেখিব না কেন?

বর। আচ্ছা, তবে আহার সমাপ্ত করা যাউক।

(অসমাপ্ত)

নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২

বাংলা কথাসাহিত্যের যথার্থ প্রবর্তনা ঘটেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই। তাঁর উত্তরপুরুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'সব্যসাচী' আখ্যায় বিশেষিত করেছিলেন। বঙ্কিমের কলমে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা কুসুমিত হতে পেরেছিল অনায়াসেই। জীবনের সায়াহ্ন বেলায় ভৌতিক আখ্যান রচনায়ও তিনি একদা মনোযোগ দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে, পরিপূর্ণ অবকাশ না পেলেও অসম্পূর্ণ রচনার মাধ্যমে সেক্ষেত্রেও তিনি পথিকৃতের ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভাবেই পালন করেছেন। ১৮৩৮ সালে এই সাহিত্যপুরুষের জন্ম হয় এবং ১৮৯৪ সালে তাঁর দেহান্ত ঘটে।



পিতামহ রমানাথ সেনের অপমৃত্যু

দীনেশচন্দ্র সেন

আমার প্রপিতামহ রাজচন্দ্র সেন মহাশয় হিঙ্গুবংশীয়দের সর্বপ্রধান কেন্দ্র খুলনা জেলার পয়োগ্রাম ছাড়িয়া ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গ্রামে আসিবার অব্যবহিত পরেই ৩১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় জ্ঞাতিগণের ষড়যন্ত্রে বিতাড়িত ও জমিদারীর অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজচন্দ্র সেনের পত্নী দুইটি শিশুপুত্র ও কন্যা লক্ষ্মীকে লইয়া পূর্বোক্ত সুয়াপুর গ্রামে তাঁহার পিতা ভবানী প্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন।

বহুকষ্টে এই বিধবা রমণী তাঁহার পুত্রদ্বয় ও কন্যাকে লালন-পালন করেন। কন্যাটি আবার বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিধবা হন। দুই পুত্রের মধ্যে রমানাথ জ্যেষ্ঠ ও রঘুনাথ কনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই সংস্কৃত, বাংলা ও ফরাসীতে ব্যুৎপন্ন হন। রঘুনাথ সেন জাতীয় বৈদ্যব্যবসা অবলম্বন করেন, এবং তাহা ছাড়া বাড়ীতে মক্তব খুলিয়া ছাত্রদিগকে বাংলা ও ফারসী শিক্ষা দিতে আরম্ভ কারেন।

রমানাথ সেন ছিলেন সেকালের পুলিশের দারোগা। কিন্তু পুলিশ কাজ করিলেও তাঁহার এমন কতকগুলি গুণ ও প্রবৃত্তি ছিল, যাহা আদপেই পুলিশের কাজের সংগে খাপ খাইত না। তিনি অতি সুদক্ষ চিত্রকর ছিলেন।......

…রমানাথ চিত্রবিদ্যা দ্বারা অবসর রঞ্জন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; তিনি নানারূপ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান দ্বারা নিজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রয়াসী ছিলেন। এই প্রচেষ্টাই তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে তিনি তাঁহার বন্ধু স্বগ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে গাজিখালী নদীর ধারে শবসাধনা করিতে গিয়াছিলেন। রমানাথের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী গৌরমণি দেবী তখন অষ্টাদশবর্ষীয়া। আমি তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাল, তাহাই লিখিতেছি। রমানাথে বন্ধুর নাম মনে পড়িতেছে না, কিন্তু তাঁহার পুত্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়কে আমি বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। গৌরমণি ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

'তখন শীতকাল, কর্তা (রমানাথ) তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যাকালে বাহির হইয়া গেলেন। সেদিন শনিবার অমাবস্যা, কোথা হইতে দুইটি চণ্ডালের মৃতদেহ তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার উপর উপবিষ্ট হইয়া ইহারা সাধনা করিবেন।

'আমাদের বাড়ীতে তখন অনেক লোকজন, খাওয়া শেষ করিতে প্রায় রাত্রি দ্বি-প্রহর হইবে। সেই রাত্রি তখন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি; বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া তখনও শেষ হয় নাই। আমি বাড়ীর বৌ, আমার খাওয়ার ডাক পড়ে নাই। আমি ঘোমটা টানিয়া উনুনের পাশে বসিয়া শীতকালের আগুন পোহাইতেছিলাম। আমার বড়ই ঘুম পাইতেছিল, চক্ষে তন্দ্রা আসিয়াছিল। সেই তন্দ্রার ঘোরে স্পষ্ট দেখিলাম, একটা কালো বুড়ী আমার কাছে একটা থলে হাতে করিয়া আসিল এবং থলেটার মুখ খুলিয়া আমার মাথার উপর ঝাড়িতে লাগিল এবং বলিল—"আজ হতে পৃথিবীর যত দুঃখ তা এই থলে করে তোর মাথায় দিয়ে গেলাম।"

'আমার তন্দ্রার ঘোর ছুটিয়া গেল। যেমনই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছি, অমনই বাড়ীর একটা ভয়ানক গোলমাম শুনিলাম, তারপর জানিলাম আমার কপাল পুড়িয়াছে। লোকজনেরা একটা বাঁশের দোলায় আমার স্বামীকে বহন করিয়া লইয়া

আসিয়াছে। তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছেন, তাঁহার বামগণ্ডে ভয়ানক থাপ্পড়ের দাগ, পাঁচটা আঙুলের আঘাত যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, ঘাড়ের হাড় বোধ হয় ভাঙিয়া গিয়াছে। যেহেতু সমস্ত মুখ-খানি ডানদিকে বাঁকিয়া আছে।

'এই অবস্থায় তিনি তিন দিন জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ শব্দ করিয়াছেন, কোন জ্ঞান ছিল না, কোন কথা বলিতে পারেন নাই। সকলেই বলিল, শবের উপর বসিয়া জপ করিতেছিলেন—ভূতের চড়ে এই দুর্দশা হইয়াছে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর পিতাও তাহাই বলিলেন।"

·· রমানাথ পুলিশের দারোগা ছিলেন। সুতরাং ভূতে মারিয়াছে কিংবা কেহ একাকী তাহাকে নির্জন স্থানে সুবিধায় পাইয়া প্রাণান্তকর আঘাত করিয়া পালাইয়াছে সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই, যদিও গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস, ভূতের হাতেই তাঁহার প্রাণ গিয়াছে।

বঙ্কিম রবীন্দ্রযুগের দ্বৈত অবস্থানের লেখক হলেও দীনেশচন্দ্র মূলত বঙ্কিমী দৃষ্টি ভঙ্গির বিশিষ্টতাই তাঁর রচনায় উপস্থিত করেছিলেন। পাণ্ডিত্য ও বিশুদ্ধ চিন্তার প্রয়োগে তাঁর প্রবন্ধাবলী বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি অধ্যাপক হিসাবে যে মনীষা দেখিয়ে ছিলেন তা একান্তভাবেই অতুলনীয়। দীনেশচন্দ্রের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি নিঃসন্দেহে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ১৮৬৬ সালে তাঁর জন্ম হয় এবং ১৯৩৯ সালে মৃত্যু ঘটে।

এই ঘটনা সম্বন্ধে গ্রামের সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ মদীয় খুল্লতাত দেবীচরণ দাশ মহাশয় লিখিয়াছেন—"রমানাথ শ্মশানক্ষেত্রে চিতায় বসিয়া তপস্যা করিতে-ছিলেন প্রকাশ আছে, তিনি তপস্যায় স্খলিত হওয়ায়ই মৃত্যুর কারণ সংঘটিত হইয়াছিল।"



ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ টম্ সাহেব

টম্ সাহেব বলিতেছেন,-

সম্প্রতি একজন পুবাতন বন্ধুর সহিত আমাব সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হাসিতে হাসিতে তিনি আমাকে বলিলেন,—"দেখ টম্, এ লণ্ডন নগবে একখানি ভূতের বাড়ী আছে।"

আমি উত্তর করিলাম,—'বটে! সত্য বলিতেছ, না তামাসা করিতেছ? তুমি পণ্ডিত লোক, ভূতে তোমার বিশ্বাস নাই।"

আমার বন্ধু বলিলেন,—"না ভাই, না তামাসা নয়। সেই বাটী আমি ভাড়া লইয়াছিলাম। তিন দিনের অধিক তাহাতে বাস। করিতে পারি নাই। বিশেষ কিছু যে ভয়ানক দেখিয়াছি তাহা নহে। তবে কিরূপ শব্দ হয়, মনের ভিতর সর্বদাই কেমন একটা আতঙ্ক হয়। কিন্তু সেই বাটীতে একজন বৃদ্ধা বাস করে। কি করিয়া সে থাকে তা জানি না। বৃদ্ধা বলিল, "কোন ভাড়াটিয়াই সে বাড়ীতে দুই দিনের অধিক বাস করিতে পারে না"

বন্ধুর কথা শুনিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভূতের বাড়ী। এত দিনের পর বুঝি আমার সাধ মিটিল ভূত কিরূপ, দেখিতে চিরকাল আমার মনে একান্ত বাসনা। সেই সাধ মিটাইবার জন্য আমি শ্মশানে মশানে বনে জঙ্গলে ঘোর নিশীথে কত ঘুরিয়াছি, তাহা বলিতে পারিনা। কিন্তু ভূত দেখা আমার কপালে কখন ঘটে নাই।

আজ কি ভগবান আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন? দেখা যাউক, কি হয়।

বন্ধুর নিকট হইতে সে বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইলাম। বাটীর নিকট গিয়া দেখিলাম—তালা বন্ধ। প্রতিবাসিগণের নিকট শুনিলাম যে, সে বাটিতে যে বৃদ্ধা বাস করিত, সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। রাত্রিকালে ভূতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সেই পর্যন্ত সে বাড়ীর মনুষ্য দূরে থাকুক, কাক পক্ষী কেহ প্রবেশ করে না, সে বাড়ীতে নেংটি ইঁদুর কি বড় ইঁদুর, কোন ইঁদুর বাস করে না। আমার আরও কৌতূহল জন্মিল। প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে গৃহস্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি ধনবান লোক।

ভূতের বাড়ী আমি ভাড়া লইব শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন,—"বাড়ীর যে দুর্নাম আছে, তাহা বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবেন। আমি এতোদিন নানা দেশ ভ্রমণ করিতেছিলাম। সম্প্রতি দেশে আসিয়াছি। আমার খুড়া মহাশয় ঐ বাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন। কবে হইতে বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। সপরিবারে নিজে আমি ঐ বাড়ীতে দুই দিন বাস করিয়াছিলাম। দুই দিনের পর প্রাণ ভয়ে পলাইয়া আসিলাম আপনি যদি সে বাড়ীতে কিছুদিন বাস করিতে পারেন, তাহা হইলে ভাড়ার টাকা লওয়া দূরে থাকুক, বরং ঘর হইতে আপনাকে কিছু দিতে প্রস্তুত আছি।"

যাহা হউক, আমি চাবি লইয়া আসিলাম। আমার একজন ডানপিটে বীরপুরুষ চাকর ছিল। ভূত প্রেত দানা দৈত্য কিছুই সে মানিত না। মনে তাহার অপরিমিত সাহস, দেহে তাহার অসীম বল। তাহাকে আমি সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, আর জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেমন হে, তুমি আমার সহিত সে বড়ীতে রাত্রি যাপন করিবে?"

চাকর উত্তর করিল "ভূত! ভূত আমার কাছে আসিবে

আমি ভূতের বাবা! দেখি কেমন আমার সম্মুখে ভূত বাহির হয়। ভূতের চড়চড়ি করিয়া খাইব।"

তাহার কথা শুনিয়া আমার মনে আহ্লাদ হইল। ভূত মানি আর নাই মানি, তবু যেন স্থান বিশেষ কাল বিশেষ প্রাণটা কেমন ছেঁক ছেঁক করে, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। একজন সঙ্গী থাকিলে মনে অনেকটা সাহস হয়। চাকরের হাতে চাবি দিয়া আমি বলিলাম "তুমি তবে সেই বাড়ীতে যাও, ঘর-দ্বার পরিষ্কার রাখ, বিছানা ঠিক করিয়া রাখ। আমার পিস্তল ও ছোরা লইয়া যাও, তোমার নিজেরও পিস্তল ও ছোবা ছাড়িও না। সন্ধ্যাবেলা আমি সে স্থানে যাইব।"

সন্ধ্যার সময় আমি সে বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার চাকর দ্বার খুলিয়া দিল। চাকরের মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হে, সব ভাল তা?"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সব ভাল।" এই কথা বলিয়া, চাকর আর একটু ঈষৎ হাসিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, -'কিছু দেখিয়াছ, না, কি?'

সে উত্তর করিল—"আজ্ঞা না, কিছু দেখি নাই, তবে আমার কানের কাছে কে যেন ফুশ, ফুশ, কবিয়া কথা কহিতেছিল। এরূপ শব্দ বার বার শুনিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"তোমার ভয় হইয়াছে নাকি?"

চাকর হাসিয়া বলিল,—"ভয়? আমার শরীরে ভয় নাই, আমি ভূতের বিধাতাপুরুষ। যদি ভূত দেখিতে পাই, আনন্দ হইবে ভয়ের লেশমাত্র মনে উদয় হইবে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ভূতের খেলা

চাকরের সহিত এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আমি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সঙ্গে আমার একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি অতি বিক্রমশীল, ভীরুতা কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না। আপনা

অপেক্ষা দ্বিগুণ দেহবিশিষ্ট বড় বড় ডালকুত্তাকে তাড়া করিয়া তাহার ঘাড় ধরিত। কোনও একটি নূতন বাড়ীতে যাইলে প্রথমেই সে কোথায় ইঁদুর আছে, কোথায় আরসলা আছে, তাহার জন্য গলি-খুঁজি এ কোণ সে কোণ শুঁকিয়া ফোঁশ ফোঁশ করিয়া বেড়াইত। কিন্তু আজ সেই কুকুরের ব্যবহার দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য হইলাম। প্রথমতঃ, সে সেই বাড়ীর ভিতর কিছুতেই প্রবেশ করিবে না। অনেক আদর করিয়া ভুলাইয়া যদিও প্রবেশ করাইলাম, কিন্তু ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। পদদ্বয়ের ভিতর লাঙ্গুল রাখিয়া কুণ্ডলী হইয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে আমার পায়ে পায়ে জড়াইতে লাগিল। লম্ফ ঝম্ফ নাই, শব্দ নাই, ইঁদুর অনুসন্ধান নাই। আজ সে নীরব, আজ তার কিছুই নাই। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা এ ঘর সে ঘর বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এক তালা, দোতালা, তেতালায় কত যে কামরা, তাহা বলিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে আমরা বৃহৎ একখানি ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ঘরের ভিতর, ভূতের দৌরাত্ম্য যাহাকে বলে, তাহার প্রথম সূচনা হইল।

ঘরটি আমার চাকর পরিষ্কার করে নাই। মেজেতে নিবিড় ধুলা পড়িয়াছিল। কোথায় কিছু নাই, হঠাৎ দেখিলাম, আমার ঠিক সম্মুখে একটি পায়ের দাগ পড়িল। শিশুর পদচিহ্ন। তাহার আগে কি আশেপাশে আর দাগ নাই, কেবল সেই একটি দাগমাত্র। অগ্রসর হইয়া সেই পদচিহ্নের উপর আমার নিজের পা রাখিলাম। অমনি, ঠিক সেই সময়ে আমার সম্মুখে আর একটি পায়ের দাগ পড়িল। আমি চাকরের গা টিপিলাম, চাকরও আমার গা টিপিল। এইরূপে যতই যাই, আগে আগে ধুলার উপর ততই এক একটি শিশুর পদচিহ্ন অঙ্কিত হইতে থাকে। কিন্তু কেবল এক পায়ের চিহ্ন, দুই পায়ের দাগ পড়ে না। যখন ঘরের অপর প্রান্তে প্রাচীরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আর দাগ পড়িল না।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে

লাগিলাম। ক্রমে একখানি বড় ঘরে গিয়া বসিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছিল। সহসা ঘরের অন্য দিক হইতে একখানি চৌকি আকাশ-পথে উড়িয়া ঠিক আমার সম্মুখে পড়িল। আমি বলিলাম,—"বাঃ! মন্দ কথা নয়!"

ক্রমে দেখিলাম, সেই চৌকির উপর যেন কি বসিয়া রহিয়াছে। মানবের আকৃতি বটে, কিন্তু তাহার দেহ যেন অতি তরল ধূম দ্বারা গঠিত। কুকুরটি ভয়বিহ্বল হইয়া ঘোরতর আর্তনাদ করিতে লাগিল। চাকর তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গেল। ঘাড় হেঁট করিয়া কুকুরকে সান্ত্বনা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয় কি আমার পিঠে কিল মারিলেন?

আমি উত্তর করিলাম,—"না, কি হইয়াছে?"

চাকর বলিল,—"আমার পিঠে কে ভয়ানক একটা কিল মারিল।"

আমি বলিলাম,—"এ সব কারখানা বোধ হয় বদমায়েশ লোকের। কি করিয়া করিতেছে, ধরিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।"

এক্ষণে এ ঘর পরিত্যাগ করিয়া আমরা দ্বিতলে গিয়া উঠিলাম। আমার শয়নঘর এই তালায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এখনও নিদ্রা যাইবার সময় হয় নাই। সুতরাং এই তালায় অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। একটি ক্ষুদ্র কামরার নিকট উপস্থিত হইয়া চাকর বলিল,—"এ কি হইল? এ ঘরের দরজা বন্ধ কেন? আমি একমাত্র ইহার চাবি খুলিয়া কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।" আমি দ্বার টানিয়া দেখিলাম, ভিতর হইতে কে খিল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিস্ময়ে দ্বারের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময়ে, আশ্চর্য! দ্বার আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। আমরা দুই জনে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক প্রকার অমানুষিক গন্ধে ঘর ক্রমে পরিপূরিত হইতে লাগিল। এক প্রকার ভৌতিক ত্রাসে আমাদের হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। সে আশঙ্কা যে কি, তাহা বর্ণনা

করিতে পারি না মরজীবনের প্রতিকূল কোন একটা ভীষণ পদার্থ যেন সেই ঘরে আছে এইরূপ আমাদের মনে হইল। সর্বনাশ, সহসা ঘরের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। সে ঘরে আর অপর দ্বার কি জানালা ছিল না। প্রথম দুই জনে দ্বার টানাটানি করিয়া দেখিলাম। কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না। আমার চাকর বলিল, 'অতি পাতলা তক্তা দিয়া কপাট জোড়াটি গঠিত। দুই লাথিতে ভাঙ্গিয়া ফেলিব। দেখি ভূতে কি করিয়া রক্ষা করে! দুই লাথিতে নয়, হাজার, লাথিতেও সে কপাট ভাঙ্গিল না। আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই সেই ভঙ্গপ্রবণ কপাট ভাঙ্গিতে পারিলাম না। শ্রান্ত হইয়া আমরা নিবৃত্ত হইলাম। তখন খলখল করিয়া বিকট হাসির শব্দ হইল। দ্বারটি আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। সে ভয়াবহ ঘর হইতে তাড়াতাড়ি আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা বারেণ্ডায় দাঁড়াইলাম। এক পার্শ্বে মিট্ মিট্ করিয়া কেমন একটা নীলবর্ণের আলো জ্বলিতেছিল। কি আলো, কোথায় যাইতেছে, দেখিবার নিমিত্ত আমরা তাহার পশ্চাদগামী হইলাম। সিঁড়ি দিয়া আমাদের সঙ্গে আগে আগে আলোটি তেতালায় উঠিতে লাগিল। তেতালার উপরে উঠিয়া সামান্য একটা শয়নাগারে প্রবেশ করিল। যে বৃদ্ধা এই বাড়ীতে একাকী বাস করিত, এই ঘরটি তাহার ছিল, আমরা এই-রূপ অনুমান করিলাম। ঘরের ভিতর একটি দেরাজ ছিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতর একখানি রেশমের রুমাল রহিয়াছে। রুমালের একধারে দুইখানি চিঠি বাঁধা রহিয়াছে। চিঠি দুইখানি লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইলাম। দ্বিতলে আসিবার নিমিত্ত সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলাম। মনে হইল, আমার পাশে পাশে যেন আর কে নামিতেছে। কিন্তু তাহাকে আমি দেখিতেছিলাম না। সহসা খপ্ করিয়া কে আমার হাত ধরিল। আমার হাত হইতে চিঠি দুইখানি কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত কে যেন বারবার চেষ্টা

করিল। দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ করিয়া আমি তাহার সে চেষ্টা বিফল করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ঘোর বিভীষিকা

আমার নিজের শয়নাগারে উপস্থিত হইয়া প্রথম ঘড়ি, পিস্তল ও ছোরা মেজের উপর রাখিলাম। নিকটস্থ ছোট একটি ঘরে চাকরকে শুইতে বলিলাম। মাঝের দ্বার খোলা রহিল। কুকুর ঘোরতর ভয়ে ভীত হইয়া ঘরেব কোণে গিয়া আশ্রয় লইল। মাঝে মাঝে ত্রাসজনিত বিকট রোদনের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। যে পত্র দুইখানি উপর হইতে আনিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা পড়িতে লাগিলাম পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে চিঠি দুইখানি কোন এক পুরুষ তাহার প্রিয়তমাকে লিখিয়াছিল। কিন্তু নামধাম কাহারও ছিল না। ভালবাসার কথা ছাড়া, তাহাতে কোন একটা বিভীষিকার আভাসও ছিল। যেন কে কাহাকে খুন করিয়াছে, এই ভাবের কথা। পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া আমি চৌকিব উপর রাখিলাম। ঘরে দুইটি বড় বড় বাতি জ্বলিতেছিল। শীত প্রধান দেশ। অগ্নিস্থানে দাউ দাউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছিল। ফল কথা, ঘরটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত ছিল। সহসা টেবিলের উপর হইতে আমার ঘড়িটি শূন্যপথে চলিয়া যাইতে লাগিল। এক হাতে ছোরা, অপর হাতে পিস্তল লইয়া তাড়াতাড়ি আমি ঘড়ি ধরিতে দৌড়িলাম কিন্তু 'সোঁৎ' করিয়া ঘড়ি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর আমি দেখিতে পাইলাম না।

পুনরায় আমি চৌকিতে বসিয়া একখানি পুস্তক খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। ঘরের ভিতর এক্ষণে বিকট শব্দ হইতে লাগিল। কুকুরটি ভয়ানক কাতর রবে ঘর পরিপুরিত করিল। আমি তাহাকে থামাইতে যাইলাম। যে কুকুর আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, আজ সেই কুকুর আমাকে কামড়াইতে আসিল। দংশনভয়ে আমি তাহার গায়ে হাত দিতে সাহস করিলাম না।

চাকর এই সময় সহসা তাহার ঘর হইতে দৌড়িয়া আসিল চক্ষু রক্তবর্ণ, যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহা সর্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়াছে, মাথার চুলগুলি সব খাড়া হইয়া উঠিয়াছে মুখে শাঁপ মাড়িয়া দিয়াছে। "মহাশয় পলায়ন করুন, মহাশয় পলায় করুন! এই স্থলে আর তিলার্ধকাল থাকিলে মারা পড়িবেন। বাপ রে ধরিল রে, মা রে।" এইরূপ চাৎকার করিতে করিতে সে আমার ঘ হইতে বাহির হইয়া তড়্‌তড় করিয়া লাফে লাফে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। তাহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত আমি পশ্চাৎ পশ্চা দৌড়িলাম। কিন্তু ধরিতে না ধরিতে সে সদর দরজা খুলিয়া ঊর্ধ্ব শ্বাসে পলায়ন করিল। সেই ভয়াবহ শ্মশানসদৃশ অট্টালিকার ভিতর আমি এখন একা পড়িলাম।

এখন প্রাণে আমার অতিশয় ত্রাস হইল। একবার মনে ভাবিলাম আমিও পলায়ন করি। কিন্তু বন্ধুবান্ধব সকলে হাসিবে ও বিদ্রূপ করিবে। যা থাকে কপালে, এই মনে করিয়া পুনরায় আমি উপরে উঠিলাম, পুনরায় আমি নিজের শয়নাগারে প্রবেশ করিলাম। পুনরায় আমি পড়িতে বসিলাম। আমার হাতে পুস্তক,—সম্মুখে বাতি পুস্তক ও বাতির মধ্যবর্তী স্থানে, আমার কোলে, তালগাছ প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণ একটি মানুষের আকৃতি দাঁড়াইল। তাহার মস্তক ছাদে ঠেকিল। সেই মস্তকে চক্ষু দুইটি জ্বলিতে লাগিল। সর্বশরীর আমার শিহরিয়া উঠিল। পিস্তল লইবার নিমিত্ত আমি হাত বাড়াইলাম। হাত অসাড় ও অবশ! হাত উঠিল না। আমি দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম। পা অসাড় ও অবশ। পা উঠিল না। চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। জ্ঞান হত হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু তখনও একটা চিন্তাশক্তি আমার মনে ছিল। ভাবিলাম, যদি এখন ভয় করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি প্রাণ হারাইব। এই রূপ মনে করিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ধৈর্য ধরিয়া রহিলাম, বাতি নিভিল না, অগ্নিস্থানে অগ্নি নির্বাণ হইল না, তথাপি ঘর অন্ধকারে

আবৃত হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম, যেমন করিয়া হোক, ঘরে আলো রাখিতে হইবে। অন্ধকার থাকিলে মারা পড়িব।

পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করিলাম। এবার উঠিতে পারিলাম। আস্তে আস্তে গিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। অল্প অল্প চাঁদের আলো ঘরে প্রবেশ করিল। সেই আলোকে দেখিলাম যে, তালবৃক্ষ প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণের বিকট মূর্তি তখন সম্পূর্ণভাবে ঘরে নাই, কেবল তাহার ছায়াটি এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পুনরায় গিয়া চৌকিতে বসিলাম। পীত, হরিত, লোহিত—নানা বর্ণের গোলাকার আলোক এক্ষণে ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া ও গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর ভূমিকম্প হইলে যেরূপ হয়, ঘর সেইরূপ দুলিতে লাগিল। যে চৌকির উপর চিঠি দুইখানি রাখিয়াছিলাম, তাহার নীচে হইতে ঠিক জীয়ন্ত মানুষের রক্তমাংসের হাতের ন্যায় এক খানি স্ত্রীলোককের হাত বাহির হইল। তাড়াতাড়ি আমি সেই হাত-খানি ধরিতে গেলাম। খপ্ করিয়া চিঠি দুইখানি লইয়া নিমেষের মধ্যে হাতখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইহার পর একখানি চৌকির উপর একটি যুবতী বসিয়া রহিয়াছে এইরূপ দেখিলাম। তাহার পর একজন পুরুষ ঘরের ভিতর উপস্থিত হইল। বালকের মূর্তি, বৃদ্ধার মূর্তি, নানাপ্রকার আকার ঘরের ভিতর আবির্ভাব হইতে লাগিল ও একে একে বিলীন হইতে লাগিল। তাহা ব্যতীত আরও যে কত ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইল, সে সকল বর্ণনা করিবার আর স্থান নাই।

মাঝে মাঝে গলা টিপিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য কে যেন চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য মাঝে মাঝে ঘাড়ে হাতও আসিতে লাগিল। সাহসে ভর করিয়া আমি বার বার সেই ভৌতিক হাত ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম। সে রাত্রিতে আমি যে কি করিয়া প্রাণে বাঁচিলাম, তাহাই আশ্চর্য কথা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শেষ কথা

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা টম সাহেবের বিবরণ। প্রভাত হইলে এই সমুদয় উপদ্রব থামিল। টম্ সাহেব তখন এক প্রকার নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, সে বাটী হইতে কি করিয়া পলাইবেন, এক্ষণে সেই চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। কোনরূপে উঠিয়া কুকুরকে ডাকিলেন। কুকুব তাহাব নিকটে আসিল না। কাছে গিয়া দেখিলেন যে, কুকুবটিব গলদেশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কুকুর মবিয়া গিয়াছে।

টম্ সাহেবেব চাকর সেই দিন অবধি বায়ুগ্রস্ত হইল। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে পলায়ন করিল।

বাড়ীওয়ালার নিকট গিয়া টম্ সাহেব চাবি ফিরাইয়া দিলেন আর বলিলেন,—"ভূত দেখিতে আব আমাব ইচ্ছা নাই। যথেষ্ট হইয়াছে, সাধ বিলক্ষণ মিটিয়াছে।"

বাড়ীওয়ালা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আপনার মত সাহসী পুরুষ পৃথিবীতে অতি বিরল। আপনার যে প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তাহাই পরম লাভ।"

তাহার পর চিঠি দুইখানির কথা শুনিয়া তিনি আরও বলিলেন, "এতদিন ঐ বাড়ীতে যে বৃদ্ধা বাস করিতেছিল, পত্র দুইখানি বোধ হয় তাহার স্বামীর। আমার খুড়া মহাশয়ের জীবনকালে সে ব্যক্তি একবার ঐ বাটী ভাড়া লইয়াছিল। বৃদ্ধার স্বামী অতিশয় পাষণ্ড ছিল। বৃদ্ধার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে টাকার লোভে সে বধ করিয়াছে। দিনকত এইরূপ জনরব শুনিয়াছিলাম। যাহা হউক, ঐ বৃদ্ধা ব্যতীত সে বাটীতে এ পর্যন্ত আর কেহ বাস করিতে পারে নাই। বৃদ্ধার মৃত্যুও সেদিন অকস্মাৎ ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকে। সেই অবধি এমন একটি লোক পাই না যে, সাহস করিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করে। বাড়ীটি দেখিতেছি, আগাগোড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই হইবে।"

টম্ সাহেব উত্তর করিলেন,—"বাড়ীটি আগাগোড়া না ভাঙ্গিয়া একটি কর্ম করিলে হয়। যে ঘরে আমরা বদ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, যে ঘরে বিকট গন্ধ বাহির হইয়াছিল, কেবল সেই ঘরটি প্রথম ভাঙ্গিয়া দেখিলে হয়।"

বাড়ীওয়ালা তাহাই করিলেন। সেই ঘরের মাটির নিম্ন হইতে নানারূপ অদ্ভুত দ্রব্য বাহির হইল। তাহা কি, সে কথা বলিবার আর স্থান নাই, আবশ্যকও নাই। বাড়ীওয়ালা সেই সমুদয় দ্রব্য পোড়াইয়া ফেলিলেন। সেইদিন হইতে ভূতের উপদ্রব থামিয়া গেল।

হু'৽
তাহা
খাঁ

বঙ্কিম-পরবর্তী যুগে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর রচনায় মূলতঃ হাস্যরসের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনা 'ডমরু-চরিত' খ্যাতির দিক থেকে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। স্যাটায়ারধর্মী রচনা ছাড়াও অলৌকিক আখ্যান রচনায়ও তাঁর সমধিক পারদর্শিতা দেখা গেছে। অলৌকিক রহস্যের প্রতি মানুষের সহজাত দুর্বলতাকে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। পরিবেশ সৃষ্টি, ভাষা প্রয়োগ এবং ভৌতিক ব্যঞ্জনা উপস্থাপনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৪৭ সালে এই লেখক জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯১৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।



যকের

মণিহারা

য়াছে, সন্ধ্যার

এ জনশূন্য অন্ধকার

তব মতো নিস্তব্ধ হইয়া

লেন—

সেই জীর্ণপ

গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে

তখন সূর্য

গাহা বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গা

বো

াহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়া-

জ্বলন্ত

আঁকা

তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়া-

অসংখ্য

তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি

রঙ

বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন সুতরাং

মিলাই

সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।

দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

সম্মুখে

মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি

একলা বসিয়া আ

একে কলেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং

এমন সময়ে মাথা

আর রহিল না। এমন কি ব্যামো হইলে

'মহাশয়ের কোথা হ

ডাকা হইত। অশন-বসন-ভূষণও এই পরিমাণে

দেখিলাম, ভদ্র

অনাদৃত। বাংলাদেশে

বিবাহিত অতএব একথা আপনাকে বলাই

বহুকাল জীর্ণ সংস্কা

স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া

একখানি মলিন

যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা

কর্মক্ষেত্র হইতে

কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে

কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

ঘরে।

আগন্তুক সোপান পার্শ্বে আসন গ্রহন করিলেন। আমি কহিলাম,

দেখিলে

'চি হইতে আসিতেছি।'

বাড়ীওয়া

' হয়?'

নানারূপ অদ্ভুত এ

থাকি।'

স্থান নাই, আবশ্যকও নাই

ইয়া ফেলিলেন। সেইদিন হইতে ভূতে

বালসা।'

আমার নিজের

দুঃ

তাহা

খা

শ হইল,

প্রায় ছয়

গড়ে

নাই।'

বঙ্কিম-পরবর্তী যুগে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এক এখানে

বিশিষ্ট লেখক। তার রচনায় মূলতঃ হাস্যরসের ছিলেন, 'আজ্ঞা হাঁ,

যায়। তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক রচনা 'ডমরু-চরিত' খ্য

কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। স্যাটায়ারধর্মী রচনায় কহিলাম, 'এই

আখ্যান রচনাতেও তাঁর সমধিক পারদর্শিতা দেখা

রহস্যের প্রতি মানুষের সহজাত দুর্বলতাকে আমি এই পোড়ো

লিপিবদ্ধ করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। পরিবেশ এ সম্বন্ধে আর

এবং ভৌতিক ব্যঞ্জনা উপস্থাপনে তিনি অত্যন্ত নেরো বৎসর পূর্বে

দিয়েছেন। ১৮৪৭ সালে এই লেখক জন্ম গ্রহণ করেন ল তাহারই

তাঁর মৃত্যু হয়।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাস্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগ-শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়ো বড়ো চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরেজ কবি কোলরিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে, সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্তির মতো নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাস্টার কহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসাব প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরেজী বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কলেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন কি ব্যামো হইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনকে ডাকা হইত। অশন-বসন-ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত অতএব একথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা

হইতে বঞ্চিত সে যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন এমন হইল, আমি সে সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিঙ ঘষিয়া সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যাচর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া থাকে তাহার স্ত্রী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শান দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র অগ্নিবাণ ও নাগপাশ বন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়, স্বামী যদি ভালোমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয় তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল—ব্যবসায়েও সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা বিনা চেষ্টায় আদর বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা বুঝিয়াছিল আর-কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ যোগাবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত, যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল যোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্য স্থান এখানে। কর্মানুরোধে এইখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তবু পিসিমাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল কিন্তু ফনিভূষণ পিসিমাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ হইতে এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল, কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশী কথাবার্তা কহিত না, পাড়া প্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশী ছিল না, ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনও তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় নাই, কেবল স্বামীর আদরগুলো ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবণশ্রী হইতেও যেন লেশ মাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশ বৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দ বৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায়না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতি সতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফল করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন।

অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্ত প্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোক-জন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত। এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গৃহের আশ্রয় স্বরূপে স্ত্রী যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশ ঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকর্নার কোমড়ে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষ মানুষের কর্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গিত, অণুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা—ভালোবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষ মানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষমানুষের তিল পরিমাণ অনুরাগ-বিরাগের লক্ষণ

লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গীটুকু এবং ভঙ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ পুরুষের ভালোবাসাই মেয়েদের বল, তাহাদের জীবন ব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমত পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসার যন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতাব উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়েপুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না। এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে; সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভ বিবাহের পূর্বে পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বরকন্যা-উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন। একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্বাসিত; দূর হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়—এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোট কথা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না! এবং পানে চুন বেশি হইত না তথাপি ফণিভুষণের হৃদয় কী-যেন-কী-নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিনীর শূন্য গহ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার

গহনা চালিত কিন্তু সেগুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে, হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণ লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, একথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলো নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল

মাস্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিট কয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগাল সম্প্রদায় ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হউক বা নবসভ্যতাদুর্বল ফণিভূষণের আচরণেই হউক, রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জল স্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবল মাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায়, তাহা হইলেও মুহূর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে

ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চটপট, এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে যে ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুণ্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যাণ্ডনোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয়; কিন্তু সুর বাধিয়া যায়, বাক্যস্খলন হয়, এমন—সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমাদের গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছুই উত্তর করিল না তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না, যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না এই মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্ৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবত সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে বাজারে যদি অন্যায় কারণেও

আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না, বাজারে যেমন ক্রেডিট, ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে। পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষ মানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, এরূপ বৃহদাকার কবিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন? তাহাব কি বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না ইহা তাহাকে শোভা পায়?

যাহা হউক, আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহেব জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশী চেনে, কিন্তু স্বামীব অকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অণুবীক্ষণে তাহাব সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণেব স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিত-পটুত্ব যে সবল বহুকালগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত, অত্যন্ত নব্যপুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের। ইহারা মেয়েমানুষের মতই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষ মানুষের যে কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে অর্থাৎ কেহবা বর্বর-কেহ বা নির্বোধ কেহ বা অন্ধ তাহাব কোনটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূর সম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশী কিছু-কিছু

সংগ্রহ করিত। মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন পরামর্শ কী?'

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল—অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, 'বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।'

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল, এইরূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সংগত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে যাহা রূপকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা মাণিক যাহা বক্ষের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথার—সেই অনেক দিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, 'কী করা যায়?' মধুসূদন কহিল, 'গহনাগুলো লইয়া এই বেলা বাপেরবাড়ি চলো।' গহনার কিছু অংশ, এমনকি অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাওরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যুষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।' মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।'

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত বাত ধবিয়া একটি একটি করিয়া তাহাব সমস্ত গহনা সবাঙ্গ ভবিযা পডিযাছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আব স্থান ছিল না। বাক্সে কবিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাডা হইয়া যাইতে পাবে, এ আশঙ্কা তাহাব ছিল। কিন্তু গাযে পবিয়া গেলে তাহাকে বধ না কবিযা সে গহনা কেহ লইতে পাবিবে না।

সঙ্গে কোন প্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পাবিল না, মোটা চাদবেব নীচে যে মণিমালিকাব দেহ প্রাণেব সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণেব অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান কবিতে পাবে নাই। মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহাব বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তাব কাছে একখানা চিঠি বাখিযা গেল যে, সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌছাইযা দিতে বওনা হইল। গোমস্তা ফণীভূষণেব বাপেব আমলেব; সে অত্যন্ত বিবক্ত হইয়া হ্রস্ব-ইকাবকে দীর্ঘ-ঈকাব এবং দন্ত্য-স'কে তালবা শ কবিযা মনিবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে একথাটা ঠিকমত প্রকাশ কবিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকাব মনেব কথাটা ঠিক বুঝিল। তাহাব মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, আমি লক্ষপতির সন্তান। সত্ত্বেও স্ত্রীব অলংকাব পবিত্যাগ কবিযা প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইযাছি, তবু আমাকে সন্দেহ! আমাকে আজিও চিনিল না!

নিজেব প্রতি এত বড় দারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র। পুরুষ মানুষ বিধাতাব ন্যায়দণ্ড, তাহাব মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত কবিযা বাখিয়াছেন, নিজেব প্রতি অথবা অপবেব প্রতি অন্যাযেব সংঘর্ষে মানুষ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না পাবে তবে ধিক্ তাহাকে। পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কাবণে, আব স্ত্রীলোক শ্রাবণ মেঘের মতো

অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে, বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেঁকে না

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, 'এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব। আরও শতাব্দী পাঁচ ছয় পরে যখন কেবল আধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবীযুগের ফণিভূষণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিম যুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে, শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এসম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনও সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি !

দিনদশেক পরে কোনোমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য কৃতী পুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য অনুতপ্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে আসিয়া উপনীত হইল

দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া, তাহাতে গহনা পত্রের চিহ্নমাত্র নাই। স্বামীর বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল ! মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা বাণিজ্য ব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসার পিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না, তবে অহরহ হৃদয়খানির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের মুক্তামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি ? এই চির জীবনের সর্বস্ব

জড়ানো শূন্য সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল যদি ইচ্ছা হয়তো ফিরিয়া আসিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চুপ করিয়া থাকিলে কী হইবে, কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবব আসিল মণি মধু এ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারি দিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল, মধুর তল্লাস করিতে পুলিসে খবর দেওয়া হইল—কোন্ নৌকা, নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোন সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়ন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী। সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইতেছে। মুষলধারার বৃষ্টিপাত শব্দে যাত্রার গানেব সুর মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ কবিতেছে। ঐ যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দবজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল—বাদলার হাওয়া, বৃষ্টির ছাট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিলনা। ঘরের দেওয়ালে আর্ট ষ্টুডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোরা ছবি টাঙানো; আলপনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়ি-পেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যোব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝোলান রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল,

এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যাণ্টার, শৌখিন তাস, সমুদ্রের বড়ো বড়ো কড়ি, এমনকি শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো, যে অতি ক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোটো শখের কেরোসিন-ল্যাম্প সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষ মুহূর্তের নিরুত্তর সাক্ষী। সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায় সেও এত চিহ্ন এত ইতিহাস, সমস্ত জড় সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া যায়। এসো মণিমালিকা, এসো তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিস-গুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন, তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারিদিকের এই সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড়সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো এই সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন এক সময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানালার কাছে যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে, তাহার মনে হইতেছিল যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চির-কালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে এই অতি কঠিন নিকষ পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমন সময় একটা ঠক্ ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে

উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উপযুক্ত চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্রদৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষ-দ্বারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুতহস্তে আরও একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দারোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধ দ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্ ঝম্ ঝম্ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালা বন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং হৃৎপিণ্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো স্ফুরিত হইতেছে, স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনও ঝর্ ঝর্ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদি ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যবত যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই

জলপতন শব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দারোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল 'মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানা প্রকারের লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয়না।' ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, 'তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে।' দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভমেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো একটি অনির্দিষ্ট আসন্ন প্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চিৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেকরাত্রে একসময়ে ভেক এবং ঝিল্লী এবং যাত্রাদলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরও একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বদিনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্‌ঠক্ এবং ঝম্‌ঝম্ শব্দ উঠিল। কিন্তু ফণিভূষণ সেদিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্তদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল অন্দরমহলের গোলসিঁড়ি

দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহাব বক্ষ তুফানের ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোলসিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্‌খট্‌ এবং ঝম্‌ঝম্‌ থামিয়া গেল, কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহাব রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে বিদ্যুদ্‌বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল 'মণি!' অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চিৎকারে ঘরের শার্সিগুলা পর্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পরদিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রাব দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, সেদিন সন্ধ্যাব পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কী সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্তদিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকামাত্রই ছিল না এবং উৎসব-জাগরণ ক্লান্ত গ্রাম দুই রাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল, ভাবিতেছিল, একদিন যখন

তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কলেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘির তৃণশয়নে চিত হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দ বৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকে স্পন্দন হৃদয়ের যৌবন স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদ্গরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বলিতেছে—সংসারোহয়মতি বিচিত্রঃ!

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া, এবং 'পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মতো একত্রে আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উন্মোচন করিয়া দিবে।

পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরের গোলসিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল এবং শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরাসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে, প্রত্যেক

জায়গায় এক একবার দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটা কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অলংকারগুলি ঢিলা, ঢলঢল করিতেছে কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছেনা। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব; সেই কালোতারা, সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্ম সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ় শান্ত দৃষ্টি! আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়তসুন্দর কালো কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল, দেখিয়া তাহার সর্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মতো নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিন হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলি সংকেতে ডাকিল. তাহার চারি আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মতো তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্ ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নিচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ

করিল; অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইটের-খোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড়্ কড়্ করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলংকৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবল স্রোত-জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জল স্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাক ভাবে চাহিয়া আছে। আপাদ মস্তক বারম্বার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিত পদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুল মাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না?'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন?

তিনি কহিলেন, 'না। কেন কবি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতি ঠাকুরাণী উপন্যাস লেখিকা নহেন তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—

আমি কহিলাম, 'দ্বিতীয়তঃ, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।'

ইস্কুল মাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, 'আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনার স্ত্রীর নাম কি ছিল?'

আমি কহিলাম, 'নৃত্যকালী'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রধান পুরুষ। তাঁর লেখনীতে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। একদা তিনি ভূতের গল্প শোনাবার অনুরোধে কয়েকটি আশ্চর্য ভৌতিক গল্পও রচনা করেছিলেন। বাংলা ভৌতিক গল্পের ক্ষেত্রে সেগুলি এক একটি বিশিষ্ট রত্নস্বরূপ। তাঁর অনন্যসাধারণ ভাষা এবং কল্পনা-শক্তির স্পর্শে গল্পগুলি অকল্পনীয়ভাবে বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪১ সালে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

একটি ভৌতিক কাহিনী



প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার নাম শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ। নিবাস বীরভূম জেলার টগরা নামক গ্রামে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমি বি. এ. পাশ করিয়া চাকরীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কয়েকমাস ধরিয়া বহু স্থানে বহু আবেদন করিলাম কিন্তু কোনওরূপ ফল হইল না। অবশেষে সিউড়ী জেলা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে সংবাদ পাইয়া স্বয়ং সদরে গিয়া বহু লোকের খোসামোদ কবিয়া উক্ত কর্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার বেতন হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

আমাদের গ্রাম হইতে সিউড়ী বারো ক্রোশ পথ ব্যবধান। বরাবর একটি কাঁচা রাস্তা আছে। আমি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিজের জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া তুই দিন পরে নুতন কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন অল্প বেতন, সেইরূপ একই ছোটখাটো সস্তা বাড়ী খুঁজতে লাগিলাম। কিন্তু পাইলাম না। হেড মাষ্টার মহাশয়ের বাসাতেই শয়ন ও আহারাদি করি, দিবসে বিদ্যালয়ে কর্ম করি, এবং অবসর সময়ে বাসা খুঁজিয়া বেড়াই। অবশেষে শহবের প্রান্তে একটি বৃহৎ খালি পাকা বাড়ির সন্ধান পাইলাম। বাড়িটি বহুকাল খালি পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে ভগ্ন তথাপি বাসোপযোগী কয়েকখানি ঘর তাহাতে ছিল। মাসিক পাঁচ সিকা মাত্র ভাড়া দিলেই বাড়িখানি পাওয়া যায়। কিন্তু গুজব এই যে বাড়িটিতে ভূত আছে। তখন আমি সদ্য কলেজের ছোকরা—ইয়ংবেঙ্গল—ভূতের ভয়ে যদি পশ্চাৎপদ হই তবে আমার বিদ্যা-মর্যাদা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং বাড়িটি লওয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু অত-দূরে

একাকী থাকা নিরাপদ নহে চোরডাকাতের ভয়ও ত আছে—তাই একজন সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একজন জুটিয়াও গেলেন, তিনি আমাদেরই স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক—নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি বি. এ. পাশ করেন নাই, তথাপি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেকে ইয়ংবেঙ্গল শ্রেণীভুক্তই মনে করেন। তাঁহার পূব বাসায় কিছু অসুবিধা হইতেছিল, তাই তিনি আমার সহিত যোগদান করিয়া সেই বাড়িটি লইতে প্রস্তুত হইলেন। একজন ভৃত্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ স্থির করা গেল কিন্তু তাহারা রাত্রি-কালে সে বাড়িতে থাকিতে অস্বীকৃত হইল, বলিল কাজকর্ম সারিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাত্রি নয়টার মধ্যেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কি করি, তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। পরবর্তী রবিবারে প্রাতে জিনিসপত্র লইয়া সেই বাড়িতে গিয়া বাসা করিলাম।

বাড়িটি বহুকালের নির্মিত। চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন, গো-মহিষাদি নিবারণ করিবার জন্য বাঁশের বেড়া বাঁধা আছে। বাড়িটির চারিদিকে বাগান। অনেকগুলি নারিকেল, আম কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। সেগুলি ফড়িয়াগণের নিকট জমা দেওয়া। বাড়ির দ্বিতল নিম্নতলে সম্মুখভাগে বেশ বড় বড় দু'খানি ঘর আছে, সেই ঘর দুটি মাত্র আমরা দখল করিলাম, কারণ আমাদের প্রয়োজন অল্প। বাড়ির পশ্চাতে একটি পুষ্করিণী তাহার জল পান-যোগ্য নহে, স্নানযোগ্যও নহে, তবে বাসনমাজা প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম তাহাতে হইতে পারিত। বাড়ির অল্পদূরে একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা ছিল, আমরা সেইখানে গিয়াই স্নান করিতাম, এবং পান রন্ধনের জন্য সেই জল ভৃত্য আনয়ন করিত। একখানি ঘর আহারাদি করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিলাম। অপর খানিতে দুইটি চৌকি পাতিয়া আমরা দুইজনে শয়ন করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরে প্রদীপ জ্বালা থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে দশহরার দুইদিন ছুটি

হইল, সেইসঙ্গে একটা রবিবারও পাওয়া গেল। আমি বাড়ি গেলাম।

বাড়িতে দুইদিন মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিন প্রভাতে পদব্রজে সিউড়ী যাত্রা করিলাম। আমাদের গ্রামের এক ক্রোশ পরে হাত-ছালা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পূর্বে এখানে স্থানীয় জমিদারের অনেকগুলি হাতি বাঁধা থাকিত, হাতিশালা হইতে হাতছালা নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই গ্রামের প্রান্তে সড়কের ধারে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে রমাপ্রসন্ন মজুমদার নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্বদা বাস করেন এবং আপনার তপ-জপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন "বাবা তুমি কোথা যাইতেছ?"

আমি উত্তর করিলাম—"সিউড়ী স্কুলে আমার একটি মাষ্টারি চাকরী হইয়াছে। দশহরার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলাম। কল্য স্কুল খুলিবে, তাই ফিরিয়া যাইতেছি।"

মজুমদার মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ কি তোমার না গেলেই নয়? আজ বাড়ি ফিরিয়া যাও, কল্য তখন যাইও।"

আমি বলিলাম—"কল্য স্কুল খুলিবে। আমার নূতন চাকরী, কামাই হওয়াটা বড়ো খারাপ কথা, সুতরাং আমাকে ও রূপ আজ্ঞা করিবেন না।"

মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ?"

—শহরের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন খালি বাড়ি ছিল, সেইটি ভাড়া লইয়া আমি ও আমাদের স্কুলের অন্য একটি মাস্টার রাসবিহারী

মুখোপাধ্যায় একত্রে বাসা করিয়াছি।"—বলিয়া মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় সিউড়ী পৌঁছিলাম। স্নানাহার করিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, এমন সময় দেখি আমাদেরই গ্রামের একজন কৈবর্ত বৃহৎ লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রে। তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি?"

সে বলিল—"আজ্ঞে, মা ঠাকুরাণী এই চিঠি দিয়েছেন এবং এই একটি কবচ আপনার হাতে পরবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" বলিয়া চিঠি ও কবচ দিল।

চিঠি পড়িয়া দেখিলাম, মাতা ঠাকুরাণী লিখিতেছেন—"তুমি বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার পর রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আসিয়াছিলেন এবং একটি কবচ দিয়া বলিলেন—'মা তোমার ছেলে আজ প্রাতে সিউড়ী রওনা হইয়াছে পথে তাহার সংগে দেখা হইল, তাহার জন্য আমি এই রামকবচটি আনিয়াছি, তুমি যেমন করিয়া পার আজই এই কবচটি তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দাও এবং বিশেষ অনুরোধ করিয়া লেখ যেন আজই সে এই কবচটি ধারণ করে। আর লিখিয়া দাও, যদি কোনরকম ভয় পায় তবে যেন তারকব্রহ্ম নাম জপ করে। এই কবচের গুণে এবং নামের বলে সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। সুতরাং আমি দীনু কৈবর্তকে দিয়া এই চিঠি ও কবচ পাঠাইলাম। প্রাপ্তমাত্রে রামনাম স্মরণ করিয়া তুমি কবচটি ভক্তি পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে, যেন কোনমতে অন্যথা না হয়। ইহা তোমার মাতৃ-আজ্ঞা বলিয়া জানিবে।"

পত্র ও কবচ লইয়া আমি দীনুকে বলিলাম, 'তুই আজ এইখানেই থাকবি ত? তোর খাবার জোগাড় করি।'

সে বলিল—"আজ্ঞে না, মা ঠাকুরাণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তুই নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কবচটি পরাইয়া দিবি এবং

আজ রাত্রেই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবি যে, আমার ছেলে কবচ পড়িয়াছে।”

সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলাম না। তাহার হাতে দুই আনা পয়সা দিয়া বলিলাম—‘এই নে, বাজার হইতে কিছু মুড়ি মুড়কি কিনিয়া পথে খাইতে খাইতে যাইবি।” তাহার সম্মুখে কবচটি আমি হস্তে ধারণ করিলাম। সে আমায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর যথাসময়ে দুইজনে শয়ন করিলাম। উভয়ের চৌকির শিয়রে দুইটি বড় বড় জানালা খোলা ছিল আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু আসিয়া মেঘকে উড়াইয়া একাদশীর চন্দ্রকে দৃশ্যমান করিতেছে। আমরা দু'জনে কিয়ৎক্ষন গল্পগুজব করিয়া নিস্তব্ধ হইলাম। পথশ্রমে কাতর ছিলাম, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি বাতাসে প্রদীপটা নিবিয়া গিয়াছে। ক্ষীণ মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নালোক জানালা পথে প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের দেওয়ালের একটা অংশ আলোকিত করিয়াছে। ঘুমে জড়িত চক্ষু অল্পে অল্পে খুলিয়া দেখিলাম, যেন একটা কঙ্কালসার বৃদ্ধ আমার শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে এবং একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখখানা যেন বহুদিন রোগে শীর্ণ, গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন মাড়ীর উপর তাহার ওষ্ঠদ্বয় চুপসিয়া বসিয়া গিয়াছে। মাথায় সাদা ছোট চুলগুলো যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দু'টা হইতে যেন ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রূপের জ্বালা বহির্গত হইতেছে।

দেখিয়া আমি আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিলাম। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার চক্ষু খুলিলাম। আবার দেখিলাম সেই বীভৎস মূর্তি ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম

তখন হঠাৎ মাতাঠাকুরাণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল। মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় কি আমার হস্তে রামকবচ রহিয়াছে এবং মৃদুস্বরে তারকব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চক্ষু খুলিলাম, তখন সে মূর্তি আর নাই। সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিলাম এবং জড়িতকণ্ঠে আমার বন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম। রাসবিহারীবাবু উঠিয়া বলিলেন—"কি মহাশয় ?"

আমি তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ঘটনা তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনিও অত্যন্ত ভীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি আমরা বসিয়া গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারাদি করিয়া সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় ডাকওয়ালা পিওন একখানি পত্র দিল। দেখিলাম সেখানে রমা প্রসন্ন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন। চিঠির তারিখ ও ছাপ গতকল্যকার। চিঠিখানিতে লেখা আছে ঃ

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

পরমশুভাশীর্বাদাঃ সন্তু বিশেষঃ

বাবাজীবন গতকল্য তোমার সহিত সাক্ষাত হওয়ার পর আমি তোমাদের বাটিতে গিয়াছিলাম এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীকে তোমার নিমিত্ত একটি রামকবচ দিয়া আসিয়াছি। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি যে অদ্যই তিনি সেটি যে কোন উপায়ে যেন তোমাকে পাঠাইয়া দেন যাহাতে অদ্যই নিশাগমের পূর্বে কবচটি তুমি ধারণ করিতে পার। বোধ হয় অদ্য রাত্রে তুমি কোনরূপ ভয় পাইবে কিন্তু সেই রামকবচটির গুণে তোমার কোনও বিপদ হইবে না। কবচটি তুমি নিয়ত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং আর যদি কখনও ভয়ের কারণ ঘটে তবে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিবে। সর্বদা শুদ্ধাচারে থাকিবে। অত্র কুশল। মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি নিয়ত আশীর্বাদক

শ্রীরমাপ্রসন্ন দেবশর্মা

পত্রখানি পড়িয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেখানি রাসবিহারীবাবুকে দেখাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য হইলেন।

পূজার ছুটির সময় বাড়ি গিয়া প্রথমেই মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলাম। যে বিপদ হইতে আমাকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা আমি যে সেই রাত্রে ভয় পাইব একথা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন ?"

একটু মৃদু হাস্য করিয়া মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি যখন সেদিন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলে, তখনই আমি দেখিলাম একটি প্রেতাত্মা তোমার পশ্চাতে বেড়াইতেছে। কোনও কারণে সে তোমার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং তোমার প্রাণহানি করিবার মানসেই তোমার সঙ্গ লইয়াছে। কেবল উপযুক্ত ক্ষণ পায় নাই বলিয়া সে পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তুমি চলিয়া গেলে আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই রাত্রেই ক্ষণ উপস্থিত হইবে তাই তাড়াতাড়ি একটি রামকবচ লিখিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দিয়া আসিয়াছিলাম। যাহা হউক কবচটি তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না।"

আমি বলিলাম—"মজুমদার মহাশয়, আমার সঙ্গে যে লোকটি সেই ঘরে শয়ন করিতেন, তিনি কোনরূপ ভয় দেখিলেন না কেন ? আমরা উভয়েই একত্র সেই বাড়িতে ছিলাম, তবে আমার উপরেই ভূতের এত আক্রোশ কেন ?"

মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে লোকটির নাম কি ?"

—"তাঁহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

—"তিনি ব্রাহ্মণ, এই কারণে ভূত সহসা তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই। তুমি কায়স্থ, তোমার প্রাণহানি করা তাহার পক্ষে সহজ হইত।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমি নীরবে চিন্তা করিতে

লাগিলাম। পরে বলিলাম—"সে ভূত কি এখনও আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে ?"

—"করিতেছে। আর একবার সে তোমায় দেখা দিবে কিন্তু সে কত দিনে উপস্থিত হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারিনা। কিন্তু এই রামকবচের বলে তোমার কোন বিপদ হইবে না"।

তাহার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। সে ভূতের কথা আমি প্রায় বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু রামকবচটি বরাবর সযত্নে ধারণ করিয়াছিলাম। আমি ক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলাম। পরে আরও কয়েক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টারী পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। মফস্বলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইত। এক দিন মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া একখানি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া, সেই গ্রামাভিমুখে রওয়ানা হইলাম, শরৎকালের পরিষ্কার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ী মন্থর গমনে চলিয়াছে। আমি প্রথম শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘন্টা দুই এ-পাশ ও-পাশ করিয়া যখন কিছুতেই ঘুম হইল না, তখন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখি-লাম গাড়োয়ান তাহার বসিবার সেই সংকীর্ণ স্থানটুকুতে কোন প্রকার শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি—পরিষ্কার পথ পাইয়াছে—গরু দুইটি অবাধে আপন মনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের শ্রেণী, কোথাও দূরে, দূরে, কোথাও বা ঘন-সন্নিবদ্ধ। ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস দিতেছে। গাড়োয়ান আরামে নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া গরীবকে জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। অথচ গরু দুইটা অরক্ষিত অবস্থায় পথ চলে তাহাও নিরাপদ নহে। এই বিবেচনা করিয়া আমি আর শুইলাম না বসিয়াই রহিলাম।

এই অবস্থায় প্রায় ঘন্টাখানেক কাটিল। আমার একটু তন্দ্রা

আসিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। হঠাৎ গরু দুইটা থামিয়া গেল, একটা ঝাঁকুনি দিয়া গাড়িখানা দাঁড়াইয়া পড়িল। আমাব তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

চক্ষু খুলিয়া দেখি, সেই ভীষণ মূর্তি। গরু দুইটার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া গাড়ির জোয়ালের উপর দুইটা জীর্ণ হস্ত রাখিয়া, সেই শুষ্ক চর্মাবৃত বৃদ্ধ কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই জ্বলন্ত চক্ষু দুইটা হইতে আমার প্রতি ক্রোধানল বর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া আমার শরীরের বক্ত হিম হইয়া গেল আমি কাঁপিতে লাগিলাম। বুকের কাছে হাত রাখিয়া তারকব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ, জপ করিতে করিতে দেখিলাম, সে মূর্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে। যখন সে একবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, গরু দুইটা তখন গাড়ি পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিয়া, মহাবেগে ছুটিতে লাগিল।

ঝাঁকানীতে গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"বাবু এ কি? গরু এমন করিয়া ছুটিতেছে কেন?" আমি আসল কথা তাহাকে না বলিয়া কেবলমাত্র বলিলাম—"হয় ত পথে কোনও ভয় দেখিয়াছে তাই ছুটিয়া বাড়ি যাইতেছে?" গাড়োয়ান তখন গাড়ি থামাইবার এবং মুখ ঘুরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, গরু দুইটির লাঙ্গুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দাঁড়াইল না। দৌড়িতে দৌড়িতে অবশেষে যখন একটি গ্রামের বাজারে উপনীত হইল এবং সেখানে অনেক লোকজন ও অন্যান্য গরুর গাড়ি দেখিতে পাইল, তখন দাঁড়াইল। গরু দুইটি ভয়ানক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম—"থাক্, আজ আর কাজ নাই, গরুকে খুলিয়া দাও, উহাদের মুখে ঘাস জল দাও, কল্য প্রভাতে তখন আবার যাওয়া যাইবে। অদ্য রাত্রে এইখানেই বিশ্রাম করি।"

তাহার পর আরও সাত বৎসর কাটিয়াছে—কিন্তু আর কখনও কোনরূপ ভয় পাই নাই। সে রামকবচটি এখনও ধারণ করিয়া আছি এবং যতদিন বাঁচিব ধারণ করিয়া থাকিব, আমার মাতৃদেবীর এবং

মজুমদার মহাশয়েব লিখিত সেই পত্র দুইখানি অদ্যাপি আমার নিকট আছে, যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন. ত দেখাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি যেমন শুনিয়াছি, উপরে অবিকল স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

—শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উপরের লিখিত ঘটনাগুলি আমি যেমন বলিয়াছি ইন্দুবাবু তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন এবং ঐ ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষীভূত এবং অবিকল সত্য।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁরই ছত্রছায়ায় প্রভাতকুমারের সাহিত্য-প্রতিভা বিকশিত হয়। সমসাময়িক কালে তাঁর ছোট গল্প অভিনবত্বের স্বাদ বহন করে এনেছিল। লেখক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে তিনি নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রতিষ্ঠিত মানসী এবং মর্মবাণী পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী বর্ধমানে মাতুলালয়ে প্রভাতকুমারের জন্ম হয়। তিনি সেকালের বিখ্যাত পত্রিকাগুলির নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট রচনার মধ্যে ষোড়শী, নবকথা, রমাসুন্দরী, নবীন সন্ন্যাসী, রত্নদীপ, গহনার বাক্স প্রভৃতি সমধিক খ্যাত। বাংলা ছোট গল্পের পরিব্যাপ্ত অঙ্গনে প্রভাতকুমারের উজ্জ্বল উপস্থিতি একান্ত ভাবেই অবিস্মরণীয়। তিনি বিচিত্র উপাদানের সাহায্যে তাঁর গল্পগুলিকে উপাদেয় করে তুলেছেন। ভৌতিক গল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এই বিশিষ্ট লেখক ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



ভূশণ্ডীর মাঠে

পরশুরাম

শিবু ভট্টাচার্যের নিবাস পেনেটি গ্রামে। একটি স্ত্রী, তিনটি গরু, একতলা পাকা বাড়ি, ছাব্বিশ ঘর যজমান, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি, কয়েক ঘর প্রজা—ইহাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়। শিবুর বয়স বত্রিশ। ছেলেবেলায় স্কুলে যা একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং বাপের কাছে সামান্য যেটুকু সংস্কৃত পড়িয়াছিল, তাহা সম্পত্তি ও যজমান বক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু শিবুর মনে সুখ ছিল না। তাহার স্ত্রী নৃত্যকালীর বয়স আন্দাজ পঁচিশ, আঁটোসাঁটো মজবুত গড়ন, দুর্দান্ত স্বভাব। স্বামীর প্রতি তাহার যত্নের ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শিবু সে যত্নেব মধ্যে রস খুঁজিয়া পাইত না। সামান্য খুটিনাটি লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিত। পাঁচ মিনিট বকাবকির পরেই শিবুর দম ফুরাইয়া যাইত, কিন্তু নৃত্যকালীব রসনা একবার ছুটিতে আরম্ভ করিলে সহজে নিরস্ত হইত না। প্রতিবারে শিবুরই পরাজয় ঘটিত। স্ত্রীকে বশে রাখিতে না পারায় পাড়াব লোকে শিবুকে কাপুরুষ, ভেড়া, মেনীমুখো প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিল। ঘরে-বাইরে এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় শিবুর অশান্তির সীমা ছিল না।

একদিন নৃত্যকালী গুজব শুনিল তাহার স্বামীর চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে। সেদিনকার বচসা চরমে পৌঁছিল—নৃত্যকালীর ঝাঁটা

শিবুর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। শিবু বেচারা ক্রোধে, ক্ষোভে, কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া কোনও গতিকে রাত কাটাইয়া পরদিন ভোর ছ-টার ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিল।

শেয়ালদহ হইতে সোজা কালীঘাটে গিয়া শিবু নানা উপচারে পাঁচ টাকার পূজা দিয়া মানত করিল—"হে মা কালী, মাগীকে ওলাওঠায় টেনে নাও মা। আমি জোড়া পাঁঠার নৈবিদ্যি দেব। আর যে বরদাস্ত হয় না। একটা সুবাহা ক'রে দাও মা, যাতে আবার নতুন করে সংসার পাততে পারি। মাগীর ছেলেপুলে হল না, সেটাও তো দেখতে হবে। দোহাই মা।"

মন্দির হইতে ফিরিয়া শিবু বড় এক ঠোঙা তেলেভাজা খাবার আধ সের দই এবং আধসের অমৃতি খাইল তারপর সমস্ত দিন জন্তুর বাগান, জাদুঘর, হগ সাহেবের বাজার, হাইকোর্ট ইত্যাদি দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা বীডন ষ্ট্রীটের হোটেল ডি-অর্থোডেক্সে এক প্লেট কারি, দু-'প্লেট রোস্ট ফাউল এবং আটখানা ডেভিল জলযোগ করিল। তারপর সমস্ত রাত থিয়েটার দেখিয়া ভোরে পেনেটি ফিরিয়া গেল।

মা কালী কিন্তু উল্‌টা বুঝিয়াছিলেন। বাড়ি আসিয়াই শিবুর ভেদবমি আরম্ভ হইল! ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল, ফলে কিছুই হইল না। আটঘণ্টা রোগে ভুগিয়া স্ত্রীকে পায়ে ধরাইয়া কাঁদাইয়া শিবু ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

গ্রামে আর মন টিকিল না। শিবু সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইল। পেনেটির আড়পাড় কোন্নগর। সেখান হইতে উত্তর মুখ হইয়া ক্রমে রিশড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, চাঁপদানির চটকল ছাড়াইয়া আরও দু-তিন ক্রোশ দূরে ভুশণ্ডীর মাঠে পৌঁছিল। মাঠটি বহুদূর বিস্তৃত, জনমানবশূন্য। এককালে এখানে ইট-খোলা ছিল সেজন্য সমতল নয়, কোথাও গর্ত, কোথাও মাটির ঢিপি। মাঝে মাঝে আসশ্যাওড়া, ঘেঁটু, বুনো ওল, বাবলা প্রভৃতির ঝোপ। শিবুর বড়ই পছন্দ হইল। একটা বহুকালের

পরিত্যক্ত ইটের পাঁজার একপাশে একটা লম্বা তালগাছ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে একটা নেড়া বেলগাছ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবু সেই বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল।

যাঁহারা স্পিরিচুয়ালিজম বা প্রেততত্ত্বের খবর রাখেন না, তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষ মরিলে ভূত হয় ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু এই থিয়োরির সঙ্গে স্বর্গ, নরক, পুনর্জ্জন্ম খাপ খায় কিরূপে? প্রকৃত তথ্য এই—নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাঁহারা মরিলে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাঁহারা আস্তিক, তাঁহাদের আত্মা আছে বটে, কিন্তু পুনর্জ্জন্ম নাই। তাঁহারা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমতঃ একটি বড় ওয়েটিং রুমে জমায়েত হন। সেথায় কল্পবাসের পর তাঁহাদের শেষ বিচার হয়। রায় বাহির হইলে কতকগুলি ভূত অনন্ত স্বর্গে এবং অবশিষ্ট সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয়লাভ করেন। সাহেবরা জীবদ্দশায় যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভূতাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া যায়। বিলাতী প্রেতাত্মা বিনা পাসে ওয়েটিং রুম ছাড়িতে পারেন না। যাঁহারা Seance দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন বিলাতী ভূত নামানো কি রকম কঠিন কাজ। হিন্দুর জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত, কারণ আমরা পুনর্জ্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্ম্মফল, গয়া, হৃষীকেশ, নির্ব্বাণ, মুক্তি সবই মানি। হিন্দু মরিলে প্রথমে ভূত হয় এবং যত্রতত্র স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে—আবশ্যক মত ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে। এটা একটা মস্ত সুবিধা। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ দু-চারদিন পরেই পুনর্জ্জন্ম লাভ করে, কেহ বা দশ-বিশ বৎসর পরে, কেহ বা দু-তিন শতাব্দী পরে। ভূতদের মাঝে মাঝে চেঞ্জের জন্য স্বর্গে ও নরকে পাঠানো হয়। এটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কারণ স্বর্গে গেলে খুব ফুর্তিতে থাকা যায়, এবং নরকে গেলে পাপ ক্ষয় হইয়া সূক্ষ্মশরীর বেশ হাল্‌কা

ঝরঝরে হয়, তা ছাড়া সেখানে অনেক ভাল ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হইবার সুবিধা আছে। কিন্তু যাঁহাদের ভাগ্যক্রমে ৺কাশী লাভ হয়, অথবা নেপালে পশুপতিনাথ বা রথের উপর বামনদর্শন ঘটে, কিম্বা যাহার স্বকৃত পাপের বোঝা হৃষীকেশের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—একেবারেই মুক্তি।

দু-তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। শিবু সেই বেলগাছেই থাকে। প্রথম প্রথম দিনকতক নূতন স্থানে নূতন অবস্থায় বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, এখন শিবুর বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মেজাজটা যতই বদ হউক, নৃত্যের একটা আন্তরিক টান ছিল, শিবু এখন তাহা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। একবার ভাবিল—দূর হ'ক না হয় পেনেটিতেই আড্ডা গাড়ি। তারপর মনে হইল—লোকে বলিবে বেটা ভূত হইয়াও স্ত্রীর আঁচল ছাড়িতে পারে নাই। নাঃ, এইখানেই একটা পছন্দ মত উপদেবীর যোগাড় দেখিতে হইল।

ফাল্গুন মাসের শেষ বেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝিরঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এই মাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটুফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আকন্দঝোপে গোটাকতক পাকা ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলোর আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়শার কঙ্কালের মত ঝিকমিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্মশরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কাল গুবরে পোকা ভর্‌র্ করিয়া শিবুকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অদূরে বাবলা গাছে এক জোড়া দাঁড়কাক বসিয়া আছে কাক গলায় সুড়সুড়ি দিতেছে, কাকিনী চোখ মুদিয়া গদগদ স্বরে মাঝে মাঝে ক-অ-অ করিতেছে। একটা কট্‌কটে ব্যাং সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া গুটিগুটি পা ফেলিয়া বেল গাছের কোটর হইতে বাহিরে আসিল, এবং শিবুর দিকে ড্যাবডেবে চোখ মেলিয়া

টিটকারি দিয়া উঠিল। একদল ঝিঁঝিপোকা সন্ধ্যার আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছিল, এতক্ষণে সংগত ঠিক হওয়ায় সমস্বরে রিরিরিরি করিয়া উঠিল।

শিবুর যদিও রক্ত মাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা। শিবুর মনটা খাঁখাঁ করিতে লাগিল। যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল; সেখানটা ভরাট হইয়া ধড়াক ধড়াক করিতে লাগিল। মনে পড়িল—ভুশণ্ডীর মাঠের প্রান্তস্থিত পিটুলি বিলের ধারে শ্যাওড়া গাছে একটি পেত্নী বাস করে। শিবু তাহাকে অনেকবার সন্ধ্যা বেলা পলো হাতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছে। তার আপাদমস্তক ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা, একবার সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিব কাটিয়াছিল। পেত্নীর বয়স হইয়াছে, কারণ তাহার গাল একটু তোবড়াইয়াছে এবং সামনের দুটো দাঁত নাই। তাহার সঙ্গে ঠাট্টা চলিতে পারে; কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব।

একটি শাঁকচুন্নী কয়েকবার শিবুর নজরে পড়িয়াছিল। সে একটা গামছা পরিয়া আর একটা গামছা মাথায় দিয়া এলো চুলে বকের মত লম্বা পা ফেলিয়া হাতের হাঁড়ি হইতে গোবর গোলা জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। তাহার বয়স তেমন বেশী বোধ হয় না। শিবু একবার রসিকতার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শাঁকচুন্নী ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফ্যাঁচ করিয়া ওঠে, অগত্যা শিবুকে ভয়ে চম্পট দিতে হয়।

শিবুর মন সবচেয়ে হরণ করিয়াছে এক ডাকিনী। ভুশণ্ডীর মাঠের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরী-বামনীর পরিত্যক্ত ভিটার যে জীর্ণ ঘরখানি আছে, তাহাতেই অল্পদিন হইল সে আশ্রয় লইয়াছে। শিবু তাহাকে শুধু একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে। ডাকিনী তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল। পরনে সাদা থান। শিবুকে দেখিয়া নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক্‌ করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কি দাঁত!

কি মুখ! কি রং নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মত। কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস।

শিবু একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গান ধরিল—

আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী
কারে রেখে কারে ফেলি।

সহসা প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া নিকটবর্তী তালগাছের মাথা হইতে তীব্রকণ্ঠে শব্দ উঠিল—

চা বা বা বাবাবা
আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগলুকে বিটিয়া
কেক্‌রাসে সাদিয়া হো কেক্‌রাসে হো-ও-ও-ও—'

শিবু চমকাইয়া উঠিয়া ডাকিল—"তালগাছে কেরে?"

উত্তর আসিল—"কারিয়া পিরেত বা।"

শিবু—"কেলে ভূত? নেমে এস বাবা।"

মাথায় পাগড়ি, কাল লিক্‌লিকে চেহারা কাঁকলাসের মত একটি জীবাত্মা সড়াক করিয়া তালগাছের মাথা হইতে নামিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"গোড় লগি ররমদেওজী।"

শিবু—জিতা রহো বেটা। একটু তামাক খাওয়াতে পারিস?

কারিয়া পিরেত—ছিলম বা?

শিবু—তামাকই নেই তা ছিলিম। যোগাড় কর না।

প্রেত ঊর্ধ্বে উঠিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে বৈদ্যবাটীর বাজার হইতে তামাক টিকা কলিকা আনিয়া আগ শুলগাইয়া শিবুর হাতে দিল শিবু একটা কচুর ডাটার উপর কলিকা বসাইয়া টান দিতে দিতে বলিল—"তারপর, এলি করে? তোর হালচাল সব বল্‌।"

কারিয়া পিরেত যে ইতিহাস বলিল তার সারমর্ম এই—তাহার বাড়ি ছাপরা জিলা। দেশে এককালে তাহার জরুগরু জমি জেরাত সবই ছিল। তাহার স্ত্রী মুংরী অত্যন্ত মুখরা ও বদমেজাজী, বনিবনাও কখনও হইত না। একদিন প্রতিবেশী ভজুয়ার ভগ্নীকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হয় এবং স্ত্রীর পিঠে এক ঘা লাঠি

কশাইয়া স্বামী দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। কিছুদিন পরে সংবাদ আসে যে মুংরী বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী আর দেশে ফিরিল না, বিবাহও করিল না। নানা স্থানে চাকরি করিয়া অবশেষে চাঁপদানির মিলে কুলীর কাজে ভরতি হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে সর্দারের পদ পায়। কিছুদিন পূর্বে একটি লোহার কড়ি হাফিজ অর্থাৎ কপিকলে উত্তোলন করিবার সময় তার মাথায় চোট লাগে। তারপর একমাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। সম্প্রতি পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইয়া প্রেতরূপে এই তালগাছে বিরাজ করিতেছে।

শিবু একটা লম্বা টান মারিয়া কলিকাটি কারিয়া পিরেতকে দিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় মাটির ভিতর হইতে ভাঙা কাঁসরের মত আওয়াজ আসিল 'ভায়া কল্‌কেটায় কিছু আছে নাকি?"

বেলগাছের কাছে যে ইটের পাঁজা ছিল, তাহা হইতে খান-কতক ইট খসিয়া গেল এবং ফাঁকের ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মূর্তি বাহির হইল। স্থূল খর্ব দেহ, খেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া পাকা গোঁফ গজাইলে যে রকম হয়, সেই প্রকার মুখ, মাথায় টাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ঘুন্টি দেওয়া মের-জাই, পরণে ধুতি, পায়ে তালতলার চটি। আগন্তুক শিবুর হাত হইতে কলিকাটি লইয়া বলিলেন - 'ব্রাহ্মণ? দণ্ডবৎ হই। কিছু সম্পত্তি ছিল, এইখানে পোঁতা আছে। তাই যক্ষি হ'য়ে আগলাচ্ছি। বেশী কিছু নয়—এই দু পাঁচশো। সব বন্ধকী তমস্সুক দাদা ইষ্টাম্বর কাগজে লেখা—নগদ সিক্‌কা একটিও পাবে না। খবরদার, ওদিকে নজর দিও না—হাতে হাতকড়ি পড়বে, থুঃ থুঃ।"

শিবুর মেঘদূত একটু আধটু জানা ছিল। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, 'যক্ষ মহাশয়, আপনিই কি কালিদাসের—

যক্ষ—ভাইরাভাই, কালিদাস আমার মাসতুতো শালীকে বে করে।

ছোকরা হিজলিতে নিমকির গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে তুমি তার নাম জানলে কিসে হ্যা ?

শিবু—আপনার এখানে কতদিন আগমন হয়েছে ?

যক্ষ—আমার আগমন ? হ্যা, হ্যা ! আমি বলে গিয়ে সাড়ে তিন কুড়ি বচ্ছর এখানে আছি। কত এল দেখলুম, কত গেল তাও দেখলুম। আরে তুমি তো সেদিন এলে. কাটপিঁপড়ে তাড়িয়ে তিনবার হোঁচট খেযে গাছে উঠলে। সব দেখেছি আমি। তোমার গানের শখ আছে দেখছি, বেশ বেশ কালোয়াতি শিখতে যদি চাও তো আমার শাগরেদ হও দাদা। এখন আওয়াজটা যদিচ এক খোনা হয়ে গেছে, তবু মরা হাতি লাখ টাকা।

শিবু—মশায়ের ভূতপূর্ব পরিচয়টা জিজ্ঞাসা কবতে পারি কি ?

যক্ষ—বিলক্ষণ। আমাব নাম নদেবচাঁদ মল্লিক, পদবী বসু, জাতি কায়স্থ, নিবাস রিশড়ে, হাল সাকিন এই পাঁজার মধ্যে। সাবেক পেশা দারোগাগিরি ইলাকা বিশড়ে ইস্তক ভদ্রেশ্বব ! জর্জটি সাহেবের নাম শুনেছ ? হুগলির কলেক্টব. ভারি ভালবাসত আমাকে। মুল্লুকের শাসনটা তামাম আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল। নাদু মল্লিকেব দাপটে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

শিবু—মশায়ের পরিবারাদি কি ?

যক্ষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সব সুখ কি কপালে হয় রে দাদা ! ঘর সংসার সবই তো ছিল কিন্তু গিন্নীটি ছিলেন খাণ্ডার। বলব কি মশায়—আমি হলুম গিয়ে নাদু মল্লিক, কোম্পানির ফৌজদারী নিজামত আদালত যার মুঠোর মধ্যে, আমারই পিঠে দিলে কি না এক ঘা চেলাকাঠ কসিয়ে। তারপরেই পালাল বাপের বাড়ী। তিনশ চব্বিশ ধারায় ফেলতুম, কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর ছাড়লুম না। কিন্তু যাবে কোথা ? গুরু আছেন, ধর্ম্ম আছেন, সাতচল্লিশ সনের মড়কে মাগী ফৌত হ'ল। সংসার ধর্মে আর মন বসল না। জর্জটি সাহেব বিলেত গেলে আমিও পেনসন নিয়ে এক শখের যাত্রা খুললুম। তারপর পরমাই ফুরুলে এই হেথা আড্ডা

গেড়েছি। ছেলেপুলে হয়নি তাতে দুঃখু নেই দাদা। আমি করব রোজগার, আর কোন আবাগের বেটা-ভূত মানুষ হয়ে আমার ঘরে জন্ম নিয়ে সম্পত্তির ওয়ারিস হবে—সেটা আমার সইত না। এখন তোফা আছি। নিজের বিষয় নিজে আগলাই, গঙ্গার হাওয়া খাই আর বব বম্‌ করি। থাক, আমার কথা তো সব শুনলে, এখন তোমার কেচ্ছা বল।

শিবু নিজের ইতিহাস সমস্ত বিবৃত করিল, করিয়া পিরেতের পবিচয়ও দিল। যক্ষ বলিলেন—"সব স্যাঙাতের একই হাল দেখছি। পুরনো কথা ভেবে মন খারাপ ক'রে ফল নেই, এখন একটু গাওনা-বাজনা কবি এস। পাখোয়াজ নেই তেমন জুত হবে না। আচ্ছা, পেট চাপড়েই ঠেকা দিই। উহুঁ—ঢনঢন করছে। বাবা ছাতুখোর, একটু এঁটেল-মাটি চটকে এই মধ্যিখানে থাবড়ে দেতো! ঠিক হয়েছে। চৌতাল বোঝ? দু মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক। বোল শোন--

ধা ধা ধিন্‌ তা কৎ তা গে, গিন্নী যা দেন কর্তাকে।
ধরে তাড়া ক'রে খিটখিটে কথা কয়
ধূর্তা গিন্নী কর্তা গাধাবে।
ঘাড়ে ধরে ঘন ঘন ঘা কত ধুম্‌ ধুম্‌ দিতে থাকে
টুটি টিপে ঝুঁটি ধরে উল্‌টে পাল্‌টে ফ্যালে
গিন্নী ঘুটির ক্ষমতা কম নয়;
ধাক্‌কা ধুক্‌কি দিতে ত্রুটি ধনী করে না
নগণ্য নির্ধন কর্তা গাধা—
'ধা'-এর উপর সোম। ধিন্‌ তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা।
'এই 'ধা' ফসকালেই সব মাটি। গলাটা ধরে আসছে।
খোট্টা ভূত, আর এক ছিলিম সাজ বেটা!"

উদ্যোগী পুরুষের লক্ষীলাভ অনিবার্য। অনেক কাকুতি মিনতির পরে ডাকিনী শিবুর ঘর করিতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু সে এখনও

কথা বলে নাই, ঘোমটাও খোলে নাই, তবে ইশারায় সম্মতি জানাইয়াছে। আজ ভৌতিক পদ্ধতিতে শিবুর বিবাহ। সূর্যাস্ত হইবা মাত্র শিবু সর্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া স্নান করিল, গাবের আঠা দিয়া পৈতা মাজিল, ফণি মনসার বুরুশ দিয়া চুল আচড়াইল টিকিতে একটি পাকা তেলাকুচা বাঁধিল। ঝোপে ঝোপে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একরাশ ঘেঁটুফুল, বঁইচি, কয়েকটি পাকা নোনা ও বেল সংগ্রহ করিল। সন্ধ্যায় শেয়ালের ঐকতান আরম্ভ হইতেই সে ক্ষীরী বামনীর ভিটায় যাত্রা করিল।

সেদিন শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। ঘরের দাওয়ায় কচুপাতার আসনে ডাকিনীর সম্মুখে বসিয়া শিবু মন্ত্রপাঠের উদ্‌যোগ করিয়া উৎসুক চিত্তে বলিল—"এইবার ঘোমটা খুলতে হচ্ছে।" ডাকিনী ঘোমটা সরাইল। শিবু চমকিত হইয়া সভয়ে বলিল—অ্যা! তুমি নেত্য?"

নৃত্যকালী বলিল—"হ্যাঁরে মিন্‌সে। মনে করেছিলে মরে আমার কবল থেকে বাঁচবে। পেত্নী শাঁকচুন্নীর পিছু পিছু ঘুরতে বড় মজা, না?"

শিবু—এলে কি করে? ওলাউঠোয় নাকি?

নৃত্যকালী—ওলাউঠো শত্তুরদের হোক্। কেন, ঘরে কি কেরোসিন ছিল না?

শিবু—তাই চেহারাটা ফরসাপানা দেখাচ্ছে। পোড় খেলে সোনার জলুস বাড়ে। দাঁতটাও একটু নরম হয়েছে নাকি?

শুভকর্মে বাধা পড়িল। বাহিরে ও কিসের গোলযোগ? যেন একপাল শকুনি গৃধিনী ঝুটোপাটি কাড়াকাড়ি ছেড়াছিঁড়ি করিতেছে। সহসা উলকার মত ছুটিয়া আসিয়া পেত্নী ও শাঁকচুন্নী উঠানের বেড়ার আগড় ঠেলিয়া ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ করিল (ছাপাখানার দেবতাগণের সুবিধার জন্য চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলাম, পাঠকগণ ইচ্ছামত বসাইয়া লইবেন)।

পেত্নী—আমার সোয়ামি তোকে কেন দেব না?

শাঁকচুন্নী—আঃ মর্ বুড়ী, ও যে তোর নাতির বয়সী।

পেত্নী—আহা, কি আমার কনে বউ গা !

শাঁকচুন্নী—দূর মেছোপেত্নী, আমি যে ওর দুজন্ম আগেকার বউ।

পেত্নী—দূর গোবরচুন্নী, আমি যে ওর তিনজন্মের আগেকার বউ।

শাঁকচুন্নী—মর্ চেঁচিয়ে, ওদিকে ডাইনী মাগী মিন্‌সেকে নিয়ে উধাও হক।

তখন পেত্নী বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া আগড় বন্ধ করিয়া বলিল—"আগে তোর ঘাড় মটকাব তারপর ডাইনী বেটীকে খাব।"

কামড়াকামড়ি চুলোচুলি আরম্ভ হইল। একা নৃত্যকালীতেই রক্ষা নেই, তাহার উপর পূর্বতন দুই জন্মের আরো দুই পত্নী হাজির শিবু হাতে পৈতা গড়াইয়া ইষ্টমন্ত্র জপিতে লাগিল। নৃত্যকালী রাগে ফুলিতে লাগিল।

এমন সময় নেপথ্যে যক্ষের গলা শোনা গেল—

ধনী, শুনছ কিবা আনমনে,
ভাবছ বুঝি শ্যামের বাঁশি ডাকছে তোমায় বাঁশবনে।
ওটা যে খ্যাকশেয়ালী, দিও না কুলে কালি
রাতবিরেতে শ্যালকুকুরের ছুচোর্প্যাচার ডাক শুনে।

যক্ষ কাছে আসিয়া বলিলেন—"ভায়া এখানে হচ্ছে কি? এত গোল কিসের?"

কারিয়া পিরেত হাঁকল—"এ বরম পিচাস, আরে দরবাজা তো খোল।" শিবুর সাড়া নাই।

প্রচণ্ড ধাক্কা পড়িল, কিন্তু মন্ত্রবদ্ধ আগড় খুলিল না, বেড়াও খুলিল না। তখন কারিয়া পিরেত তারস্বরে উৎপাটনমন্ত্র পড়িল—

মারে জ্ জুয়ান—হেঁইয়া
আউর ভি থোড়া—হেঁইয়া
পর্বত তোড়ি—হেঁইয়া
চলে ইঞ্জন—হেঁইয়া
ফটে বয়লট—হেঁইয়া
খবরদার—হা-ফিজ।

মড়মড় করিয়া ঘরের চাল, দেওয়াল, বেড়া, আগড় সমস্ত আকাশে উঠিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

ডাকিনী অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া যক্ষ বলিলেন—"একি, গিন্নী। এখানে? বেহ্মদত্যিটার সঙ্গে! ছি ছি লজ্জার মাথা খেয়েছ?" ডাকিনী ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

কারিয়া পিরেত বলিল—আরে মুংরী, তোহর শরম নহি বা?

* * *

তারপর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল, তাহা মনে করিলেও কলমের কালি শুখাইয়া যায়। শিবুর তিনজন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী—এই ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভূশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হইল। ভূত, প্রেত, দৈত্য, পিশাচ, তাল, বেতাল প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে আসিল। স্পুক, পিক্সি, নোম, গবলিন প্রভৃতি গোঁফ কামানো বিলাতি ভূত বাঁশি বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন, জান, আফ্রিদ, মার্বাদ্ প্রভৃতি লম্বা দাড়িওয়ালা কাবুলী ভূত দাপাদাপি আরম্ভ করিল। চিং চাং, ফ্যাচাং প্রভৃতি মাকুন্দে চীনে-ভূত ডিগবাজি খাইতে লাগিল।

রাম রাম রাম। জয় হাড়িঝি চণ্ডী, আজ্ঞা কর মা! কে এই উৎকট দাম্পত্যসমস্যার সমাধান করিবে? আমার কম্ম নয়। ভূত-জাতি অতি নাছোড়বান্দা, ন্যায্য গণ্ডা ছাড়িবে না। পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব, ভূতের ভূতত্ব, পেত্নীর পেত্নীত্ব—এসব তাহারা বিলক্ষণ বোঝে। অতএব সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাঁড়ুজ্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয় গণযুক্তি করিয়া একটা বিলি-ব্যবস্থা করিয়া দিন—যাহাতে এই ভূতের সংসারটি ছারখারে না যায় এবং কোনরকম নীতি-বিগর্হিত বিদঘুটে ব্যাপার না ঘটে। নিতান্ত যদি না পারেন, তবে—চাঁদা তুলিয়া গয়ায় পিণ্ড দিবার চেষ্টা দেখুন, যাহাতে বেচারারা অতঃপর শান্তিতে থাকিতে পারে।

পরশুরাম (রাজশেখর বসু)

বাংলা গল্পসাহিত্যে পরশুরাম অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনে আজীবন নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যের আসরে নিজের আসনখানি স্থায়ী করে নিতে তাঁর দেরী হয়নি। তাঁর গল্প রচনা একান্তভাবেই অভিনব। তাঁর রচনার বিষয়-বস্তুগুলিও কম অভিনব নয়। বিষয়বস্তু এবং রচনাশৈলীর নতুনত্বেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। রাজশেখর রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। পরে তিনি বি. এল. পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' নামক সংস্থায় তিনি আজীবন যুক্ত ছিলেন। রাজশেখরের মৌলিক গল্প বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য সম্পদ। প্রাচীন রচনার নতুন মূল্যায়নেও তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। তিনি গড্ডালিকা, হনুমানের স্বপ্ন, ধুস্তুরীমায়া, গল্পকল্প প্রভৃতি গ্রন্থ ছদ্মনামেই লিখেছেন। 'চলন্তিকা' নামক বাংলা অভিধান তাঁর বিস্ময়কর কীর্তি। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— বাল্মীকি-রামায়ণ (সারানুবাদ), ব্যাসকৃত মহাভারত (সারানুবাদ), কালিদাসের মেঘদূত, লঘুগুরু ইত্যাদি। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তাঁর জন্ম হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।



হেমেন্দ্রকুমার রায়

সরকারী কাজে বিদেশে থাকি ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি। সাঁওতাল পরগণার যে জায়গায় আমার কর্ম্মস্থল ছিল, সেখান থেকে রেল স্টেশনে যেতে হলে প্রায় ত্রিশ মাইলেরও উপর পথ পার হতে হবে। পাহাড়ে পথ — এক এক মাইল হচ্ছে দু'তিন মাইলের ধাক্কা। তার উপরে রাতের বেলায় পথে বাঘ-ভল্লুকের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। সকাল বেলায় বেরুলেও মাঝপথে সন্ধ্যা হবেই তখন একটা আশ্রয়ের দরকার। মাঝপথের কাছাকাছি স্থানীয় রাজার একটি শিকারকুঠি ছিল। রাজারা তাঁর বন্ধুরা শিকারে বেরুলে এই কুঠি হ'ত তাদের প্রধান আস্তানা।

রাজার ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ ছিল। তাঁকে গিয়ে অনুরোধ জানালুম, শিকার-কুঠিতে একটা রাতের জন্যে আমাকে মাথা গোঁজবার জায়গা দিতে হবে।

ম্যানেজার বললেন, 'এখন শিকারের সময় নয়, কুঠি খালি পড়ে আছে। আপনি একরাত কেন, এক মাস থাকতে পারেন। এখানকার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট টেলের সাহেবও আজ রাতটা সেখানে বিশ্রাম করবেন। কুঠিতে আরো ঘর আছে, আপনারও থাকবার অসুবিধা হবে না। কিন্তু—'

—'কিন্তু কি?'

—'কিন্তু আপনি সেখানে রাত কাটাতে পারবেন কি ?

—'কেন পারব না ?'

—'লোকের মুখে শুনি কুঠিতে নাকি অপদেবতার ভয় আছে।'

—'অপদেবতা ?'

—'হ্যাঁ, অপদেবতা ছাড়া আর কি বলব ? কুঠির পাশেই শাল বনের ভেতর সাঁওতালদের এক ভূতুড়ে দেবতা আছে। সেই দেবতা নাকি ভূতের রাজা। তার ভয়ে সাঁওতালরা পর্যন্ত সন্ধ্যার পর ও-পাড়া মাড়ায় না। তারা বলে, তাদের দেবতা নাকি রাতের বেলায় কুঠির ভেতর ঘুমাতে আসে।

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, 'বেশ তো, মানুষ হয়ে দেবতার সঙ্গে রাত্রিবাস করব, এটা তো মস্ত পুণ্যের কথা! আমি রাজী!

ম্যানেজার বললেন, 'আমি অবশ্য ও-সব ছেলেমানুষী কথায়ততটা বিশ্বাস করি না, তবু বলা যায় না'—যথাসময়ে ডুলিতে চড়ে রওনা হয়ে সন্ধ্যার কিছু আগেই শিকার কুঠিতে পৌঁছলুম।

ডুলি বেচারারা বলে গেল মাইল তিনেক তফাতে একটা গাঁয়ে গিয়ে তারা আজকের রাতটা কাটাবে; কাল সকালে আবার ডুলি নিয়ে আসবে।

কুঠির বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ারে বসে টেলর সাহেব তামাকের পাইপ টানছিলেন। সাহেবের সঙ্গে আমারও বেশ পরিচয় ছিল। আমাকে দেখে সাহেব বললেন, 'এই যে, গুপ্ত যে! তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

—'ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি ...তুমি ?'

—'আমি 'হোমে' যাচ্ছি! তুমি কি আজ এখানে থাকবে ?'

—'হ্যাঁ সাহেব ?'

—'বেশ, বেশ, দুজনে এক সঙ্গে রাত কাটানো যাবে, এ ভালোই হল।'

—'দুজন কেন সাহেব, তিনজন।'

—'তিনজন আবার কে, তুমি কি আমার আর্দালীর কথা বলছ, ? ও, তাকে আমি মানুষের মধ্যে গণ্যই করি না।'

—'না সাহেব, তোমার আর্দালীর কথা বলছি না।'

—'তবে কি কুঠির দ্বারবানের কথা ভাবছ ? না, সে রাত্রে এখানে থাকে না।'

—না, না, আমি দ্বারবানের কথাও বলছি না !···তুমি কি শোনো নি সাহেব, সাঁওতালদের এক দেবতা রাত্রে আমাদের সঙ্গী হতে পারেন ?' টেলর হেসে বললে, 'ওহো, শুনেছি বটে। তা, সে রূপকথার এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না···তুমি কর নাকি ?'

'করলে, একলা এখানে রাত কাটাতে আসি ?'

টেলর পাইপে তিন-চারটে টান মেরে বললে, 'দেখ, গুপ্ত, সাঁওতালদের এই দেবতাটিকে আমি দেখেছি। এমন বীভৎস দেবতা পৃথিবীতে আর দুটি নেই। তাকে দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে।'

—'পছন্দ হয়েছে ?'

—হ্যাঁ। তাই ঠিক করেছি, কাল যাবার সময়ে তাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ইংলণ্ডে আমার বাড়ির বৈঠকখানায় তাকে সাজিয়ে রেখে দেবো। আমার বন্ধুরা তাকে দেখলে তারিফ করবেন।'

আমি হেসে বললুম, 'তা' হলে বোঝা যাচ্ছে, কাল থেকে দেবতা আর কুঠির ভেতর শুতে আসবেন না ? তবে এইবেলা তাঁকে একবার দর্শন করে আসি।···তাঁর আড্ডা কোথায় ?' টেলর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ঐ যে, ঐখানে ! মিনিট খানেকের পথ।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। কুঠির পাশেই অনেকগুলো শালগাছ দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরই ছায়ায় একটা পাথুরে ঢিপির উপরে মানুষের মত উঁচু একটা মূর্ত্তিকে দেখতে পেলুম।

মূর্ত্তিটা রঙ-করা কাঠের। তার দেহ মাঝ মানুষের মতন বটে, কিন্তু তার মুখ দাবানলের মতন প্রকাণ্ড ! আর সে মুখের ভাব কি ভয়ংকর। দেখলেই বুকের কাছটা ছ্যাং ছ্যাং করতে থাকে।

মাথার চুলগুলো সাপের মতন ঝুলছে, কান দুটো হাতীর মতন, মুখখানা খানিক সিংহ আর খানিক ভাল্লুকের মতন, দু, দুটো গোল গোল কাঁচের চোখ আগুনের মত জ্বলছে। হাঁ-করা বড় বড় দাঁত-ওয়ালা মুখের ভিতর থেকে-রাঙা টকটকে, লকলকে জিভের আধ-খানা বাইরে পড়ে ঝুলছে।

কাঁধ ও মুণ্ডের মাঝখানে গলাটা দেখলে মনে হয়, কে যেন একটা লিকলিকে সরু বাঁখারির উপরে মুখখানাকে বসিয়ে দিয়েছে। হাত দুখানা বাঘের থাবার মত। কোমরের কাছ থেকে পা পর্যন্ত দেহের কোন অঙ্গ দেখা যাচ্ছে না। কাঠকে ক্ষুদে আর কোন অঙ্গ গড়াই হয় নি। মূর্তির গায়ের রঙ আলকাতরার মত কালো আর মুখের রঙ খানিক সাদা, খানিক তামাটে ও খানিক হলদে!

ভাবলুম, এ মূর্ত্তি যদি সত্য সত্য রাত্রে কুঠির ভিতরে ঘুমোতে আসে তাহ'লে আমাদের ঘুম এ জীবনে আর ভাঙবে কি?···ধীরে ধীরে কুঠির দিকে ফিরে এলুম। টেলর পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল, আমাকে দেখে সে বললে 'গুপ্ত, খুব ঝড়-বৃষ্টি আসছে ঐ দেখ'

সত্য কথা পশ্চিমের আকাশখানা আচম্বিতে ঠিক যেন-কালো কষ্টিপাথর হয়ে গেছে। ঝড় উঠতে আর দেরি নেই।

ঝড় এসে সমস্ত অরণ্যকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে।

অনেক রাত। টেলরের নিমন্ত্রণ নিয়ে, তার সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেকক্ষণ আগে 'ডিনার' খেয়েছি। এখন টেলর তার ঘরে হয়তো দিব্যি আরামে নিদ্রা দিচ্ছে কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই।

ভূত-টুত কিছু মানি না—তবু কেন জানি না, মনটা কেমন খুঁত খুঁত করছে! রাজার সেই ম্যানেজারের কথাগুলো আর সাঁওতালী দেবতার সেই ভয়ানক মুখখানা মনের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত আনা-গোনা করছে। যত তাদের ভুলবার চেষ্টা করি আজেবাজে নানান্ কথা ভেবে তত তারা মনের উপরে চেপে বসে, নরম মাটির উপরে ভারী পায়ের দাগের মত।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, ঝম্ ঝম্' রম্ রম্ ! মাঝে মাঝে ঝোড়ো, দমকা হাওয়া হা হা হা করে উঠছে।—যেন কোন আহত আত্মার কান্না চারিদিক থেকে বনের গাছপালাগুলো মর্-মর্ মর্ করে যেন কোন শত্রুকে অভিশাপ দিচ্ছে! তারই ভিতর থেকে একবার শুনলুম হায়নার অট্টহাসি, একবাব শুনলুম শৃগালদলের মরাকান্না, একবার শুনলুম বাঘের গর্জন।···হঠাৎ আমার ঘবের দরজার উপরে হুম্ হুম করে আঘাত হল! ধড় মড় কবে আমি বিছানাব উপরে উঠে বসলুম সে কি আসছে? সে কি আসছে?

দরজার উপরে আর কোন আঘাত হল না। ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় দরজা নড়ে উঠেছে নিশ্চয়। নিজের কাপুরুষতার জন্যে মনে মনে নিজেই লজ্জিত হয়ে আবাব শুয়ে পড়বাব চেষ্টা করছি, এমন সময়ে বাহির থেকে খন্‌খনে ঝাঁঝালো গলায় গান শুনলুম—

'লোগোবুরু ধীরকো সিনিন ঘণ্টাবাড়ি না কাওয়াড়'। এ তো সাঁওতালী ভাষা। নিশ্চয়ই কোনো সাঁওতাল গান গাইছে! কিন্তু এত রাত্রে, এমন ঝড়-বাদলে, এই হিংস্র জন্তুভরা গভীর অরণ্যের মধ্যে কে সাঁওতাল মনের আনন্দে সখ করে গান গাইতে আসবে?

আবার দরজার উপরে ঘন ঘন আঘাত হল—এবারে আরো জোরে।···আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এ তো ঝড়ের ধাক্কা নয়, এ যে সত্য-সত্যই কে দরজা ঠেলছে আর ঠেলছে।···তবে কি সে এসেছে? তবে কি সে এখানে ঘুমাতে এসেছে?

অবার গান শুনলুম। এবারে আমার খুব কাছে, একেবারে কুঠির বারান্দার উপরে! সেই তীব্র খন্‌খনে গলার গান!

'লোগোবুরু ধীরকো সিনিন্ ঘান্টাবাড়ি মা কাওয়াড়'!

হঠাৎ উল্টো বিপদ! কুঠির ভিতর দিককার দরজায় ঘন ঘন আঘাত। ভিতর বাহিরে বিপদ দেখে প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছি, এমনি সময়ে শুনলুম—'গুপ্ত! গুপ্ত! ভগবানের দোহাই খোলো—দরজা খোলো শীগগির!'

এ তো টেলরের গলা !···আঃ বাঁচলুম ! তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম।

টেলর হুড়মুড় করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল—তার চোখ-মুখ পাগলের মত, তার হাতে বন্দুক।

আমি তাকে দু'হাতে চেপে ধরে বললুম 'মিঃ টেলর, হয়েছে কি ? এতরাত্রে কি দরকার তোমার ?'

টেলর দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললে, ,গুপ্ত আমার ঘরের দরজায় ক্রমাগত কে লাথি মারছে আর গান গাইছে। তুমিই কি আমার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আমাকে ডাকছিলে ?'

আমি বললুম, 'না না ! আমি বিছানা ছেড়ে একপাও নড়িনি ! কিন্তু আমারও ঘরের দরজা যে কে নাড়ছে আর গান গাইছে !···ঐ শোন' ! দুমদুম, ক'রে আমার ঘরের দরজায় আবার দুবার প্রচণ্ড আঘাত হল—সঙ্গে সঙ্গে সেই গান—

'লোগোবুরু ধীরাকো সিনিন ঘান্টাবাড়ি মা কাওয়াড়।'

আচমকা আবার একটা ঝড়েরঝাপটা এসেদরজা-জানালার উপরে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের আলোকে স্পষ্ট দেখলুম, বারান্দারউপরে কারএকটাজীবিত ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে ও ? কে ও? ও কি সেই ই—যে প্রতি রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসে··· আমার মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল !

টেলরের বন্দুক গুড়ুম, করে গর্জে উঠল—সঙ্গে সঙ্গেছায়ামূর্ত্তিটা সাঁৎ করে বারান্দারএকপাশে,আমাদের চোখেরআড়ালে সরে'গেল। টেলর চেঁচিয়ে উঠল, 'গুপ্ত ! গুপ্ত ! জানালা বন্ধ করে দাও—জানালা বন্ধ করে দাও।'

পা চলতে চাইছিলো না। কিন্তু পাছে টেলর মনে করে বাঙালী কাপুরুষ, সেই ভয়ে নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে দমন করে আমি জানালার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ করে দিলাম।

টেলর টলতে টলতে আমার বিছানার উপরে বসে পড়ে বললে,

'গুপ্ত ! কিছু মনে কবো না, আমি আজ তোমাব বিছানাতেই তোমার সঙ্গে রাত কাটাব।'

বাইরে আবাব কে গান গাইলে—

'লোগোবুরু ধীবকো সিনিন ঘান্টাবাড়ী মা কাওয়াড়।

সকালবেলা। কিন্তু তখনো সমানভাবে বৃষ্টি ঝবছে আব ঝরছেই। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাবান্দায় এসে দাঁড়ালুম। সাবা অকাশখানা যেন কালো মেঘেব ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা, সূর্যকে যেন আজ কোন অন্ধকার রাহু গ্রাস কবে ফেলেছে। যতদূব নজব চলে খালি দেখা যায় অগণ্য শ্যামল তরুব বিবাট সভা আব শৈলমালাব গর্বোন্নত শিখব এবং তারই ভিতরে এসে পড়েছে তীবেব চকচকে ফলার মত বৃষ্টিব অশ্রান্ত ধারাগুলো। কোথাও পশু-পক্ষী, কীট পতঙ্গ বা কোন জীবেব চিহ্ন পর্যন্ত নেই—পথেব উপব দিয়ে ক্রুদ্ধ জলস্রোত যেন কোন অদৃশ্য শত্রুকে বেগে আক্রমণ করতে ছুটে চলেছে।

হঠাৎ বারান্দার এক কোণে চোখ গেল। কাপড় মুড়ি দিয়ে কে একজন শুয়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে ডাকলুম, 'এই! কে তুই?'

বার কয়েক ডাকাডাকিব পর কাপড়ের ভিতব থেকে একখানা সাঁওতালী মুখ বেরুল!

—কে তুই' ?

—'আমি ঠাকুরের পূজারী'।

—'ঠাকুর! কে ঠাকুর?'

—যিনি ঐ শালবনে থাকেন।'

—'এখানে কি করছিলি?'

—,ঠাকুর রোজ রাতে এখানে ঘুমোতে আসেন।'

—'কাল রাত্রে তাহলে তুই-ই দবজা ঠেলেছিলি?'

—'আমিও ঠেলছিলুম, ঠাকুরও ঠেলছিলেন।'

—'আর গান গাইছিল কে?'

—আমি।'

এমন সময় টেলরও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তাকে সব

কথা খুলে বললুম। টেলর তো শুনেই মহা ক্ষাপ্পা, ঘুষি পাকিয়ে পুকুরের দিকে ছুটে যাবামাত্র সে একলাফে বারান্দার রেলিং টপকে বাইরে পড়ে, বনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টেলর বললে, 'রাস্কেলকে ধরতে পাবলে একবার দেখিয়ে দিতুম। ওঃ, সারারাত কি অশান্তিতেই কেটেছে!'

আমি বললুম, 'যাক্, যা হবার তা তো হয়ে গেছেই। এখন আমাদের কি উপায় হবে। কুঠির দ্বারবানও এল না, ডুলি বেচারাও এই দুর্যোগে বোধ হয় আসবে না। আমরা যাব কেমন করে?

টেলর বললে, 'আমাকে যেমন করেই হোক আজ যেতে হবেই। বোম্বে যাবার টিকিট পর্যন্ত আমি কিনে ফেলেছি। উপায় থাকলে তোমাকেও আমি ষ্টেশন পর্যন্ত পৌছে দিতুম। কিন্তু আমার টু-সিটার গাড়ি—আমি, আমার আর্দালী, তুমি, তোমার চাকর আর তোমার মালপত্তর অতটুকু গাড়িতে তো আর ধরবে না, কাজেই তোমাকে এখানে ফেলে রেখেই আমাকে যেতে হবে।—আর্দালী।'

টেলরের আর্দালী এসে সেলাম করলে।

টেলর বলছে, 'আমার মালপত্তর সব গুছিয়ে নিয়ে গাড়ীতে তোলো। তারপর শালবন থেকে সেই কাঠের পুতুলটা তুলে নিয়ে এস।'

আমি বললুম, 'তুমি কি সত্যি সত্যিই ঐ পুতুলটা ইংলণ্ডে নিয়ে যেতে চাও?'

টেলর বলল, 'নিশ্চয়! আমার যে কথা সেই কাজ।'

আবার রাত এল, বৃষ্টি এখনও থামেই, আমি এখনও কুঠিতে বন্দী হয়ে আছি।

টেলর চলে গেছে এবং যাবার সময়ে সাঁওতালদেরভূতেররাজাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সে আর এই কুঠির ভিতরে ঘুমোতে আসছে না।

চোখে ঘুম আসছিল না। একখানা ইংরেজী নভেল বার করে পড়তে বসলুম। ঘণ্টা দেড়েক পরে তন্দ্রার আবেশ এল। আলোটা

কমিয়ে দিয়ে শয়নের উপক্রম করছি, এমন সময়ে শুনলাম বাইরের সিঁড়ির উপরে আওয়াজ হল, ঠক্ ঠক্ ঠক্।

ঠিক যেন কাঠের আওয়াজ! ঠক্ ঠক্ করতে করতে আওয়াজই আমার ঘরের কাছ বরাবর এল, তারপর দরজার উপরে শুনলুম ধাক্কার পর ধাক্কা। কী আপদ! টেলর তো পুতুলটাকে নিয়ে কোন্ সকালে বিদায় হয়েছে, এ আবার কে জ্বালাতে এল!

নিশ্চয়ই সেই সাঁওতাল পুরুত ব্যাটা, সে হতভাগা রোজ রাত্রে এইখানে আরামকরে ঘুমায় আর চারিদিকে রটিয়ে দেয়কুঠীর ভিতরে ভূতের রাজা শুতে আসেন।

ধাক্কার জোর ক্রমেই বেড়ে চলল।...একবার ভাবলুম দরজা খুলে পুরুতটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দি। তারপর মনে হল সে কাজ ঠিক হবে না। এই দুর্যোগে বিজন জঙ্গলের ভিতরে রাত্রে একলা আমি এখানে আছি, যদি কোন দুষ্টলোক কুমতলবে এসে থাকে?

বন্দুকটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজার একজায়গায় একটা ছ্যাঁদা ছিল, বন্দুকের নলটা সেইখানে রেখে চেঁচিয়ে বললুম, 'কে আছ চলে যাও নইলে এখনি আমি বন্দুক ছুঁড়ব।'

কোন জবাব নেই, দরজার উপর ধাক্কাও থামল না।—'এখনো আমার কথা শোনো, নইলে—'

বাইরে বিশ্রী গলায় কে হাসতে লাগল—হি হি হিঃ, হি হি হিঃ হি হি হি হি হি—

আমি বন্দুকের ঘোড়াটিপলুম, সঙ্গে সঙ্গে দরজার উপরে ধাক্কাও থেমে গেল।

ঠক্ ঠক্ করে একটা আওয়াজ ঘরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল—তারপর কুঠীর সিঁড়ির উপরে শব্দ শুনলুম ঠক্ ঠক্ ঠক্।

খানিক পরে অনেক দূর থেকেআবারসেই বিশ্রী হাসি শোনা গেল, হি হি হিহি হি হিঃ, হিহি হিঃ হিহি হিহিহি—সে হাসি অমানুষিক··· শরীরের রক্ত যেন জল করে দেয়।

শেষ রাতে জল ধরে গেল।

সকালেদরজা খুলতেই কাঁচা সোনার মতন কচি রোদ এসে ঘরখানা যেন হাসিতে ভরিয়ে তুলল ? রোদ দেখে মনটা খুশী হয়ে উঠল।

বারান্দায় বেরিয়েই দেখি' এককোণে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে শুয়ে রয়েছে। তেড়ে গিয়ে মারলুম তাকে এক ধাক্কা। ধড়মড় করে সে উঠে বসল। সেই সাঁওতাল পুরুতটা।

ক্রুদ্ধস্বরে বললুম, 'কাল আবার কি করতে এখানে এসেছিলি ? ভারী চালাকী পেয়েছিস্, না . লোকটার মুখের ভাব একটুও বদলাল না। শান্তস্বরে বললে, 'আমার ঠাকুর কাল এখানে ঘুমোতে এসেছিলেন আমি তাই এসেছিলুম।'

—'তোর ঠাকুর কোথায় ? সাহেব তো তাকে নিয়ে চলে গেছে।'

—'আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন, সেইখানেই আছেন।'

—'মিথ্যা কথা ! আমি নিজের চোখে দেখেছি' টেলর তাকে নিয়ে চলে গেছে।'

'—আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন, সেইখানেই আছেন।'

কুঠী থেকেবেরিয়ে পড়ে ছুটে পাশের শালবনে গিয়েহাজির হলুম। সবিস্ময়ে দেখলুম, ভূতের রাজা চোখ পাকিয়ে লক্‌লকে জিভ বার করে ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

আর—আর, ওকি ? মূর্ত্তির পেটের উপরে একটা গর্ত ঠিক যেন বন্দুকের গুলির দাগ ! গর্তের চারপাশে রক্ত জমাট হয়ে আছে—মূর্ত্তির আরো নানা জায়গাতেও রক্তের চিহ্ন।

তবে কি আমারবন্দুকের গুলিই- ভাবতে পারলুম না, মূর্ত্তিরদিকে আর তাকাতেও পারলুম না, কেমন একটা অজানা ভয়ে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল—প্রাণপণে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে—এলুম।

কলকাতায় ফিরে এসেই খবরের কাগজে এই বিবরণ পড়লুম—সাঁওতাল পরগনার পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ জে টেলর কর্ম হইতে অবসর লইয়া বিলাতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু পথের মধ্যে এক বিপদে

পড়িয়া খুব সম্ভব তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন। স্থানীয় জঙ্গলের ভিতরে তাহার মোটর গাড়ি পাওয়া গিয়াছে। মোটরের উপরে, ভিতরে ও চারিপাশে রক্তের দাগও, কিন্তু মিঃ টেলর ও তাঁহাব আর্দালীর কোনই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না ? পুলিশ সন্দেহ করিতেছে, মিঃ টেলর ও তাঁহার আর্দালীকে ব্যাঘ্র বা অন্য কোন হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিয়াছে নিকটস্থ জঙ্গলে এক নরখাদক ব্যাঘ্রেরও খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।

সেই ভূতুড়ে মূর্ত্তিব গায়ে যে বক্তের দাগ লেগেছিল, তাহ'লে সে রক্ত হচ্ছে হতভাগ্য টেলবের আর তাব আর্দালীর গায়ের বক্ত !

এবং সেই সাঁওতাল পুরুতটাই নিশ্চয় কোন গতিকে খবর পেয়ে ভূতের রাজাকে আবাব শালবনে ফিরিয়ে এনেছিল !

মনকে এই বলে প্রবোধ দিলুম বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলুম, শিকার কুঠিতে আব কখনো রাত্রিবাস কববোনা। কিসে কি হয়, কে জানে ?

হেমেন্দ্রকুমার রায়

১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্রের পরিপূর্ণ আলোয় যখন বাংলা সাহিত্য উদ্‌ভাসিত তখন অপরাপর কয়েকজন লেখকও স্বকীয় বৈশিষ্টে উজ্জ্বল ছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার তাঁদের অন্যতম। মূলতঃ রোমাঞ্চকর বিষয় বস্তুর প্রতিই তাঁর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় বেশী। তাছাড়া ভ্রমণ কাহিনী, অলৌকিক রচনা এবং কিশোরদের উপযোগী অজস্র কাহিনীর জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। হেমেন্দ্রকুমারের রচনার বৈশিষ্ট তাঁর গদ্যের সাবলীলতা এবং পরিবেশ বর্ণনায় নিখুঁত পরিপাট্য। অত্যন্ত ঘরোয়া ভঙ্গিতে তিনি গল্পকে উপস্থাপিত করেন এবং তা সহজেই পাঠকের চিত্তে দোলা দিয়ে যায়। আজকের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের অনেকেই তাঁর রচনা পড়ে কৈশোরের স্মৃতিকে খুঁজে পাবেন সন্দেহ নেই। তিনি একদা আশ্চর্য রকমের জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।



মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখতুম, আমার আত্মীয়রা আমায় তিরস্কার করতেন, বন্ধুরা ঠাট্টা করতেন, মাষ্টারমশাই প্রহারদিতেন এবং কাগজের সম্পাদকেরা না-ছেপে ফেরৎ দিতেন। কিন্তু বলে রাখি, একদিন সমূহ বিপদ্ থেকে যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল' সে শুধু আমার ঐ কবিত্বশক্তির জোরে। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ কবিতা আমার প্রাণরক্ষা করলে কেমন ক'রে? সত্যি বলছি, সেদিন কারো সাধ্য ছিল না যে, মরণাপন্ন আমাকে রক্ষা করে? ভাগ্যে কবিতা লিখতে শিখেছিলুম, তাই বেঁচে গেলুম। নইলে লোকের অত্যাচারে কবিতা লক্ষ্মীকে বাল্যবয়সে বিদায় দিলে সেদিন আমার যে কি অবস্থা হতো, তা আমিই জানি।

গল্পটা তাহ'লে খুলেই বলি। নানা স্থান ঘুরে আমি যাচ্ছিলুম জয়পুর থেকে দিল্লী। টাইম-টেব্‌ল্ খুলে দেখলুম, টানা দিল্লী যেতে হলে রাত্রের গাড়িতেই সুবিধে। কিন্তু সে-ট্রেন অনেক রাত্রে ছাড়ে— প্রায় দু'টো। একেজয়পুরের মতো জায়গা, তায় মাঘ মাসের শীত, তার উপররাত্রিদুটো এইত্র্যহস্পর্শঘাড়ে নিয়ে যাত্রা করতে আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগলো। কিন্তু উপায় কি? আমি ষ্টেশন-মাষ্টারকে বল্লুম —"কি উপায় করা যায়, বলুন দেখি? এই দারুন শীতে ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ট্রেন ধরবার কথা মনে করতেই তো আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে!"

ষ্টেশন-মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি ফার্ষ্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার? তখন বড়দিনের ছুটিতে রেল-কোম্পানী আধাভাড়ায় সর্ব্বত্র যাতাতের ব্যবস্থা করায় আমি সস্তায় বড় মানুষি করেছিলুম। বুক ফুলিয়ে বল্লুম—"হ্যাঁ, আমার ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট।" ষ্টেশন মাষ্টার বল্লেন—"প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে খুব একটা ভাল ব্যবস্থা আছে।"

আমি বল্লুম—"কি ?"

তিনি বল্লেন—"আপনি এক কাজ করবেন। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে ষ্টেশনে আসবেন। আপনার জন্যে একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ি ঐ সাইডিঙে কেটে রেখে দেবো, আপনি তাতেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়বেন লেপ মুড়ি দিয়ে। তারপর রাত্রে যখন মেল আসবে, তাতেই আপনার গাড়ী লাগিয়ে দেবো—আপনি দিব্যি ঘুমতে ঘুমতে দিল্লী গিয়ে পৌঁছবেন।"

আমি বল্লুম—"বাঃ এতো বেশ!"

ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন—"হ্যাঁ শীতের রাতে গাড়ি ধরবার অসুবিধে বলেই তো কোম্পানী বড় লোক যাত্রীদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন।"

আমি বল্লুম—"খুব ভালো ব্যবস্থা। আমি আটটার মধ্যেই আসবো—আপনি গাড়ি ঠিক করে রাখবেন।" তিনি বল্লেন—"গাড়ি ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি দেরী করবেন না! আটটার পর আর ট্রেন নেই ব'লে আমরা আটটার সময় ষ্টেশন বন্ধ করে চলে যাই।"

আমি বল্লুম—"আটটার মধ্যেই আসবো।" বলে আমি চলে গেলুম।

তারপর সন্ধ্যাবেলা আহারাদি সেরে পায়ে তিন জোড়া ডবল-মোজা, গায়ে দুটো গরম গেঞ্জির উপর একটা মোটা ফ্লানেলের কামিজ' তার উপর সোয়েটার, তার উপর তুলো ভরা মেরজাই, তার উপর ওয়েষ্ট কোট, কোট, ওভার-কোট এবং সর্ব্বোপরি একটা মোটা বালাপোষ মুড়ি দিয়ে, মাথাটাকে কান-চাপা টুপি ও পশমের গলাবন্ধ দিয়ে এঁটে কাঁপতে কাঁপতে ঠিক আটটার সময় ষ্টেশনে এসে হাজির হলুম।

আমার মস্ত-বড় লোহার তোরঙ্গটা দু'জন কুলি এসে ধরাধরি ক'রে নামাতে গিয়ে একজন ফিক্ ক'রে একটু হেসে ছেড়ে দিলে।—আমি বল্লুম—"কেয়া হলো রে?"

সে বল্লে—"বাবুজির তোরঙ্গ দেখছি ফাঁকা। যা দু'-একঠো ধুতি উতি আছে, সেগুলি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সটি আমাদের বখশিস্ ক'রে যান বাবু—আপনার কুলি-ভাড়া, রেল-মাশুল অনেক বেঁচে যাবে।"

আমি বল্লুম—"যা, যা, তোমকো আর ইয়ে করতে হবে না!" ব'লেই আমি হন্ হন্ ক'রে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরের দিকে চলে গেলুম। ষ্টেশন-মাস্টার আমাকে দেখেই বল্লেন—"গুড ইভিনিং বাবু। আপনার ভাগ্য খুব ভালো। আজ আর কোন প্যাসেঞ্জার নেই; সমস্ত গাড়িটাই আপনার একলার। চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।" ব'লে তিনি আমাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে, পাঁচ-ছয়টা রেল-লাইন টপ্‌কে অনেক দূর চলে চলে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে এনে দাঁড় করালেন। সামনে দেখলুম, একখানা ধোঁয়াটে রঙের গাড়ি কাটা পড়ে রয়েছে—ঠিক যেন একটা স্কন্ধকাটা, অন্ধকারের আড়ালে গা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! মাষ্টারবাবু গাড়িটার চাবিখুলে দিয়ে বল্লেন—"নিন্—উঠে পড়ুন। বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন।" বলেই তাড়াতাড়ি তাঁর হাত বাতিটা তুলে নিয়ে "গুড নাইট"—ব'লে ছুট দিলেন। অন্ধকারে তাকে আর দেখতে পেলুম না, রেল-লাইনের খোয়াগুলোর উপর তাঁর জুতোর খস্‌খস্ শব্দ কেবল শুনতে লাগলুম। ছ্যাঁৎ ক'রে আমার মনে হলো—তাই তো মাষ্টারবাবু অমন ক'রে পালালেন কেন?

ইতিমধ্যে দেখি, কুলি-দুটো আমার তোরঙ্গ ও বিছানাটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েই বলছে—"বাবুজি পয়সা;" আমি তাদের হাতে পয়সা দিতেই, তারাও ছুট্ দিল ষ্টেশনের দিকে। ব্যাপার কি? আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ভাবছি, দেখি দুটো কয়লা-মাখা কালো ভূত রেল-লাইনের বাঁধের নীচে থেকে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কেবল

চারটে সাদা চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেখতে ষ্টেশনের দিকে চলে গেল। তাদের পিছনে একটা কুকুর ল্যাজ তুলে দৌড় দিলে। তার পরেই সব একেবারে নিস্তব্ধ! একেবারে অন্ধকার।

অমাবস্যার রাত্রি—চারিদিক অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট্‌ করছে। সেই অন্ধকারে একটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক্‌ চারিদিক্‌ দেখতে লাগলুম—আশে পাশে কেউ নেই; দূরে কেবল গাছগুলো অসাড় হয়ে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের ভিতরটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করতে লাগলো।

আমি আস্তে আস্তে গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলুম গাড়ির ভিতরটা একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। তাড়াতাড়ি দেওয়াল হাৎড়ে বিজ্‌লিবাতির চাবি টিপলুম—খুট ক'রে শব্দ হলো, আলো হলো না। সর্বনাশ! আলো নাই না কি? আলোর সুইচ্‌ নিয়ে অনেক নাড়ানাড়ি করলুম, কোনই ফল হলো না, যেমন অন্ধকার তেমনই, পকেট-খুঁজলুম, দিয়েশালাই নেই। কেমন ক'রেই বা থাকবে? তোরঙ্গের মধ্যে একটা দিয়েশালাই আছে! চাবি খুঁজতে লাগলুম, পৈতেতে চাবি বাঁধা ছিল, বালাপোষ, ওভার-কোট, কোট, ওয়েস্ট কোট, সোয়েটার গেঞ্জির গোলক-ধাধার মধ্যে কোথায়যে পৈতে গাছটা হারালো, কিছুতেই খুঁজে পেলুম না। বামুনের ছেলে, বিপদে আপদে, বিদেশবিভূঁয়ে যজ্ঞোপবীতটাই মস্ত সহায়! সেটাও শেষে খোওয়ালুম!

সেই অন্ধকারে আমার যেন হাঁপ ধরতে লাগলো। অন্ধকার যে জাঁতাকলের মত মানুষের বুককে এমন ক'রে পিষতে থাকে এ আমি জানতুম না? আমি গাড়ীর মধ্যে এদিক্‌ ওদিক ক'রে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলুম, কানে কাদের সব ফিস্‌ ফিস্‌ কথা এসে লাগতে লাগলো। কোথাও একটু আলো পাই? আমি ছুটে গাড়ি থেকে বেরিয়ে রেলের লাইন থেকে দুটোপাথর তুলে ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে সজোরে ঠুক্‌তে লাগলুম—যদি একটুআলোর ফিন্‌ কি পাই। কিন্তু হায়অদৃষ্ট, আলোর বদলে পাথরের কুচির ফিন্‌কি এসে আমার চোখ-দুটোকে ঝন্‌ঝনিয়ে দিলে!

আমি দু-হাতে চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে ষ্টেশনের দিকে ছুট্ দিলুম, যেমন ক'রে পারি, সেখান থেকে একটা আলো নিয়ে আসব। ষ্টেশন-মাষ্টারটা কি পাজি ? এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আমায় একা ফেলে গেল, একটা আলো দিল না ! বল্লে কি না, দিব্যি ঘুমতে ঘুমতে যাবেন ! পাজি কোথাকার !

আমি ছুটতে ছুটতে একেবারে ষ্টেশনের কাছে এসে হাঁপ নিয়ে দাঁড়ালাম—প্লাটফর্মের—কিনারায় যে একটা বাঁকা খেজুরগাছ ছিল, ঠিক তার সাম্‌নে। কিন্তু এ কি ? এই তো সেই খেজুর গাছ, এই তো, এই তো রয়েছে। কিন্তু ষ্টেশন কোথায় ? আমি এদিক ওদিক্ চারিদিক্ চেয়ে দেখলুম ষ্টেশন নেই। মনে হলো, কালো শ্লেটের গা থেকে ছেলেরা যেমন তাদের আঁকা ছবিগুলো মুছে ফেলে, ঠিক তেমনি ক'রে অন্ধকারের গা থেকে ষ্টেশনকে একেবারে কে মুছে ফেলেছে।

আমার বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠলো। আমি তিলমাত্র না দাঁড়িয়ে আবারছুটলাম্—যে-পথে এসেছিলুম, সেই পথে আমারগাড়ির দিকে টপাটপ্ পাঁচ-ছয়টা লাইনটপ্‌কে ছুটতে ছুটতে আমিযখন সেই মাঠের ধারে আমার গাড়ির সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম, তখন দেখি অতবড় গাড়িখানা নিয়ে কে উধাও হয়েছে। গাড়ির চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। কি সর্বনাশ !

আবার ভালো ক'রে চারিদিক্ চেয়ে দেখলুম—ষ্টেশনও নেই, গাড়িও কোথায় ? করি কি ! একবার মনে হলো, যাই, আর একবার গিয়ে ভালো ক'রে ষ্টেশনটা খুঁজে আসি। কিন্তু ষ্টেশনের দিকটার সেই খাঁ-খাঁ মূর্ত্তি মনে হতে আমার বুকটা ছ্যাৎ ক'রে উঠলো ! ছেলেবেলায় গল্পে শুনতুম, দৈত্যদানারারাতারাতিবড়-বড় বাড়ি উড়িয়েনিয়ে গিয়ে আবার সকালে যেখানকার বাড়ি সেইখানে রেখে যেতো—একি তাই হলো নাকি ? মনে তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোখে তো দেখছি তাই।

হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠে মনে হলো, এমন ক'রে রেল-লাইনের

উপরদাঁড়িয়ে থাকা তো ঠিক নয়—আচম্‌কা একখানি গাড়িএসে চাপা দিয়ে যেতে পাবে। যেই এইকথা মনে হওয়া, তাড়াতাড়ি লাইন থেকে সরে অন্যদিকে ছুটে—গেলুম। কিন্তু যেদিকে যাই, সেইদিকেই রেলের লাইন, সামনে পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, যে দিকে ছুটি সেইদিকেই দেখি বেলেব লাইন লোহার জাল দিয়ে আমায় ঘিরে ফেলেছে—পালাবাব উপায় আব নেই। আমাব এই ছুটোছুটি দেখে অন্ধকার থেকে কাবা যেন হঠাৎ খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলো। আমি চম্‌কে উঠে থেমে দাঁডাতেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে বাঁধেব উপব থেকে গড়াতে গড়াতেনীচে এক গাছতলায় এসে পড়লুম মনে হলো প্রাণটা যেন বাঁচলো! ট্রেন-চাপা পড়বার আর ভয় নেই

গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপ কবে বসে রইলুম। মনে হ'তে লাগলো কতক্ষণে বাত্রিটা কাটবে। কিন্তু রাত্রিবযেন আর শেষ নেই। বসে বসে দেখতে লাগলুম,নিস্তব্ধ বাত্রি ঝিম্‌-ঝিম্‌ কবতে কবতে আরো নিঝুম চিকেব ডানাব মতো একখানা কালো কুৎসিত কম্বল আস্তে আস্তে টেনে মুড়ে দিচ্ছে পৃথিবীব গা থেকে একে একে সব জিনিষ যেন মুছে আস্‌ছে। দেখতে-দেখতে আমি শুদ্ধ যেন মুছে আসতে লাগলুম। কালো জুতো-মোজা পবা আমার লম্বা পা দুখানা একটু একটু ক'বে মুছে গেল। কালো ওভার কোট ও নীল বালাপোষ মোড়া-গা—তাও আস্তে আস্তে মুছতে লাগলো। যখন প্রায় কোমর অবধিমুছে-গেছে, আমি আর সে দৃশ্য দেখতে পাবলুম না তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেল্লুম। চোখ বুজে—মনে হতে লাগলো—আমি আছি কি নেই? আছি কি নেই?

"আছি আছি—এইখানে আছে।" ব'লে কানের কাছে কে একজন চীৎকার ক'রে উঠলো। আমি চোখ চেয়ে দেখি, মানুষের দেহেব মেদ-মাংস ছাড়িয়ে নিলে যেমন হয়, তেমনিতর একটা কঙ্কাল তার কাঠির মতো সরু সরু লম্বা আঙুল নেড়ে ইসারা ক'রে কাকে ডাকছে। দেখতে দেখতে ঠিক তারই জুড়ি আর একটা কঙ্কাল লাফাতে লাফাতে তার পাশে এসে দাঁড়াল্লো।

তারপর আর একটা।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা আস্তে আস্তে সরে আমার খুব কাছে এসে ঘাড় হেঁট ক'রে আমাকে দেখতে লাগলো। তার চোখের ওপর চোখ পড়তে দেখলুম—না আছে পাতা, না আছে তারা, শুধু দুটো গোল গোল গহ্বর কালো কট্‌কট্‌ করছে। সে আমাকে বেশ নিরীক্ষণ ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—"এই নাকি সে?"

প্রথম কঙ্কালটা বল্লে—"বেশ বেমালুম লুকিয়েছে তো, একেবারে চেনবার জো নেই।"

শেষ কঙ্কালটা ছুটে এসে বল্লে—"কৈ, দেখি।" ব'লে তার হাড় বার-করা আঙ্গুলগুলো দিয়ে টিপে টিপে আমায় দেখতে লাগলো।

"ও আর দেখছিস কি? ও সে ই! আমার চোখে কি ধূলো দেবার জো আছে—হাজারই লুকোক না।" ব'লে প্রথম কঙ্কালটা এতখানি হাঁ ক'রে বিরাট শব্দে হেসে উঠলো। মুখের ভিতর থেকে তার সেই সাদা সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে অন্ধকারকে যেন কামড়ে ধরল।

শেষ কঙ্কালটা বল্লে—"তবু একটু পরখ করতে হবে না; ওদিকে লগ্ন বয়ে যায়।" ব'লে সে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি ভাবলুম ব্যস্‌, এইবার আমার শেষ!

দেখতে দেখতে বাকি-দুটো কঙ্কাল এগিয়ে এসে আমার পা-দুখানা ধরলে, প্রথমটা মাথার দিকটা ধরলে; তারপর তিনজনে মাটি থেকে চ্যাং-দোলা ক'রে আমায় তুলে ফেল্লে। আমি তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে গাছের গুঁড়িটা চেপে ধরে বলে উঠলুম—"কোথায় নিয়ে যান মশাই?"

তারা বল্লে—"বিয়ে দিতে।"

আমি চমকে উঠে বল্লুম—"বিয়ে দিতে কি মশাই! এই বুড়ো বয়সে?"

একজন বল্লে—"বুড়ো বরই পছন্দ করি।"

আমি বল্লুম—"মশায় আমার চেয়ে ঢের বুড়ো আছে, তাদের কাউকে নিয়ে যান্ না, আমায় কেন মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন।"

প্রথম কঙ্কালটা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো—"তুমি ভেবেছ, পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকলে রেহাই পাবে? তোমাকে আমরা জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেবো।"

আমি বল্লুম—"আমি তো মশাই, পালিয়ে এসে লুকিয়ে নেই। সেই ছেলেবেলায় একবাব পালিয়েছিলুম বটে; তারপর তো জ্যাঠা মশাই পুলিশ দিয়ে ট্রেন থেকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে দেন।"

সে বল্লে—"আমরাও পুলিশ এসেছি; ধ'রে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দেবো ব'লে।"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বল্লুম—"কিন্তু আমি তো আর বিয়ে করতে পারব না।"

"পারবে না কি? বিয়ে তোমায় করতেই হবে। এমন কি তোমার গো?" ব'লে সেই পয়লা নম্বরের কঙ্কালটা ভীষণ গর্জন ক'রে উঠলো।"

আমি বল্লুম—"রাগ করেন কেন মশাই? আমি ছাড়া কি আর পাত্র নেই? কত ছেলে হয়তো খুসী হয়ে বিয়ে করবে।"

সে বল্লে—"এত রাত্রে এখন ভালো পাত্র পাই কোথায়? যার তার হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না, চল, লগ্ন বয়ে যায়।"

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লুম—"তাহলে নিতান্তই কি আমাকে বিয়ে করতে হবে?"

শেষ কঙ্কালটা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নরম সুরে বল্লে—"দুঃখ করছিস কেন ভাই ক্যাংলা।

আমি তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লুম—"ক্যাংলা কে মশাই!

আমি তো ক্যাংলা নই। আমি শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমার পিতার নাম ৺মধুসূদন চক্রবর্ত্তী।"

প্রথম কঙ্কালটা হো-হো ক'রে হেসে উঠে বল্লে "বাধে মাধব! বাধে মাধব!"

আমি বল্লুম—"সে কি মশাই?"

সে বল্লে—"এই এতরাত্রে, এই শ্মশানের ধারে একটা জ্যান্ত শিয়াল কুকুর থাকে না, আর মাধব চক্রবর্ত্তী আছে? তুই এতই বোকা পেলি আমাদের?" আমি বল্লুম—"এই তো আমি রয়েছি।" সে বল্লে—"আরে ভাই, মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহের ভিতর আবার কে এলো।"

সে বল্লে—"আরে ক্যাংলা, তুই মাধব চক্রবর্ত্তীর শূন্য দেহের মধ্যে সেঁধিয়ে আছিস, সে কি আমি টের পাইনি ভেবেছিস?"

আমি বল্লুম—"এসব কি হেঁয়ালি বকছেন মশাই? মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহের মধ্যে যদি ক্যাংলা এলো, তো মাধব চক্রবর্ত্তী গেল কোথা?"

সে বল্লে—"আরে ভাই, বামুনের ছেলে সে, বৈকুণ্ঠে গেছে।"

আমি বল্লুম—"না-মরেই সে বৈকুণ্ঠে গেল?" সে বল্লে—"মরেছে না তো কি?"

আমি বল্লুম—"মরেছে কি রকম! সে মরে গেল আর টের পেলে না?"

সে বল্লে—"মানুষ কখন জন্মায় আর কখন মরে, সে তা টের পায় না কি!"

কথাটা শুনে বোঁ ক'রে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমার অজান্তে আমি মরে গেলুম না কি অ্যাঁ? সেই যে দেখলুম পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব মুছে আসছে—সেই কি আমার মৃত্যু না কি? কিন্তু এই তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা বটে। কিন্তু তবু কেমন

সন্দেহ হতে লাগলো। হয়তো এ আমি নই—এ আর কার আত্মা আমার শূন্য শরীর দখল করেছে। নইলে এই কঙ্কালগুলোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইতে পারতুম? জ্যান্ত মানুষ কি কখনো তা পারে? কিন্তু মরে গেলুম কেমন করে? আমার তো রোগ হয়নি। হয়তো ঐ বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ার সময়ে পাথরে মাথা লেগে আমার মৃত্যু হয়েছে—আমি টের পাই নি।

ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গুলিয়ে যেতে লাগলো। কেমন মনে হ'তে লাগলো—না, আমি মাধব চক্রবর্ত্তী নই। এবং ঠিকই বলেছে—কাঙালীচরণের আত্মা আমার শূন্য দেহের মধ্যে এসে আসন পেতে বসেছে। তাইতো আমার দেহের ভ্রম হচ্ছে, মাধব চক্রবর্ত্তীর জের বুঝি এখনো চলছে কিন্তু কাঙালীচরণ লোকটা কে? আমি যদি কাঙালীচরণ হব, তবে আমি আমাকে চিনতে পারছি না কেন? এরা তো চিনতে পেরেছে।

প্রথম কঙ্কালটা ব'লে উঠলো—"কি হে ক্যাংলা, কি ভাবছ? বিয়ে করবার মতি স্থির হলো।" আমি বল্লুম—"আচ্ছা মশাই, আমি কি সত্যি কাঙালীচরণ?"

সে খানিক আমার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে বল্লে—"সে কিরে ক্যাংলা, তুই নিজেকে নিজে চিনতে পারছিস্ না?"

আমি বল্লুম—"না।"

সে বল্লে—"সর্ব্বনাশ হয়েছে! তুই আমাদেরও চিনতে পারছিস না?"

আমি বল্লুম—"একটুও না।"

সে বল্লে—"তোর মনে পড়ছে না—আজ এই অমাবস্যার দিনে ঘুটঘুটে লগ্নে তোর বিয়ে—বাগেশ্বরীর সঙ্গে?"

আমি বল্লুম—"কৈ আমার তো কোন বিয়ের কথা হয়নি!" সে বল্লে—"সে কিরে! তোর গায়ে-গোবর পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, মনে পড়ছে না?"

আমি বল্লুম—"গায়ে-গোবর কাকে বলে?"

সে বল্লে—"তুই অবাক করলি। তোর কিছু মনে পড়ছে না? গায়ে গোবরের দিন ভোর রাত্রে তালপুকুরে তুই মাছ মারতে যাচ্ছিলি তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে, তালগাছের মাথায় বসে পা ঝুলিয়ে বাগেশ্বরী বনপণের কড়ি বাচছিল, তুই বাগেশ্বরীকে দেখ্‌তে পাস্‌ নি, সেও তোকে দেখতে পায়নি, তারপর তুই যেমন ঠিক তাল গাছের তলাটিতে এসেছিস্‌, অমনি বাগেশ্বরীর পা দুটো দুল্‌তে দুল্‌তে তোর কপালে এসে ঠক্‌ ক'রে লেগে গেল। বাগেশ্বরী তো লজ্জায় সাত হাত জিভ্‌ কেটে, মাথায় ঘোম্‌টা টেনে দৌড়? আর তুই বাড়িতে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বল্লি ও মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। কেন রে, কেন কি হয়েছে? তুই বল্লি,—ওর পা আমার কপালে ঠেকেছে। তাতে হয়েছে কি? তুই বল্লি—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। ব'লে তুই—কপাল চাপড়াতে লাগলি। এ সব তোর মনে পড়ছে না?"

আমি বল্লুম—"মনে পড়ছে, ওই রকম একটা গল্প যেন কোথায় শুনেছিলুম। তারপর কি হলো?"

সে বল্লে—"সর্বনাশ করলি। তারপরেও তোর মনে পড়ছে না? তারপর তো গুরুঠাকুর এলেন; এসে বিধান দিলেন যে, বাগেশ্বরীর পা তোর মাথায় একবার ঠেকেছে, দুই-সাত—একে—সাতশোবার তোর পা দিয়ে তার মাথাটা থেৎলে দে, তা হ'লেই সব দোষ খণ্ডে যাবে। তুই বল্লি ওরে বাপরে; বাগেশ্বরীর মাথায় লাথি-মারা; সে আমি পারব না;—ব'লে তুই ছুট্‌ দিলি।"

আমি বল্লুম—"তারপর?"

সে বল্লে—"তারপর আজ বিয়ের সময় তোকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে খুঁজতে এই শ্মশানঘাটে এসে দেখি, তুই এই মাধব চক্রবর্ত্তীর মড়াটাকে দানা পাইয়ে বসে আছিস্‌। হাঁরে, এই মাধব চক্রবর্ত্তীকে যারা পোড়াতে এসেছিল, তারা গেল কোথায়; তোকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে বুঝি?"

আমি বল্লুম—"মাধব চক্রবর্ত্তীকে আবার পোড়াতে আসবে কারা ? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না ?"

সে বল্লে—"তোর কিছুই মনে পড়ছে না ? তুই সত্যি বলছিস, না মস্করা করছিস ?"

আমি বল্লুম—"তোমার দিব্যি, আমি সত্যি বলছি।" সে বল্লে "তবে সর্ব্বনাশ হয়েছে—তোকে মানুষে-পেয়েছে।"

আমি বল্লুম—"মানুষে পেয়েছে কি গো !"

সে বল্লে—"জানিস্ না বুদ্ধি, আমরা যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপি, মানুষও তেমনি আমাদেব কারো কারো ঘাড়ে চাপে। তুই যখন মাধব' চক্রবর্ত্তীর দেহে সেঁধিয়েছিলি, তখন বোধ হয় তার একটুখানি প্রাণ ছিল, সেইটে তোকে পেয়ে বসেছে।"

আমি বল্লুম—"তাতে কি হয় ?"

সে বল্লে—"মানুষ যেমন তখন নিজেকে চিন্‌তে পাবে না, আপনার লোককে চিন্‌তে পারে না, আবোল তাবোল বকে, কট্‌মট্‌ করে চোখ ঘুরোতে থাকে, আমাদেবও ঠিক তেমনি হয়। তাই তো তুই অমন করছিস্—নিজেকে চিনতে পারছিস্ না, আমাদেরও চিন্‌তে পারছিস্ না।

"ওগো, তবে আমার কি হবে ?"

সে বল্লে—"যেমন বিয়ে করব না বোলে পালিয়ে এসেছিস্, তেমনি ঠিক জব্দ।"

আমি বল্লুম—"ওগো, আমি বাগেশ্বরীকে বিয়ে করবো—আমাকে উদ্ধার করো।"

সে বল্লে—"তবে বেরিয়ে আয় ওখান থেকে।"

আমি বল্লুম—"বেরুব কি ক'রে গো ?"

সে বল্লে—"পথ হারিয়ে ফেলেছিস্ বুঝি ? মুস্কিল করলি দেখছি ! এক কাজ কর। মাধব চক্রবর্ত্তীর ঐ কোঁচার খুঁট্‌টা এই গাছের ডালে বেঁধে গলায় একটা ফাঁস দিয়ে তুই ঝুলে পড়—তাহলেই সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে আসতে পারবি।"

আমি আঁৎকে উঠে বল্লুম "ওবে বাপরে—সে যে ফাঁসি! সে আমি পারব না।"

সে বল্লে—"ভয়-কি! আমি তো কতবাব ফাঁসি গেছি। তোর কোনো ভয় নেই, তুই ঝুলে পড়।"

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বল্লুম—"না গো, না—সে আমি পারব না গলায় ফাঁসি দিতে কিছুতেই পারব না।"

যেমন এই কথা বলা, সেই প্রথম কঙ্কালটা তার সেই কালো গর্ত্তের মত চোখ দুটোকে বন্ বন্ কোবে ঘুরিয়ে বল্লে—"কী তুই ফাঁসি যেতে পারবি না! আমরা হলুম গলায়-দড়ে! তুই আমাদেব ঘবের ছেলে হয়ে, এমন কথা বলিস্ যে, ফাঁসি যেতে তোর ভয় হয় —কুলাঙ্গার কোথাকার।"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বল্লুম—"কি করব, আমার যে ভয় কবছে!"

সে দাঁতের দু'পাটি কড়মড় করতে করতে বলে উঠলো—"ফের ঐ কথা! এই বেলা ঝুলে পড, নইলে তোর ভালো হবে না বলছি।"

আমি বল্লুম—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পডি, আমি ফাঁসিতে ঝুলতে পারব না—আমার ভয় করছে।"

সে আরো রেগে বল্লে—"হতভাগা কোথাকার! দূর হ, আমাদের সামনে থেকে দূর হ।" ব'লে সে তেড়ে আমায় মারতে এলো।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"রাগ করেন কেন খুড়ো মশাই। ও হয় তো ক্যাংলা নয়? নইলে ফাঁসিতে ভয় পাবে কেন?'

খুড়ো মশাই বল্লেন—"কী! ক্যাৎলা নয় ও? আমি সাত বচ্ছর টিক্‌টিকি পুলিশে কাজ করেছি, কত বড় বড় ফেরার পাকড়াও করেছি—আমার ভুল হবে?" শেষ কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে···· "যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন একবার পরখ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি দাদামশাই?"

দাদামশাই বল্লেন,—"আচ্ছা কেন, পরীক্ষা হোক্।" বলে আমার দিকে ফিরে বল্লেন—"কি হে, তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী না কাঙালীচরণ!"

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে, আগে তো জানতুম আমি মাধব চক্রবর্ত্তী, কিন্তু তারপর থেকে মনে হচ্ছে কাঙালীচরণ।" সে বল্লে—"কাঙালী-চরণ যদি হও, তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ বলে তোমায় ফাঁসি দেবো আমরা, এই শ্মশানে—এই গাছের ডালে।"

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে আমি তবে মাধব চক্রবর্ত্তী", সে বল্লে—"বেশ মাধব বক্রবর্ত্তী ব'লে যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পার, তাহলে তোমায় তিনবার সেলাম ঠুকে আমরা চলে যাবো।"

"আর যদি না পারি?"

"তা হ'লে এইখানে তোমার ঘাড় মট্‌কে রেখে চলে যাবো।"

"ঘাড় মট্‌কে দেবেন? সর্ব্বনাশ! এই বিদেশ বিভুঁয়ে—এই অচেনা জায়গায় এত রাত্রিতে নিজেকে কি ক'রে প্রমাণ করবো মশাই?"

"না পার ঘাড়টি মট্‌কে দেবো—শ্মশানের ভূত হয়ে থেকো।"

সত্যি-বল্‌ছি, এই কথা শুনে আমি কেঁদে ফেল্লুম। তখন সেই দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"কাঁদছ কেন? তোমার এমন কোনো চিহ্ন নেই, যাতে প্রমাণ হয়, তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী।"

আমি বল্লুম—"আছে। এই দেখুন, আমার ডানহাতে একটা জড়ুলের দাগ।"

সে হেসে বল্লে—"ও প্রমাণ তোমাদের পুলিশের কাছে চলে, এখানে আমাদের কাছে চলে না। কোন ভিতরের প্রমাণ দিতে পার?"

আমি বল্লুম—"আমার ভিতরে কি আছে না আছে, আমিতো জানি না মশাই। এই দেখুন না আমার ভিতরে কাঙালীচরণ

আছে কি মাধব চক্রবর্ত্তী আছে, আমি তাই ঠিক ঠাহব করতে পারছি না।"

প্রথম কঙ্কালটা গম্ভীবস্বরে ব'লে উঠল—"আজ্ঞে না, না, আমি মাধব চক্রবর্ত্তী।"

সে বল্লে—"শীগগিব প্রমাণ কব, নইলে ঘাড় মট্‌কালুম ব'ল।"

দ্বিতীয় কঙ্কালটা বল্লে "অমন ঘেবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমাব কি এমন কোন গুণ নেই যাতে বোঝা যায় তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী?"

আমি ব'লে উঠলুম—"হ্যাঁ, আছে বৈ কি? আমাব একটা মস্ত গুণ আছে, আমি কবিতা লিখতে পাবি।"

প্রথম কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"তুমি কবিতা লিখতে পাব? নিজে লেখ? না পরেব কবিতা নিজের ব'লে চালাও?"

আমি বল্লুম—"না মশাই, আমি সে-বকম কবি নই।" সে বল্লে—"তোমাব কবিতা কাগজে ছাপা হয়?"

আমি বল্লুম—"না, সম্পাদকেরা ভয়ে ছাপেন না।" সে বল্লে—"ভয়ে ছাপেন না কি বকম?" ?"

আমি বল্লুম—"আমার কবিতা এত উচ্চশ্রেণীব যে, একবার সে কবিতা ছাপলে পাঠকরা অন্য কবিতা পড়তেই চাইবে না। কাগজ ভর্ত্তি করা তখন দায় হয়ে উঠবে। এ কথা এক সম্পাদক আমায় নিজের মুখে বলেছেন।"

সে বল্লে—"আচ্ছা! কৈ দেখি, একটা কবিতা লেখ দিকিনি।"

আমি তখনই ওভারকোটের পকেট থেকে আমার পকেট বইখানা বার করে বললুম—'আলো একটা চাই যে।"

সে বল্লে—'দিচ্ছি আলো।" ব'লে খানিকটা ধূলো বালি একত্র করে একটা ফুঁ দিলে, আর অমনি আগুন জ্বলে উঠলো। আমি সেই আলোয় বসে লিখতে লাগ্‌লুম।

খানিকটা লিখেছি, সে বল্লে "কৈ. কি লিখলে পড়।" আমি বল্লুম—'এখনও যে শেষ হয় নি মশাই।" সে বল্লে—"কবিতার আবার শেষ আছে না কি? যা লিখেছ পড়—ফাজলামি করতে হবে না।" আমি সুর কোরে পড়লুম—

"পড়িয়ে বিপদে তারা,
হয়েছি মা দিশে হারা!
উদ্ধার এ-দুঃখ-কারা
পার হ'তে মা জননী
শ্মশানে বসিয়ে ডাকি,
ভয়ে ঘোরে শির চাকি,
খাবি খায় প্রাণ-পাখী,
শূন্য হেরি এ ধরণী
কোথা মোর গেহ-খাঁচা,
কোথা পিতা, কোথা চাচা,
এসে মা আমারে বাঁচা,
দিয়ে তোর পা-তরণী!"

এইটুকু শেষ হ'তেই সে বল্লে—"ঢের হয়েছে ঢের হয়েছে। এ-রকম গান তো আমি অনেক যাত্রায় জুড়িদের মুখে শুনেছি। এ তোমার নিজের লেখা না. পুরানো গান একটা মুখস্থ ছিল, তাই লিখে শোনাচ্ছ?

আমি বল্লুম—"না মশাই, এ আমার নিজের রচনা। একেবারে টাট্‌কা। এতে আপনি পুরোনোর গন্ধ কোথায় পেলেন? দেখছেন না, একেবারে আধুনিক ধরণের লেখা।"

সে বল্লে—"থাম, তোমায় আর জ্যাঠাপনা করতে হবে না। পুরোনো একটা গান চুরি ক'রে নিয়ে আমায় ফাঁকি দেবে ভেবেছ? তা হচ্ছে না। দেখি তুমি কত বড় ওস্তাদ আমার নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখতে পার?" আমি বল্লুম—"খুব পারি। নাম দিয়ে আমি অনেক কবিতা লিখেছি। তেলের নাম দিয়ে ওষুধের নাম দিয়ে অনেক

ভালো ভালো কবিতা আমার লেখা আছে। একবার একটা জুতোর দোকানের কবিতা লিখে প্রাইজ পেয়েছিলাম। আপনার নামটা কি বলুন, আমি এখনি লিখে দিচ্ছি।"

সে বল্লে—"আমার নাম জাঁদরেল। লিখে ফেল দেখি এই নাম দিয়ে একটা কবিতা চট ক'রে। বুঝব কত বড় বাহাদুর তুমি।"

আমি কাগজ-পেন্সিল নিয়ে লিখতে সুরু করেছি মাত্র, সে বল্লে—"কি লিখলে, পড়হে। আমিও বড় কবিতা দু'চক্ষে দেখতে পারি না।"

আমি বল্লুম—"মশাই, আর একটু সময় দিন।" ব'লে আমি খস্ খস্ শব্দে লিখে যেতে লাগলুম। একবার একটু থেমেছি, সে আমার খাতার দিকে ঝুঁকে দেখে বল্লে—উঃ, অনেকটা লেখা হয়েছে। এইবার পড়।"

অগত্যা আমি পড়লুম—

"রেল আছে, জেল আছে,
আর আছে কৎবেল ;
পাশ্ আছে, ফেল আছে,
আর আছে শূল শেল্
ঢোল আছে, চোল আছে,
আর আছে সরখেল
সব সে বড়া হ্যায়
জাঁদরেল জাঁদরেল"

পড়া শেষ হ'তেই সে চীৎকার ক'রে উঠলো—"বাঃ, বাঃ, বেড়ে লিখেছে তো হে। আর একবার পড় তো, আর একবার পড় তো।"

আমি আর একবার চিৎকার করে পড়লুম—"রেল আছে, জেল আছে, ইত্যাদি।"

সে আবার বলে—"বেশ হয়েছে! চমৎকার হয়েছে! যাও প্রমাণ হয়ে গেল তুমি কবি মাধব চক্রবর্ত্তী।"

আমি বল্লুম—"ঠিক বল্‌ছেন মশাই, আমি কাঙালীচরণ নই!" সে বল্লে—"কাঙালীচরণের চৌদ্দপুরুষ এমন কবিতা লিখতে পারে না। মাধব চক্রবর্ত্তী না হ'লে এমন কবিতা লেখে কে?" আমি বল্লুম—"মশাই, আমার আর একটা কবিতা শুনবেন? এই খাতায় লেখা আছে—এই জয়পুরের সম্বন্ধে।" সে বল্লে—"কি শোনাও তো দেখি।"

আমি তাড়াতাড়ি পকেট বইয়ের খাতা হাত্‌ড়ে কবিতাটা বার ক'রে পড়তে শুরু করল্লুম—

"বস্তা-বস্তা পুঞ্জ পুঞ্জ তীব্র হিম ঢেলে
ব্যোম মার্গে কে রচিল শীতের পাহাড়?
লেপ-গদি বালপোষ সব্ব বর্ম্ম ভেঙে
কম্প এসে কাঁপাইছে শরীরের হাড়।
ঊর্দ্ধ-ফণা ক্রুদ্ধ শত নাগিনীর প্রায়
কপালে-কপোলে ভীম হানিছে ছোবল,
কিম্বা কোন্ পিশাচিনী উন্মাদিনী-সমা
তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় করিছে কোতল!
অথবা কি মেঘ-দৈত্য ছোঁড়ে শার্পনেল—"

হঠাৎ দূরে একটা বীভৎস কোলাহল উঠলো—"ওরে ক্যাংলাকে পাওয়া গেছে।"

আমি চম্‌কে উঠে পড়া থামিয়ে চেয়ে দেখি আমার সামনের কঙ্কাল তিনটে লাফাতে লাফাতে ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি "রাম! রাম!" বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে পড়লুম। এতক্ষণ রাম নামটা যে কেন মনে আসে নি কে জানে!

আমি রেল-লাইনের বাঁধ ঠেলে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় দুটো কুলির সঙ্গে দেখা। তারা বল্লে—"বাবু, আপনাকে

আমবা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি গাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন ?"

আমি আর কি বলব ? বল্লুম "আমি এখানে ঐ ইয়ে হচ্ছিল কি না, তাই একটু দেখছিলুম।" তাবা বল্লে "আপনাব গাড়ি ঠেলে আমরা ঐ ওদিকে বেখে দিযেছি চলুন আপনাকে দেখিযে দিই।" ব'লে তাবা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলে।

আমি গাড়িতে ওঠে বল্লুম—"হাঁবে, গাড়িতে আলো নেই কেন ?"

সে বল্ল—"বিজুলিবাতি আছে, মেল গাড়িব সঙ্গে লাগিয়ে দিলে তবে জ্বলবে।"

আমি বল্লুম—"আমাকে একটা বাতি দিযে যেতে পাবিস্ ?—বখশিস্ দেবো।"

তাদেব একজন ছুটে গিয়ে একটা বাতি এনে দিলে। আমি সেইটে সামনে বেখে পকেট বই খুলে নিজেব লেখা কবিতা পড়তে লাগলুম।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সবুজপত্র-প্রবাসী-ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকার আয়োজন তখন পরিপূর্ণ। বাঙালী পাঠকের মনে এইসব পত্রিকার একটা স্থায়ী জায়গা তৈরী হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। শরৎচন্দ্রও চলে গেছেন। ঠিক এই সময়কার বাংলা সাহিত্যে কয়েকজন কুশলী লেখকের আবির্ভাব হোল। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবিত-কালেও অল্প স্বল্প সাড়া জাগাতে শুরু করেছিলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। ইনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা। ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়া যখন শিল্প-সাহিত্যে ভরপুর তখন মণিলাল সেই পরিমণ্ডলে নিজেকে পরিচিত করেন। কিন্তু তাঁর স্বকীয়তাও ছিল উজ্জ্বল, যা সম্পূর্ণত ঠাকুরবাড়ির দ্বারা প্রভাবিত বা সংক্রামিত নয়। মণিলালের গদ্য অত্যন্ত ঋজু এবং তীক্ষ্ণ। প্রথম চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর এই দিক থেকে মিল আছে। মণিলাল বেশ কিছু গল্প এবং অন্যান্য গদ্যরচনা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ভৌতিক আখ্যানগুলিও অনবদ্য। পরশুরামের গল্পের মতই সরসতায় পরিপূর্ণ এবং ব্যঙ্গ-ক্ষুরধার। ব্যক্তিগত জীবনে এমন পরিশীলিত রুচি এবং মেধার অধিকারী খুবই কম চোখে পড়ে। সেই সময়কার সাহিত্যে তিনি ছিলেন একজন অনিবার্য জ্যোতিষ্ক। তাঁর রচনার সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু সেইসব রচনা মহামূল্যবান মণিমালার মতই বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকবে সন্দেহ নেই। যশস্বী লেখক ১৮৮৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯২৯ খ্রীঃ পরলোকগমন করেন।



প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

মেটাজীর সঙ্গে আমার পরিতোষের আর কালিচরণের দেখা হল।

লোকটি দেখতে বেশ লম্বা-চওড়া ধপধপে ফরসা, পরনে ধুতি অথচ মাথায় পারশীদেব মতন টুপি অথবা ডোঙাব মতন একটা বস্তু। বোঁ বোঁ ক'রে বাংলা বলেন।

কিছু দূবে কল্যাণ স্টেশনেব কাছে পুনার এক শেঠ গভর্মেণ্টের কাছ থেকে একটা জঙ্গল কিনেছেন। খুব সুন্দর জঙ্গল—পাহাড়-ঝরনা ইত্যাদিও আছে। কল্যাণ থেকে পুনায় যেতে হলে যে সব জঙ্গল পাহাড় ভেদ ক'রে যেতে হয় তারই খানিকটা আর কি! এই জঙ্গল কেটে সাফ ক'রে তিনি এখানে চাষবাস করছেন। সামান্য খানিকটা জায়গা সাফ ক'রে আপাতত চাষবাস শুরু করেছেন, পরে আস্তে আস্তে বাড়াবেন। দুই একজন লোক এই জমির খানিকটা ক'রে ভাড়া নিয়ে নিজেরাও চাষবাস করছে। যাই হোক, এখানে নানা কাজের জন্য বিস্তর লোক খাটছে, মেটাজী সেখানে কিছু কাজ যোগাড় ক'রে দিতে পারেন।

বলা বাহুল্য, আমরাতো তখুনি রাজী হয়ে গেলুম। মেটাজী বললেন—আমি শীগ্‌গিরই সেখানে গিয়ে তোমাদের জন্য সব বন্দোবস্ত ক'রে আসব।

এরপর আমরা রোজই খোঁজ নিই, কিন্তু শুনি যে, মেটাজীর সেখানে যাবার সুবিধা হয়নি।

প্রায় দিন পনেরো পরে একদিন বললেন—কাল সকালে নিয়ে যাবেন।

সংবাদটি পেয়ে আমরা যে কিবকম আনন্দিত হয়েছিলুম তা বোধ হয় না বললেও চলবে। উৎসাহের আবেগে রাত্রে আমাদের ভালো ক'বে ঘুমই হল না। খুব ভোরে উঠে স্নান ক'রে চা খেয়ে এলুম। তারপরে আমাদের ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলিগুলি বেঁধে উপস্থিত হলুম।

যথা সময়ে কল্যাণে নেমে কিছুক্ষণ হেঁটে সেই জঙ্গলে এসে পৌঁছানো গেল। সামনের দিকটা অর্থাৎ যেদিকটা লোকালয়ের দিকে সেদিক থেকে আরম্ভ ক'রে ভেতবের প্রায় আধ-মাইলটাক লম্বা ও আধ মাইলটাক প্রস্থজমি পরিষ্কার ক'বে আবাদ কবা হচ্ছে। আমরা জঙ্গলে ঢুকে সরু রাস্তা দিয়ে খানিকটা ভেতরের দিকে গিয়ে একখানা পাতা দিয়ে ছাওয়া ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম।

মেটাজী উচ্চৈঃস্বরে কয়েকবার কি একটা ব'লে চিৎকার করতেই ঘরের ভেতর থেকেই জবাব দিয়ে বেরিয়ে এল একজন বেঁটে-মতো বেশ গুণ্ডা-গোছের লোক, হাঁটুব ওপরে মালকোঁচা-মারা ধুতি পরা, গায়ে একটা ফতুয়া-গোছের হাতকাটা জামা। জামাটার সামনের দিকে একটা বড় তাপ্পি-পকেট।

লোকটা কাছে এসে একবার আমাদের আপাদমস্তক দেখে, তারপর মেটাজীর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ কবল।

কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন আব আমরা তিনজনে তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করতে লাগলুম।

জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে বিরাট একটা ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হলুম। দেখলুম, একদিকে অনেকখানি জায়গা নিয়ে কলার বাগান করা হয়েছে। বেঁটে কলাগাছ—তাতে কাঁদি-ভর্তি বড় বড় মোটা কলা গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। আবও খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল, সেখানে চিচিঙ্গের ক্ষেত করা হয়েছে—তিন চার হাত লম্বা হাজার হাজার চিচিঙ্গে উঁচু মাচা থেকে মাটির দিকে ঝুলছে। বড় বড়

মানুষের সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল দু'হাতে সরিয়ে তার মধ্যে রাস্তা ক'রে মেটাজী ও ভুলু সর্দার আগে চলেছেন—তাঁদের পেছনে আমরা চলেছি। সম্মুখে পিছনে আশেপাশে মোটা মোটা বড় বড় গাছ—সে-সবগাছের চেহারাও কখনো দেখিনি, নামও শুনিনি। এইসব গাছে জাহাজের কাছির মতন মোটা ও শক্ত পাকানো পাকানো লতা ঝুলছে। কোনো কোনো জায়গায় জঙ্গল এত ঘন যে, গাছের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে আছে। কতদিন যে সেখানকার জমিতে সূর্যালোক স্পর্শ করেনি, তার ঠিকানা নেই। জায়গাটা একেবারে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। এক জায়গায় দেখলুম, অনেক-খানি জমি পরিষ্কার ক'রে লাঙল দিয়ে চষা হয়েছে—প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন স্ত্রী-পুরুষে মিলে সেই জমি থেকে আগাছা ও পাথর ইত্যাদি বেছে এক জায়গায় জড়ো করছে।

আমরা আসতেই তাঁরা দাঁড়িয়ে উঠে অবাক হয়ে আমাদের দেখতে লাগল। পুরুষগুলির গায়ে কোনো জামা নেই, কোমরে একখণ্ড বস্ত্র জড়ানো, তাতে কোনোরকমে লজ্জা নিবারণ হয়েছে মাত্র। মেয়েদের দেহেরও উপরার্ধ একরকম নগ্ন বললেই চলে। কোমরে একটু বস্ত্র জড়িয়ে রেখেছে। পুরুষ কিংবা স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত রোগা। পুষ্টিকর খাদ্য তো দূরের কথা, দেখে মনে হয়—কোনো রকমের খাদ্য তাদের পেটে পড়ে কিনা সন্দেহ। সকলেই অদ্ভুত একরকমের দৃষ্টিতে বিশেষ ক'রে আমাদের তিনজনকে দেখতে লাগল।

এইখানে মেটাজী পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন—এই এদের সঙ্গে তোমাদের কাজ করতে হবে। কাজ এমন হাতী ঘোড়া কিছুই নয়—একটা বাচ্চা ছেলেকে বললেও সে করতে পারে।

এই অবধি ব'লে আবার তাঁরা কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন। আমাদের সামনে ও পেছনে বিস্তীর্ণ অরণ্য, দক্ষিণে ও বামে ছোট পাহাড়ের সারি। মনে হয় যেন প্রকৃতিদেবী জঙ্গলের দুদিকে উঁচু পাথরের দেওয়াল গেঁথে রেখেছেন। এক এক জায়গায় জঙ্গল সংকীর্ণ হয়ে গেছে—দু'দিকের পাহাড় অনেক কাছাকাছি

হয়েছে। দেখলুম প্রায় সর্বত্রই এই পাহাড়ের গাবয়ে নিরন্তব জল ঝরছে—তারই ফলে পাহাড়েব গাযে শেওলা জন্মেছে। কিছু দূর এগিযে গিয়ে এক জায়গায় দেখা গেল একখণ্ড প্রকাণ্ড পাথব—তাবই ওপর দিযে একটা শীর্ণ জলধাবা এসে নিচে একটা ডোবার মতন সৃষ্টি হয়েছে। মেটাজী আমাদের বললেন—এই দেখ কেমন সুন্দর ঝবনা। এবা এই জল খায।

আবও কিছুদূব অগ্রসর হবাব পব মনে হল যেন এতক্ষণে আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছি। ছোট-বড় গাছ ও লতায মাথার ওপব চাঁদোয়ার মতন একটা আচ্ছাদন সৃষ্টি হওযায় জায়গাটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও নির্জন ব'লে মনে হতে লাগল। এখানকাব পথও পরিষ্কার নয়, বেশ বুঝতে পাবা গেল যে এদিকে লোকজন বড় একটা কেউ আসে না।

এই দিকে খানিকটা এগিযে যাবার পব দূরে একটা বাড়ি দেখতে পাওযা গেল।

মেটাজী পেছন ফিবে আমাদের বললেন—ঐ দেখ তোমাদের বাড়ি। এমন জায়গায় এমন সুন্দর বাড়িতে লাটসাহেবও থাকতে পায় না।

একটু এগিয়েই আমরা বাড়ির কাছে এসে উপস্থিত হলুম। আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রায় দশ বারোজন নারী ও পুরুষ শ্রমিক যে আমাদের অনুসবণ করছিল তা আমরা টেরই পাইনি। এইখানে এসে দাঁড়াতেই তারা আরও কাছে এগিয়ে এসে আমাদের ভালো ক'রে দেখতে লাগল, কিন্তু সর্দার রক্তচক্ষু বার ক'বে বিকট চিৎকার করে তাদের ভাষায কি-সব বলায সকলেই ধীবে ধীরে ফিরে চলে গেল। সর্দার মহাশয়ের এই বিকট আওয়াজ শুনে তাঁর মেজাজের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল, তিনি ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে অর্থাৎ আমরা যাতে বুঝতে পারি—মেটাজীকে বললেন—শুয়ারের বাচ্চারা অত্যন্ত পাজি শয়তান এবং অসম্ভব রকমের চালাক। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুলে ডাণ্ডাটা ফেলে এসেছি—হাতে ডাণ্ডা নেই—বুঝতে

পেরেছে যে, এখন আর মারতে পারবে না—অমনি আমাদের পেছু পেছু এসেছে মজা দেখতে। কাজে কোনো রকমে ফাঁকি দিতে পারলে হয়।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর বাড়িখানা ভালো করে দেখলুম। বেশ বড় পাথরের বাড়ি অনেকটা গির্জা-ধরনের। মাটি থেকে প্রায় আড়াই তলা উঁচু পাথরের গাঁথনি ক'রে সেখানে ঘর বানানো হয়েছে। ঘরের চারিদিকে দরজার মতো বড় বড় জানালা। মেটাজী ও সর্দার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

বলা বাহুল্য, আমরাও তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করলুম।

ওপরে গিয়ে দেখলুম প্রকাণ্ড একখানি ঘর—যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—ঠিক গির্জাঘরের মতন। ঘরের মেঝে ও দেওয়াল কাঠের। দেওয়ালে চমৎকার ওয়াল-পেপার মারা। ঘরখানাকে মাঝে পার্টিশান দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। ঘরের পাশেই আলাদা ভিতের ওপরে তৈরী ছোট্ট একখানি ঘর। বেশ বুঝতে পারা গেল, একসময়ে এই ঘরে কমোড ইত্যাদি থাকত।

মেটাজী বললেন—এই ঘরে সায়েবদের পায়খানা ছিল, তোমরা এইখানেই রান্নাবান্না কোরো।

মেটাজী আরো বললেন—আজ থেকেই কাজে লেগে যাও—একটা দিনের 'রোজ' কেন আর মারা যায়।

সেই বিরাট ঘরের এক কোণে আমাদের ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলি-গুলো রেখে তখুনি তৈরি হয়ে নিলুম। মেটাজী ব'লে দিলেন—দেখ, ভোর ছ'টোর সময় কাজে লাগতে হবে। বেলা এগারোটায় ছুটি পাবে। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে খেয়ে-দেয়ে আবার বেলা একটার সময় গিয়ে কাজে লাগবে আর ছুটি পাবে বিকেল ছ'টায়। দুপুরে, ছুটির সময় জল-টল তুলে রাখবে। কারণ বিকেলে ঘরে এসেই সিঁড়ির দরজা ভালো করে বন্ধ করে দেবে। তার পরে আর নিচে নামা চলবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম—কেন মশায়?

তিনি বললেন—এ জায়গাতে আবার সন্ধ্যের পর জানোয়ার বেরোয় বলে শুনেছি।

কি জানোয়ার বেরোয় সে-কথা জিজ্ঞাসা করায় মেটাজী ধমকে উঠে বললেন—সে কথায় তোমাদের দরকার কি? বারণ করলুম, দরজা খুলে রেখো না। বাস্।

কথায় কথায় মেটাজী বললেন—মনে কোরো না যে, তোমরা এসে এখানে থাকবে ব'লে শেঠজী তোমাদের জন্য এই বাড়ি তৈরী ক'রে রেখেছেন।

মেটাজীর মুখে অনেকক্ষণ থেকে এইসব ক্যাঁট কেঁটে কথা শুনতে শুনতে আমার ধৈর্যচ্যুতি হল। বলে ফেললুম—তা যে হয়নি তা আমরা জানি। ভাগ্যদোষে আজ আমাদের এই অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে ব'লে মেটাজী মনে করবেন না, আপনার চাইতে আমাদের বুদ্ধি কিছু কম আছে।

আমার জবাব শুনে মেটাজীর মেজাজ একেবারে জল হয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন—না, না রাগ করছ কেন? আমি ঠাট্টা করেছি।

মেটাজী বলতে লাগলেন—এইখানে তিনজন ক্রীশ্চান পাদরী থাকতেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম বা আমেরিকা—এই রকম কোনো একটা জায়গায় ছিল তাঁদের বাড়ি। ঠিক কোন্ জায়গায় তাঁদের বাড়ি তা তিনি জানেন না, তবে তাঁরা ছিলেন একেবারে গোরা।

জিজ্ঞাসা করলুম—তাঁরা এখানে কী করতেন?

তাঁরা এসেছিলেন এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে আলোক বিকিরণ করতে। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতে পালাতে পথ পেলেন না—ব'লেই মেটাজী উচ্চহাস্য করলেন।

কিন্তু মেটাজীর কথাটা শুনে আমরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করলুম না। জানোয়ারের কথা শুনে মনটা আগেই দমে ছিল—তার ওপর ক্রীশ্চান পাদরীদের পলায়নের কথা শুনে আরও দমে গেলুম। ভাবলুম ক্রীশ্চান পাদরী—যাঁরা আফ্রিকার সিংহসঙ্কুল গভীর অরণ্যে নরখাদক

অর্ধমনুষ্যদের মধ্যে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে ভয় পান না, তারা কিসের ভয়ে এখান থেকে পালিয়ে গেলেন! আর আমরাই বা এমন কি তালেবর লোক যে, সে-স্থানে আমাদের নিয়ে এসে রাখা হচ্ছে।

ব্যাপার বিশেষ সুবিধের নয় মনে ক'রে মেটাজীকে জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেলা গেল—হ্যাঁ মশাই, ক্রীশ্চান পাদরীরা এখান থেকে ভেগে গেলেন কিসেব ভয়ে?

মেটাজী সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন—যেতে দাও, অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে—এবার কাজে চল।

মেটাজী ও সর্দারের পেছনে পেছনে চলতে লাগলুম। এক জায়গায় এসে তাঁরা দাঁড়াতেই আমরাও দাঁড়ালুম। সেখানে দেখলুম পথের দু'ধারে বড় বড় মানুষ-সমান ঘাস হয়ে রয়েছে। সর্দার বললেন—এই যে বড় বড় ঘাস দেখছ—এর নীচে করোগেটেড আয়রনের মতন জমিতে আলুব ক্ষেত আছে।

মেটাজী আবার ব'লে দিলেন—রাঙা আলুব ক্ষেত—লতানে গাছ চেনো তো? দেখো যেন ঘাস তুলতে আসল গাছ তুলে ফেলো না।

মেটাজী যাবার সময় বললেন—বেশ মন দিয়ে কাজকর্ম করবে। আমি সর্দারকে বলে গেলুম, সে কাল তোমাদের 'রোজ' দেবে, তাই দিয়ে বাজার ক'রে এনো।

মেটাজী বিদায় নিলেন আর আমরা 'জয় দুর্গা' বলে মনের আনন্দে আলুর ক্ষেতে ঘাস তুলতে লেগে গেলুম। আমাদের পাশে পাশে যেসব নরনারী মজুরের কাজ করছিল তারা কিছুক্ষণ এই জামা-পরা মজুরদের দিকে অবাক হ'য়ে দেখে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ বোধ হয় আমাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা ব'লে আবার যে যার কাজে লেগে গেল।

আমরা যে জায়গাটিতে ঘাস ছিঁড়ছিলুম সেখানে আরও গুটি দুই তিন পুরুষ ও নারী কাজ করছিল। তারা আমাদের অনভ্যস্ত হাতের কাজ দেখে মাঝে মাঝে কি সব বলাবলি ও হাসাহাসি করতে লাগল। দুনিয়ায় ঘাস-ছেঁড়ারও ভালোমন্দ আছে।

ভালোই হোক আর মন্দই হোক, কোনোরকমে বিকেল দু'টা অবধি

কাজ করবার পর সেদিনকার মতো কাজ শেষ হল। আমরা তো একরকম ছুটতে ছুটতে এসে সেই ভাঙা পাত্রে জল তুলে হাত-মুখ ধুয়ে নিজেদের বাসস্থানে এসে ঢুকলুম।

প্রকাণ্ড দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি যে, সেটি বন্ধ করবার অসংখ্য হুড়কো, খিল ও ছিটকিনির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই পুরোনো ও অনেকদিন অব্যবহারে প্রায় অকর্মণ্য হুড়কো প্রভৃতি যথাস্থানে সংযোজন করতে আমাদের তিনজনের প্রায় দম-বন্ধ হবার অবস্থা। কোনো রকমে সেগুলি লাগিয়ে আমরা পুর্বদিকের একটি প্রকাণ্ড জানালা খুলে দিয়ে দাঁড়ালুম।

তখনও সূর্য একেবারে অস্ত যায়নি। অস্তগামী তপনের নিবন্ত আলো এসে পড়েছে গাছের চূড়ায়। আমাদের সম্মুখে দক্ষিণে বামে যতদূর দৃষ্টি যায় সুদূর প্রসারী বনশ্রেণী। গাছের পর গাছ উচু নিচু সরু মোটা—সবলে ধরিত্রী মাতাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দূর দূর—আরো দূরে পাহাড়ের সারি স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হতে হতে মেঘলোকে মিলিয়ে সত্য ও কল্পনায় জড়াজড়ি হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে শত-লক্ষ বিহঙ্গমের কাকলীতে মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ। আমাদের চোখে সেই দৃশ্যফুটে উঠছে—কানের মধ্যে সেই বিরাট শব্দ এসে পেঁছচ্ছে বটে, কিন্তু মন শূন্য—চিত্তে এসবের প্রতিক্রিয়া কিছুই হচ্ছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অনুভব করলুম কখন পাখীদের কলরব থেমে গিয়েছে, বনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

অরণ্যমাতার কোলে আমাদের প্রথম সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিয়ে সেখান থেকে সরে এলুম। মোমবাতি অনেকদিন আগে থেকেই কেনা ছিল, তাই জ্বালিয়ে নিজের ধুতি পেতে বিছানা করলুম। আমাদের কারো মুখে কোনো কথা নেই —সকলেরই মন ভারী। মনের কোন্ গহনে বিরাট বেদনা ও অভিযোগ জমা হচ্ছিল। কিসের বেদনা ও কার ওপরে অভিযোগ— তার স্পষ্ট ধারণা নেই। মন যেমন ভারী সেই অনুপাতে উদর তেমনি হালকা। তার ওপরে সারাদিনের সেই পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত। শুয়ে

শুয়ে এই তিনের ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হতে তখনও অনেক দেরি কিন্তু পাখীদের বিপুল চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙল বটে, কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে, পাশ ফিরতে পারি না। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বন্ধুদের ডেকে তুলে মুখ ধুয়ে একটু বসতে না বসতে ভোর হয়ে গেল।

সেদিন বেলা তখন প্রায় দু'টো হবে, আমরা খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একরকম কাঁপতে কাঁপতে সর্দারের কাছে গিয়ে বললুম—হয় আমাদের কিছু খেতে দিন আর না হয় পয়সা ও ছুটি দিন—বাজারে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি।

সর্দার তখন ঘুমোচ্ছিল। আমাদের চেচামেচি শুনে সুখশয্যা ছেড়ে এসে খিদের কথা শুনে একবার 'ও' ব'লে ন'গণ্ডা পয়সা একবার দু'বার তিনবার গুণে আমার হাতে দিলে।

পয়সা হাতে নিয়ে একেবারে হকচকিয়ে গেলুম। অ্যাঁ! এই ফরেস্ট-ডিপার্টমেন্টে কাজ ক'রে দৈনিক মাত্র ছ'পয়সা! এতে সবাই খাবই বা কি? আর পরবোই বা কি?

কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় তখন আর পরবার কথা চিন্তা করবার অবসর নেই। তখুনি সেই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলুম বাজারের দিকে। পথ চলেছিতো চলেইছি; কিন্তু কোথায় বাজার? সঙ্গের লোককে যত প্রশ্ন করি সে কিছুই জবাব দেয় না। অনেক সাধাসাধি করবার পর হয়তো যদি কিছু বলে। কিন্তু সে-ভাষা কিছুতেই বুঝতে পারি না। শেষকালে প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক পথ চলে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলুম—শোনা গেল, সেটা নাকি বাজার।

বাজার বললে বটে, কিন্তু দোকানপত্র কোথায়। দু'একখানা পাতা ছাউনি ঘর—তারও দরজা অর্থাৎ ঝাঁপ বন্ধ। একটা এইরকম ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে লোকটা আমাদের বললে—এই একটা দোকান।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে চেঁচামেচি করার পর দোকানদার দরজা খুলতে আমাদের গাইড তাকে কি বললে। দেখা গেল, খরিদ্দারের

শুভাগমনে লোকটি বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—ভালো চাল আছে?

সে অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। বেশ বোঝা গেল যে 'চাল' শব্দটি তার কর্ণকুহরে ইতিপূর্বে প্রবেশ করেনি। আমরা খাদ্য, অন্ন, তণ্ডুল, ধান্য ইত্যাদি নানা শব্দ দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে পিলপিল ক'রে চারিদিক থেকে লোক এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াতে আরম্ভ করলো। আমাদের কথা শুনে তারাও নিজেদের বিদ্যে অনুসারে দোকানদারকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না। শেষকালে চলে যাচ্ছি দেখে সে ঘরের ভেতর থেকে একটা পুঁটলি নিয়ে এসে সেটা আমাদের খুলে দেখাল। দেখলুম তার মধ্যে ধুলোর মতন কালো খানিকটা কী জিনিস পড়ে রয়েছে, তাতে আবার পোকা ধরেছে।

সেটি কী দ্রব্য জিজ্ঞাসা করায় দোকানদারও আমাদের চারপাশের যত নরনারী দাঁড়িয়ে ছিল সবাই মিলে চিৎকার ক'রে সে দ্রব্যটির গুণাগুণ বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক ধস্তাধস্তির পর বোঝা গেল যে, সে বস্তুটি বজরার আটা—খুবই রুচিকর ও পুষ্টিকর খাদ্য। চাল যখন পাওয়া গেল না তখন আপাতত বাজরার আটাই দিতে বললুম এক সের। দোকানদার আবার বাড়ির ভেতর থেকে এক টুকরো পাথর নিয়ে এসে বাটখারার বদলে তাই দিয়ে সেই ধুলোরূপী পুষ্টিকর ও রুচিকর গুঁড়ো ওজন ক'রে দিলে। সেখান থেকে এক পয়সার নুন কিনে বেরোলুম অন্য দোকানের সন্ধানে। পেছনের সেই ভীড়ও চলল আমাদের সঙ্গে।

অনেক বলা কওয়া ও জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা এক কুমোর—বাড়িতে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে। দেখলুম, সেখানে নানারকম মাটির তৈরী জিনিস রয়েছে, কিন্তু হাঁড়ি নেই। অনেক চেষ্টা ক'রেও হাঁড়ি কী দ্রব্য তা বোঝাতে না পেরে শেষকালে আধা-কলসী ও আধা-হাঁড়ি গোছের একটা জিনিস কিনে প্রায় ছুটতে ছুটতে স্টেশনে

এসে মুড়ি ছোলা ভাজা ইত্যাদি যা পাওয়া গেল একরকম পেট ভরে খেয়ে নিয়ে দৌড়লুম ডেরার দিকে।

জঙ্গলে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যে হয়ে এলেও একটু আলো ছিল। ওরি মধ্যে একরাশ শুকনো কাঠি যোগাড় ক'রে, নতুন পাত্রে জল ভরে, ঘরে উঠে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। বাড়ি থেকে ফির আসবার মুখে সন্ধ্যার আবহাওয়ায় কালীচরণ একটা চিচিঙ্গে ছিঁড়ে এনেছিল। সে বললে—এই রুটি খাওয়ার অভ্যেস তো কখনো নেই, এই চিচিঙ্গের কালিয়া দিয়ে রুটি মারা যাবে।

প্রায় তিনদিন একরকম নির্জলা উপবাসের পর এই মহাভোজের আয়োজন দেখে মনটা খুশীই হয়ে উঠল। যাই হোক, তিনজনে মহা উৎসাহে আমাদের রান্নাঘর অর্থাৎ পাদরীদের ভূতপূর্ব পায়খানা ঘরে তো ঢোকা গেল। তখনো ঘরের মেঝেতে ছ্যটো তিনটে কমোডের দাগ ঝকমক করছিল, কিন্তু জীবনে উন্নতি করতে গেলে ওসব ছোট খাটো দাগকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে চলবে না।

আধখানা চিচিঙ্গে ছুরি দিয়ে কুচিয়ে মনে হল রান্না হবে কিসে? পাত্র কোথায়? বাঁধবার একটা পাত্র কিনে আনা হয়নি বলে আপশোস হতে লাগল। শেষকালে সর্দারের দেওয়া হাঁড়ির অংশ—যা এই দুদিন আমাদের জলপাত্রের অভাব দূর করেছে, তাইতে জল দিয়ে আগুনে চাপিয়ে দেওয়া গেল। জল একটু সোঁ সোঁ করতেই কুঁচোনো চিচিঙ্গে তাতে ছেড়ে দিয়ে নুন দিয়ে আমরা আটা মাখবার বন্দোবস্ত করতে লাগলুম।

মাটিতে কোঁচার খুঁট পেতে তাতে সেই ধুলোরূপী বাজরার গুঁড়ো ঢেলে একটু একটু করে জল দিয়ে মাখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। মধ্যে মধ্যে কাঠি দিয়ে এক আধটুকরো তরকারি নামিয়ে দেখা হচ্ছে সিদ্ধ হয়েছে কিনা।

এমন সময় টাই করে এক বিরাট আওয়াজে চমকে উঠলুম। পরমুহূর্তেই অর্থাৎ চমক ভাঙবার আগেই একটি বজ্রনির্ঘোষ এবং

তারপরেই অগ্নিবৃষ্টি—মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মুখ হাত পিঠ গরম চিচিঙ্গে-চূর্ণ চড়চড়িয়ে উঠল।

—বাপরে—ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চিচিঙ্গের টুকরোগুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি—মেঝেতে তরকারির টুকরোগুলো প'ড়ে রয়েছে। সেই ভাঙা হাঁড়ির কানা আবর্জনা বহন ক'রে যার শেষ জীবন কাটছিল—অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে সে দেহরক্ষা করেছে। ভাবতে লাগলুম—হাঁড়িভাঙা তো দেহরক্ষা করলে কিন্তু আমাদের এখন দেহরক্ষার উপায় কি! তখন সেই নিবন্ত আগুনে ময়দার ঢেলাগুলো পুড়িয়ে নিয়ে আর আধখানা চিচিঙ্গে যে ছিল তাই দিয়ে দু'দিন নিরম্বু উপবাসের পর পরমানন্দে পারণে প্রবৃত্ত হলুম।

যাই হোক, সে রাত্রে রান্না করার চেষ্টা ক'রে আমরা বুঝতে পারলুম যে নিজে রান্না ক'রে খেয়ে এখানে কাজ করা চলবে না। সকালবেলা সর্দার আমাদের কাজের তদন্ত করতে এলে তাকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বললুম।

সেদিন বেলা চারটের সময় সর্দারের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ইষ্টিশনে গিয়ে সেই তল্লাটে খুঁজে খুঁজে রুটি গোস্তর দোকানে বসে আহার করা গেল। দু'জনে মিলে সেখানে দু-আনার খেয়ে পরদিন দুপুরবেলার খাবার জন্য এক আনার রুটি কিনে নিয়ে ফিরে এলুম। আমাদের থাকবার জায়গায় এসে তখনো অনেকখানি বেলা রয়েছে দেখে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখে বেড়াতে লাগলুম।

সেখানকার একটা দৃশ্য আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এক জায়গায় দেখা গেল একটা বিরাট গাছকে বেড়ে একটা লতা ওপরে উঠে নিজের ডালপালা দিয়ে গাছটার ডালপালাকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে, আর সেই লতায় ফুটেছে ছোট ছোট সাদা ফুল। এত ফুল যে, গাছ আর লতা সে ফুলে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ওপর থেকে সেই ফুল ঝরে-ঝরে গাছটার চারিদিকের মাটিতে যেন ফুলের বিছানা পাতা হয়েছে, আর সেই ফুলের সৌরভে বন আকুল হয়ে

উঠেছে, আমরা কাছে যাওয়ামাত্র মৌমাছির দল ভোঁ-ও-ও ক'রে আপত্তি জানাতেই পেছু ফিরে পালিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর সেই ফুল-সৌরভে মন-প্রাণ দেহ ভরে নিয়ে নেশায় টলতে টলতে ডেরায় ফিরে এলুম।

ফুলের গন্ধে নেশা লেগেই হোক কিংবা কয়েকদিন অনশন ও অর্ধাশনের পরে শত শরতের পুরাতন বলদের মাংস পেটে পড়েই হোক ঘরে এসে দোর-জানালা দিয়ে বসতে না বসতেই আমাদের কালীচরণের কিরকম ভাবদশা লেগে গেল। সে শুরু ক'রে দিলে কি ছার আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়া তো রবে না।

অনেক রাত্রি অর্থাৎ সন্ধ্যে থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা গল্প ক'রে আমরা শুয়ে পড়লুম।

ঘুমের মধ্যে বিরাট একটা শব্দ কানে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। আচমকা ওইরকম আওয়াজে আমি যেন জ্ঞানহারা হয়ে গেলুম। আমার পাশেই যে বন্ধুরা শুয়ে আছে সে-কথা স্রেফ ভুলে গিয়ে ভয়ে দিলুম দৌড়, কিন্তু আছড়ে পড়ে মাথা ও মুখে বিষম আঘাত লেগে সম্বিৎ ফিরে পেলুম, ততক্ষণ কালী ও পরিতোষ উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেললে।

সেই স্বল্পালোকেই দেখতে পেলুম ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে আর হাত কাঁপছে একটু একটু করে। আওয়াজ তখনো সমানভাবে চলছে। মনে হতে লাগল হাজার হাজার রাজহাঁস যেন একটা গলা দিয়ে চিৎকার করে চলেছে। পরিতোষ ও কালী আমাকে সেই রকম দেওয়ালের কাছে দেখে মনে করেছিল আমার সঙ্গে সেই আওয়াজের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যখন তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে ঘুমের ঘোরে আমি ওই রকম ভাবে ছুটে গিয়েছিলুম তখন তারা কথঞ্চিৎ শান্ত হল।

কিন্তু শান্ত হবার জো কি! ওদের আওয়াজের প্রচণ্ডতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। ঘরের পূর্বদিকে চারটে দরজায় বড় বড় সমান আকারের জানলা ছিল। মনে হতে লাগল যেন পালা করে এক-একবার

এক-একটা জানলার কাছে আওয়াজ হচ্ছে আর তারই ধমকে জানলাগুলো থর থর করে কাঁপছে।

আমরা আস্তে আস্তে ভূমিশয্যা ত্যাগ করে পা টিপে টিপে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কেন যে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম তা ঠিক জানি না। দরজার কাছে যেতেই জানলার দিকের আওয়াজ কমে গেল। বেশ মনে হতে লাগল আওয়াজটা যেন দূরে সরে যাচ্ছে। একটু খানি প্রাণে ভরসাও এল। কিন্তু তখুনি আমাদের ভ্রম ছুটে গেল। বুঝতে পারলুম যে আওয়াজটা জানলা ছেড়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিতোষ অনেক গবেষণা করে বললে—এ মনে হচ্ছে হাঁসভূত। অতি দুঃখেও হাসি পেল। হংস দূতের কথা শোনা আছে কিন্তু হংসভূতের কথা তো কখনো শুনিনি বাবা। ওদিকে হংসভূতের গর্জনের ঠেলায় মনে হতে লাগল ঘরের মধ্যে যমদূত এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভয়ে আমাদের দেহে কালঘাম ছুটতে আরম্ভ করলে। সন্ধ্যাবেলায় রুটি গোস্ত ও কালরাত্রের কাঁচা চিচিঙ্গে ও কাঁচা ময়দার ঠুলি ভুল হয়ে দেহ বেয়ে ঝরতে লাগল। কতক্ষণ ধরে এই দুর্ভোগ আমাদের ভোগ করতে হয়েছিল অধিক বলতে পারি না। আমাদের তো মনে হয়েছিল—এই গর্জন শুনতে শুনতেই জীবন অবসান হবে। হংসভূতের গর্জন থেমে যাওয়ার পর বুকের ধড়ফড়ানি থামতে থামতে রাত্রি ভোর হয়ে গেল।

সকালবেলা কাজে লাগবার খানিক পরে সর্দার যখন রোদে এল তখন তাকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বললুম। সর্দারের সঙ্গে কথা বার্তা বলছি এমন সময় দেখলুম আমাদের চারপাশে অনেকগুলি এসে দাঁড়িয়েছে। দেখলুম, আমাদের কথা শুনে তাদের মধ্যে জম্ভর মতো চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। আস্তে কথা বলার রীতি তাদের মধ্যে নেই—তারা নিজেদের ভাষায় সশব্দে কিসব আলোচনা আরম্ভ করে দিলে। সর্দার একটা বিরাট ধমক ও তাড়া দেওয়ায় তারা যে যার কাজের দিকে চলে গেল। সর্দার আমাদের একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে এসব কথা তোমরা ওদের বলেছ নাকি?

—না তো!

সর্দার বললে—খবরদার! ওদের কিছু বোলো না, তা হলে ওরা সব কাজে আসা বন্ধ করে দেবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—ওটা কি জানোয়ার? সর্দার তার হাঁড়ি মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বললে—ও জানোয়ার না, ও হচ্ছে দেও। জঙ্গলে কতরকমের জিনিষ আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

মনে মনে বললুম—একরকম জিনিসেই যা অবস্থা হয়েছে—

সর্দার বললে—তোমরা কিছুতেই দরজা কিংবা জানলা খুলো না—তাহলে বিপদে পড়বে বলে দিচ্ছি।

সর্দার রোঁদ দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতেই চারিদিকে মজুরের দল—যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এসে আমাদের নানারকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। এ কয়েক দিন তাদের কথা শুনে শুনে সে ভাষা বলতে না পারলেও কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেছিলুম। আমাদের রাত্রের—অভিজ্ঞতা শুনে তারা যা বললে—তার তাৎপর্য হচ্ছে—এ জঙ্গলে অনেকদিন থেকেই দেবতারা বাস করছেন। এ জায়গাটা পরিষ্কার করার ফলে তাঁরা এখন সদলে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেছেন। মাঝে মাঝে ওই বাড়িটাতে এসে কেউ হানা দিয়ে থাকেন। ওইখানে সায়েবরা থাকত। দেবতারা এসে চলে যেতে বলায় তারা বাড়ি ফেলে চলে গিয়েছে।

আমরা তখন একটা লাঙল-চষা জমিতে পাথর ও আগাছা বাছবার কাজে লিপ্ত ছিলুম। আমার কাছেই একটা অল্পবয়সী মেয়ে কাজ করছিল। তার বয়স বোধ হয় পনের ষোল বছর হবে। অত্যন্ত রোগা, কিন্তু বসন্তের বাতাস পেলে যেমন কোনো কোনো শুকনো কাঁটাগাছেও ফুল ধরে, তেমনি তার দেহে যৌবনের আগমনীর সামান্য সুরের আমেজ লেগেছে মাত্র। কাজ করতে করতে একবার দু'জনে খুব কাছাকাছি এসে পড়ায় সে আমাকে কি যেন বললে। তার কথা ভালো করে বুঝতে না পারায় আমি আরও কাছে সরে যাওয়ায় সে আবার বললে—কাল রাতে কি হয়েছিল তোমাদের?

বললুম—তুমি কি করে জানলে?

সে বললে—সবাই বলছে কাল রাতে তোমাদের ঘরে নাকি দেও এসেছিল।

বললুম—দেও কিনা জানি না, তবে—এসেছিল কেউ।

মেয়েটিকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেই সে দাঁড়িয়ে উঠে তার মাকে ডাকলে। মা দূরে আমাদের ক্ষেতেই কাজ করছিল। মেয়ের ডাক শুনে একরকম ছুটে কাছে এল। মায়ের দেখাদেখি বাপ, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে যারা সকলেই কাছাকাছি কাজ করছিল—ছুটে এগিয়ে এল। মেয়েটি সকলকে কি সব বলায় মা এগিয়ে এসে আমাদের বললে—ও বাড়িতে আর তোমরা থেকো না। দেও বড় সর্বনেশে জিনিস!

আমরা বললুম—কিন্তু সর্দার—ব'লে দিয়েছে ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে আর কোনো ভয় নেই—আমরা

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

কল্লোল যুগের সাহিত্যে যাঁরা অগ্রগণ্য প্রতিভা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন, তাঁদের ব্যতিক্রম ছিলেন আরো কয়েকজন। যাঁদের রচনা কখনো হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো চকিতে পাঠকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হোত। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী নিয়মিত লেখক হিসাবে প্রথম পরিচিত হন নি। সাহিত্যিক সতীর্থদের চাপে কলম ধরেছেন। 'মহাস্থবর' এই ছদ্মনামে তাঁর যাত্রা শুরু। সেই জয়যাত্রায় তিনি সিদ্ধি অর্জন করেছেন কিছু-কালের মধ্যেই। 'মহাস্থবির জাতক' শীর্ষক রচনায় তিনি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব স্বাদ বিতরণ করতে সক্ষম হন। স্বনামেও বেশ কিছু গল্প এবং বিচিত্র গল্প রচনা তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে লিখেছেন। তাঁর রচনায় সরসতা এবং উপস্থাপন ভঙ্গিমার অনবদ্য রীতি লক্ষ্য করা যায়। প্রসাদগুণে ভরপুর তাঁর রচনা। সাংবাদিকের মতো ঋজুতা এবং তথ্যনিষ্ঠতাও তাঁর রচনার একটি বিরল সম্পদ সন্দেহ নেই। সমসাময়িক অপরাপর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মেলায় তিনি হারিয়ে যান নি। তাঁকে আলাদাভাবে সহজেই চেনা যায়। অলৌকিক আখ্যান রচনায়ও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর কিছু কিছু রচনা কালজয়ী হয়ে থাকবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প



বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হইবার আর দেরী নাই। রাস্তায় পুরাণো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল—এই যে, এখানে কী? চল, চল, জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোন নি? মস্ত বড় গুণী।

হাত দেখানোর ঝোক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভালো জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কী? যা বলে তা সত্যি হয়? আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে? দু'টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখনা বলতে পাবে কিনা।

কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ীর গায়ে টিনের সাইন-বোর্ডে লেখা আছে—তারানাথ জ্যোতিবিনোদ—

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠিবিচার করা হয়।

গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি।

আসুন ও দেখিয়া বিচার করুন।

বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ী।

হাসিয়া বলিলাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার, ভক্ত, তার এই বাড়ি?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে ?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষী-মহাশয় বাড়ি আছেন ?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোন উত্তর শোনা গেল না। তারপর দরজা খুলিয়া গেল। একটা ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল কোথা থেকে আসছেন ?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার কিনা দেখতে। এবার ডেকে নিয়ে যাবে।

আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল—আসুন ভেতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্তাপোশের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিত মশাই আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশি হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ বয়সেও গায়ের রঙের জৌলুস আছে। মাথার চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নীচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তাব্যঞ্জক। চোখ দুটি বড় বড়, উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল। উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশী, আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন, এখন তাহার যেন

অনেকখানিই হারাইয়া গিয়াছ, এই ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ নিবিষ্ট মনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনেরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, ঐ পনেরই শ্রাবণ। ঠিক? কিন্তু জন্মমাসে বিয়ে তো হয় না; আপনার হল কেমন করে? এরকম তো দেখিনি!

কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিন মনে ছিল এইজন্য যে, আমার জন্মদিন ও বিবাহ-দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটু গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তার সংগে আলাপ মোটে দু'বছরের, তাও এক ব্রীজ খেলার আড্ডায়। সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্তার কোন অবকাশ ছিল না।

তারপর বৃদ্ধ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর বর্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মস্ত বড় ফাঁড়া গিয়েছিল তের বছর বয়সে।

কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল—বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থ নষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না এবং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে।

আমি আশ্চর্য হইয়া উহার দিকে চাহিলাম। মাত্র দু'দিন আগে কলুটোলা স্ট্রিটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোটশুদ্ধ মানিব্যাগটি খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধ হয় থট্-রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে? এটুকু বোধ হয় ধাপ্পা। যাই হোক্, সাধারণ হাত-দেখা গণকের মত সব বুঝিয়া শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যে যাইতাম তাহা নয়, প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে।

লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎপায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী, তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধনা করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতাপাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে শুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোড়াদৌড়, ফাটক ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে, বড় বড় মাড়োয়ারীর মোটর গাড়ির ভীড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ির গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে শুরু করিল অজস্র। যে পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সাও দাঁড়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল—ঘোড়দৌড়, নারী ও সুরা। এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথাসর্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ তো সমান্য গণৎকার ব্রহ্মণমাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতাব অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার পসার নষ্ট হইল। তবুও ধূর্ততা ফন্দিবাজী, ব্যবসাদার প্রভৃতি মহৎগুণরাজিরকোনটিরইঅভাব তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তুবর্তমানেকাবুলীতাড়াইবারউপায় ওকৌশলবাহির করিতেই তারানাথের দিবসেব অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ইবা কই?

আমার মত গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসারনষ্ট হওয়ারপরে যে পায়

নাই, এ কথা ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপর বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার সঙ্গে তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জমিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে—তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য করে রেখে যাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কিনা। লোক পাইনি এতকাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতের আঙুলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চিত হয়ে শুয়ে থাক।। কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নিচে একটা গাছের তলায় দু'টি পরী। তুমি যা জানতে চাইবে, পরীরা তাই বলে দেবে। ভালো করে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার কিছু অজানা থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এমন সব অদ্ভুত কথা বলে, যা পথে-ঘাটে বড় একটা শোনা তো যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তাহা তো কোনদিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকালবেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোট কাগজের পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—'চল বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন। দেখা করে আসি। খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি। তারানাথের স্বভাবই ভাল সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ান—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব কর্ম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম তিনি আমাকে যে কোন একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন; আমি বেল

ফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন—পকেটে রুমাল আছে ? বার কর দেখ।

রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুমালখানাতে আমার নামও লেখা—সুতরাং হাত সাফাইয়ের সম্ভবনা আদৌ নাই।

কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তান্ত্রিক শক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরী করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোন মূল্য দিই না। আতর বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ, লোকটা নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র সাধনা করেছে, তারই ফলে দু' একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে।

তাই বা পায় কি করিয়া ? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেই তো অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মুহূর্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার রুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনেওতো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে, contact at a distance-এর গোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপ্‌নটিজম্‌, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার উপর ততক্ষণ কার্যকর হইতে পারে যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরেও আমার উপর হইতে যে হিপ্‌নটিজমের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সে প্রভাবের মূলে কি আছে সেও তো আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়িতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য হয়ে পড়লে, তবুওতো সত্যিকার তান্ত্রিক দেখনি। নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র এক ধরনের জাদু, যাকে তোমরা বল ব্ল্যাক ম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও জিনিসের চর্চা

যে না করেছি, তা নয়। ও আতরের গন্ধ আব এমন একটা কী। এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি, শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। একজনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমবাও এ-ধরনের লোক দেখেছ। সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিভে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্নধরনের তন্ত্রচর্চার শক্তি, ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া কিছুই নয়। এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি।

কি হল জান? ছেলেবেলায় আমাদের দেশে বাঁকুড়াতে এক নাম-করা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়ীমা তাঁব কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন। আমাদের বাড়ী এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায়ই বলতেন—দুই চোখের মাঝখানে ভুরুতে একটা জ্যোতি আছে ভাল করে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস। মাস দুই তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হল। মনে ভাবলাম চন্দ্রদর্শনের মত নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম—কী ধরনের জ্যোতি?—ঠিক নীল বিদ্যুৎ শিখার মত। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ির পিছনে পেয়ারাতলায় বসে সাধুর কথামতো নাকের উপর দিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকতাম,—সব দিন ঘটে উঠত না হপ্তার মধ্যে দু'তিন দিন বসতাম। মাস তিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হল নীল, লিকলিকে একটা শিখা, আমার কপালের মাঝখানে ঠিক সামনে খুব স্থির। মিনিট খানেক ছিল প্রথমদিন।

এইভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়িতে আর মন টেকে না, ঠাকুরমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়নি, মন্দিরে আরতি চলছে, এমন সময় একজন লম্বা চওড়া চেহারা সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমণ্ডলু হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম

তাঁর সারা দেহে এমন একটা কিছু ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না। সাধু তো কতই দেখি। চুপ করে আছি, সাধুবাবাজী জল ভরে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমারদিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন—বাবাজীর বাড়ি কোথায় ?

আমি বললাম—বাঁকুড়া জেলায়, মালিয়াড়া—রুদ্রপুব।

সাধু থমকে দাঁড়ালো। বললে—মালিয়াড়া—রুদ্রপুর ? তাবপর কি যেন একটা ভাবলো, খুব অল্পক্ষণ, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। তাবপব বললো—রুদ্রপুরের বামরূপ সান্ন্যালেব নাম শুনেছ ? তাদের বংশে এখন কে আছে জান ?

আমাদের গ্রামে সান্ন্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল ; খুব বড় বাড়ি ঘর, দরজায় হাতি বাঁধা থাকত শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু রামরুপ সান্ন্যালের নাম তো কখনও শুনিনি। সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন,—তোমার বয়স আর কতটুকু। তুমি জানবে কী করে। খেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে তো ?

খেয়াঘাট ! রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজেগিয়েছে কোন্ কালে। এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ গরু হেঁটে চলে যায়। তবে পুরনো নদীর খাতের ধাবে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্ন্যালদেরই কোন পূর্বপুরুষ ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি করে জানলেন ?

বিস্ময়েব সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা অনেক জানেন দেখছি ?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলো, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধ পিতামহের মুখে দেখা যায়, তাঁর অতি তরুণ, অবোধ পৌত্রের কোন ছেলে-মানুষি কথার জন্য। সত্যি বলছি, সে হাসির স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারিনি। খুব উঁচু না হলে অমন হাসি মানুষে হাসতে পারে না। তারপর খুব শান্ত, সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস কেন ? ধর্মকর্ম করবি বলে ?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন—বাড়ি ফিরে যা, সংসারধর্ম করগে যা। এ পথ তোর নয়, আমার কথা শোন্।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না। কিছু হবে না কেন? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িসনি, ছাড়তে পারবিও নি। তুই ছেলেমানুষ, নির্বোধ। কিছু বোঝবার বয়েস হয়নি। যা বাড়ি যা। মা-বাপের মনে কষ্ট দিসনি।

কথা শেষ করে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়েব কথা কী করে জানলেন বলবেন না? দয়া করে বলুন—

তিনি কোন কথার উত্তর না দিয়ে জোবে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খানিক দূবে গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন আসছিস?

—আপনাকে ছাড়বো না। আমি কিছু চাইনে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সস্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে তোর কোন লাভ হবে না। তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার যা চলে যা—তোকে আশীর্বাদ করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে, কি-একটা শক্তি আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন্ গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন বা কোন্ দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্যালের কোন হদিশ মেলাতে পারলাম না। সান্যালদের বাড়ির ছেলে-ছোকরার দল তো কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক শরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন। তিনি পেনশন নিয়ে

সেবার শীত কালে বাড়ি এলেন। কথায় কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বললেন—ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি তাতে আমাদের বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব সখ ছিল, অনেক কষ্ট করে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি করে বংশের কুলজী জোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি-চার-পাঁচ পুরুষ আগে আমাদের বংশে রামরূপ সান্ন্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না। রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেনি। অন্তত দেড়শো বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিব মন্দিরটা ও রকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্পা জায়গায় কেন ?

– তা নয়। ওখানে তখন বহতী নদী ছিল। খুব স্রোত ছিল বড় বড় কিস্তি চলত। কোন নৌকো একবার ওই মন্দিরের নিচের ঘাটে মারা পড়ে বলে ওর নাম লা-ভাঙার খেয়াঘাট।

প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলুম—খেয়াঘাট ?

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি, বাবার মুখে শুনেছি, তাছাড়া আমাদের পুরানো কাগজপত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা-ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বলতো, এসব কথা তোমার জানবার কী দরকার হল ? বই-টই লিখছ নাকি ?

ওদের কাছে কোন কথা বলিনি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই। কোন অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়শো বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ি থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরুই।

বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে এক পাগলী থাকে' সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম নদীর ধারে শ্মশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড় চোপড় পরনে, তেমনি মলিন জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো এখান থেকে' কে বলেছে তোকে এখানে আসতে ?

ওব আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল সেটাকে অতি কষ্টে চেপে বললাম—মা, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন, অনেক দূর থেকে এসেছি দয়া করুন আমাব ওপর।

পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বললে—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি আঙুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জন শ্মশানে, ভয় হল ওর মূর্তি দেখে, কি জানি মারবে-টারবে নাকি—পাগল মানুষকে বিশ্বাস নেই। সেই চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পরদিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি ?

বললাম—মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূব হ দূব হ, বেরো এখানথেকে—তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাথি। বললে—ফের যদি আসিস' তবে বিপদে পড়বি, খুব সাবধান !

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। কি এক পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি কোন্ দিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। সে চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখ, আমায় যেন বললে—লাথিটা খুব লেগেছে, না, রে ? তা রাগ করিসনি কাল যাস আমার ওখানে।

সাকালে উঠেই আবার গেলাম। ওমা, স্বপ্ন-টপ্ন সব মিথ্যে,

পাগলী আমায় দেখে মারমূর্ত্তি হয়ে শ্মশানের একখানা পোড়া কাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরিয়া হয়েছি, বললাম—তুমি তবে আমাকে বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে? তুমিই তো আসতে বললে, তাই এলাম।

পাগলী খিল খিল করে হেসে উঠল। তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে? তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম? হি-হি-হি-যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকৃষ্ট করেছে আমি বুঝলাম তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক, আমার মনে হল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে টানছে।

হাঠৎ- সে বললে—বোস্ এখানে।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে। তার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন খুব রাজা জমিদারের ঘরের কর্ত্রীর মত—তার সে হুকুম পালন না করে যে উপায় নেই।

কাজেই বসতে হল।

সে বললে—কেন এখানে এসে এসে বিরক্ত করিস্ বলতো? তোর দ্বারা কি হবে, কিছু হবেনা। তোরসংসারে এখনওপুরো ভোগ রয়েছে।

আমি চুপ করেই থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা কিছু খাবি? আমার এখানে যখন এসেছিস তার ওপর আবার বামুন, তখন কিছু খাওয়ানো দরকার। বল কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কতদূর দেখবারজন্য বড় কৌতুহল হল। এর আগে লোকের মুখে শুনে এসেছি, যা চাওয়া যায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে। কলকাতায় গন্ধবাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য বলে মনে হয়নি। বললাম—খাব অমৃতি জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্তমান কলা।

পাগলী এক আশ্চর্য ব্যাপার করল। শ্মশানের কতকগুলো পোড়া কয়লা পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললে—এই নে খা, ক্ষীরের বরফি—

আমিও অবাক্! ইতস্তত করছি দেখে সে পাগলের মতো খিল খিল করে কি এক রকম অসম্বদ্ধ হাসি হেসে বললে—খা খা—ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হল এ তো দেখছি পুরো পাগল, কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায় মড়া-পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর ফেরার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েছি। দিলুম সেই কয়লা মুখে পড়ে, যা থাকে কপালে। পরক্ষণেই থু থু সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার করে ফেলে দিলুম। পাগলী অবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে। কী বোকামী করেছি এখানে এসে—পাগলই,—পাগল ছাড়া আর কিছু নয় বদ্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েছে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললে—খেলি রাবড়ি মর্তমান কলা? পেটুক কোথাকার। পেটের জন্য এসেছ শ্মশানে আমার কাছে? দূর হ জানোয়ার—দূর হ! আমার ভয়ানক রাগ হল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ মুখের ওপর বলেনি। একটিও কথা না বলে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে স্বপ্নে দেখলাম, আমার শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে বলছে—রাগ করিস নে। আসিস, আজ, রাগ করে না, ছিঃ—

এখনও পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম।

যা হোক, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় জাদু করলে না কি!

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্তি ভারী প্রসন্ন। বললে—আবার এসেছিস্ দেখছি। আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো তুই?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমার নিয়ে? দিনে অপমান করে বিদেয় করে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল। এরকম হয়রাণ করে তোমার লাভ কী?

পাগলি বললে, পারবি তুই? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি? বললাম -আছে। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা করে। সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল্। গলা টিপে মেরে ফেল্। তারপর আমার মৃতদেহের ওপর বসে তোকে সাধনা করতে হবে! নিয়ম বলে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হুঁ। করে বিকট চিৎকার করে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোক মদ আর দু'টো চাল-ভাজা দিবি। ভোর রাত পর্যন্ত এমনি মড়ার উপর বসে মন্ত্রজপ করতে হবে। রাত্রে হয়তো অনেক রকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় করিস না। ভয় পেলে সাধনা তো মিথ্যে হবেই, প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পারিস। কেমন রাজী?

ও যে এমন কথা বলবে বুঝতে পারিনা। কথা শুনে তো অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—সব পারব, কিন্তু মানুষ খুন করা আমার দ্বারা হবে না। আর তুমিই বা আমার জন্য মরবে কেন? পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিস্ কেন মুখ-পোড়া, বেরো দূর হ।

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগালি দিলে। ওর মুখে কিছু বাধেনা, মুখ খুব খারাপ। আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখিনে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বললাম—রাগ করছ কেন? একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত করে বললে—ভদ্দর লোকের ছেলে তবে এ পথে এসেছিস কেন রে? ও অসপ্পেয়ে ঘাটের মড়া? তন্ত্র-

মন্ত্রের সাধনা ভদ্দর লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর পড়ে হৌসে চাকরি কর গিয়ে—বেরো।

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর। পুলিশের হাঙ্গামার কথাটা তো ভাবছ না। আমি যখন ফাঁসি যাবো, তখন ঠেকাবে কে?

মনে মনে আবার সন্দেহ হল, না এ নিতান্তই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। এর কাছে এসে শুধু এতদিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া কিছুই নয়।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি, তন্ত্রের কথা শুনেছি। সময়ে সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে ওকে বিদূষী বলে সন্দেহ হয়।

সেইদিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হল। বিকেলে যখন গেলাম তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না, তোকে ও বেলা গালাগালি দিয়েছি, কিছু মনে করিসনে। ও সব নিম্নতন্ত্রের সাধনা। ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তিলাভ হয়। তাছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয়? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে, তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ মরে দেহ শূন্য হলে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশী। এদের দেখা যায় না। তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাঁখিনী এইসব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ মরে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন্ বলে। এদের মধ্যে ভাল-মন্দ দুইই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না করে উপায় নেই। কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েছ, তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এ সব কথা আর কখনও

শুনিনি। এর মত পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনছি, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম্য শ্মশান, একটা বড় তেঁতুল গাছ আর একদিকে কতকগুলো শিমূল গাছ। দু চার দিন আগের একটা চিতার কাঠকয়লা আর একটা কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েছে। কোনদিকে লোকজন নেই। অজ্ঞাতসারে আমার গা যেন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও বলে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরনের কথা।

—এক ধরনের অপদেবতা আছে, তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া-মায়া বলে পদার্থ নেই তাদের। পশুর মত সব। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশী হয় বলে যাদের বেশি দুঃসাহস, এসব তান্ত্রিকেরা হাঁকিনী-মন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হলে খুবই ভাল, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস নে, তাই রাগ করিস।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তাহলে হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না ? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাঁকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুঝলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে না। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে—আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর মধ্যে এমন শক্তিআছে, আপনার একেবারে সর্বনাশ করে দিতে পারে। ওকে বেশি ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের কোন লোক ওর কাছেও ঘেঁষে না। বিদেশী লোক, মারা পড়বেন শেষে ?

মনে ভাবলাম, কী আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তারপরে একদিন যা হল, তা বিশ্বাস করবেন না। একদিন সন্ধ্যের পরে পাগলীর কাছে গিয়েছি, কিন্তু এমন ভাবে গিয়েছি পাগলী না টের পায়। পাগলীর সেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ষোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে, সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভুল নয় মশায়, আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপসা দেখবার কথা নয় স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই তো! 'এ আবার কে এল? যাই, কি না যাই? দু'এই পা এগিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম—মা, তিনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটি হেসে বললে—কে?

—সেই তিনি, এখানে থাকতেন।

—মেয়েটি খিল্ খিল্ করে হেসে বললে—আ মরণ কে তার নামটাই বল না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে না কি?

আমি চম্‌কে উঠলাম। সেই পাগলীই তো! সেই হাসি সেই কথা বলবার ভঙ্গি। এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েছে লুকিয়ে! সে এক অদ্ভুত আকৃতি—ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী বালিকা।

মেয়েটি হেসে ঢলে পড়ে আর কি! বললে—এস না, বস না এসে পাশে—লজ্জা কী? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই। এস—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভাল বলে মনে হল না—তাছাড়া আমার দৃঢ়বিশ্বাস হলএ পাগলীই, আমায় কোন বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময় পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম দেখি বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায়নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এস, বস।

বললাম—তুমি ও রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা কী?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল বক্‌ছে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলছি, আমায় কোন ভয় দেখিও না। যখন তোমায় মা বলে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন তবে! তুই সে রকম নস্‌। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক, তোকে দু'একটা কিছু দেব, তাতেই তুই করে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই! আসবে শিগ্‌গির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা কর! কিন্তু যা বলে দেব, তাই করবি। রাজি আছিস? শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোনকালেই, তবুও কখনও মড়ার উপরে বসে সাধনা করব এ কল্পনাও করিনি। কিন্তু রাজী হলাম পাগলীর প্রস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিশের হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সবটাতে রাজী আছি।

একদিন সন্ধের কিছু আগে গিয়েছি। সেদিন দেখলাম পাগলীর ভাবটা যেন কেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চুপি চুপি এস।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়ানো পাকানো জলমগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ের মড়া বাঁধা আছে। কোন ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধ হয়।

ও বললে—তোল্‌ মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হালকা হবে। ওকে তুলে শেকড়ে রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কী করছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে, আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হোলনা, অল্প চেষ্টাতেই সেটা টেনে তুলে ফেললাম।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর বসে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাবি নে তো? পেয়েছ 'ক মরেছ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে। সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা! অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ কোন তফাৎ নেই।

পাগলী বললে—চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন, আপদ।

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হল। মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি। গাঁয়ের লোক ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে, সন্ধ্যে থেকে আমাকে তা করতে হল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সন্ধ্যের পর থেকেই আমি শবের আসন করে বসলাম।

পাগলী একটা অর্থশূন্য মন্ত্র আমাকে বললে সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয়নি যে এতে কিছু হয়। এমন কি ও যখন বললে—যদি কোন বিভীষিকা দেখ, তবে ভয় পেও না, ভয় পেলেই মরবে—তখনও আমার মনে বিশ্বাস হয়নি

রাত্রি দুপুর হল ক্রমে। নির্জন শ্মশান, কেউ কোন দিকে নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকারে দিক্‌বিদিক্ লুকিয়েছে। পাগলী কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখিনি।

হঠাৎ একপাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে বনের ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক তো কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়নাক শ্মশানে এক টাটকা মড়ার ওপর বসে সেই শেয়ালের ডাকে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা না করা

তোমার ইচ্ছে কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে বলে আমার কোন স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা, তুমি আমায় এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল শ্মশানের নিচে নদী, জল থেকে দলে দলে সব বৌ-মানুষেরা উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা। জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো দলে দলে—একটা দুটো, পাঁচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভালো করে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চারপাশে একটাও বৌ নয় সব বক্‌বা পাখি,—বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়।

দু'-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মত।

এক মুহূর্তে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেল—তাই বল। হরি হরি! পাখি!

চিন্তা সম্পূর্ণ শেষ হয়নি—পরক্ষণেই আমার চারপাশে মেয়ে গলায় কারা খল্ খল্ করে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয়, সব অল্প বয়সী বৌ। তারা তখন সবাই একযোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে। আর তাদের চারদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে নিকটে, ডাইনে, বাঁয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে। কত কালের পুরানো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনটার মাথার খুলি ফুটো, কোনটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে ফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় কেউ যেন তাদের বহুযত্নে তুলে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া করে রেখেছে, সে যেই ছেড়ে দেবে, অমনি

কঙ্কালগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা তোবড়ানো নোনাধরা হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমি প্রাণ নিয়ে যেন এ শ্মশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমার গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

সোজা দৌড় দেব ভাবছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার কে? যা হোক সব রকম ব্যাপারের জন্য আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শবসাধনা করতে নামিনি। আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমায় তোমার পছন্দ হয়না?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের তো শুনেছি অনেক সাধনা করেও দেখা মেলেনা, আর অত সহজে ইনি···বললাম···আমার মহাসৌভাগ্য যে এসেছেন···আমার জীবন ধন্য হল।

মেয়েটি বললে তবে তুমি মহা ডামরি সাধনা করছ কেন?

—আজ্ঞে, আমি তো জানি নে কোন সাধনা কী রকম! পাগলী আমায় যেমনি বলে দিয়েছে, তেমনি করছি।

—বেশ, মহাডামরী সাধনা ছাড়। ও মন্ত্র জপ করো না। যখন দেখা দিয়েছি, তখন তোমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি মহা ডামরী ভৈরবী দেখনি—অতি বিকট তার চেহারা...তুমি ভয় পাবে ছেড়ে দাও মন্ত্র।

সাহসে ভয় করে বললাম—সাধনা করে আপনাদের আনতে হয় শুনেছি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে?

আমায় মনে হল এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন আমার মাথায় গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিছু ঠিক করতে

পারলাম না। বললাম—সন্দেহ হয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানিনা কে আপনারা···যদি অপরাধ করি মাপ করুন, কিন্তু কথার জবাব যদি পাই।

বালিকা বললে—মহাডামরীকে চেন না? আমাকেও চেন না? তাহলে আর চিনে কাজ নেই। এসেছি কেন জিজ্ঞেস করছ? দিব্যৌঘ পথের নাম শোননি তন্ত্রে? পাষণ্ড দলের জন্যে ঐ পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার মন্ত্রে দিব্যৌঘ পথের সাড়া জেগেছে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভাল বুঝতে পারলাম না, ভযে ভয়ে বললাম—তবে আমি কি খুবই পাষণ্ড?

বালিকা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

বললে, তোমার বেলা এসেছি সম্প্রদায় রক্ষার জন্যে অত ভয় কিসের? আমি না তোমাকে লাথি মেরেছি? শ্মশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেছি? তোমাকে পরীক্ষা না করে কি সাধনার নিয়ম বলে দিয়েছি তোমাকে?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি, বলে কী?

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোমার যেমন ভয়, সে তুমি পারবে না—ও ছেড়ে দাও।

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলে?

—দিলাম। এ সময়ে যে-শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার নজর পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্বশরীর কেমন হয়ে গেল।

শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোন তফাৎ নেই। একই মুখ, একই রঙ, একই বয়েস।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখছ কী?

আমি কথার কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখেই প্রকাশ করে

বললাম—কে আপনি ? আপনি কি শ্মশানের পাগলী না কি ? একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেড়ে চৌচির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরকঙ্কালগুলো হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকেবেঁকে উদ্দাম নৃত্য শুরু করলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। কোন কঙ্কালের হাত খসে পড়ল, কোনটার মেরুদণ্ড, কোনটার কপালের হাড়, কোনটার বুকের পাঁজরা-গুলো—তবুও তাদের নৃত্য সমানেই চলেছে—এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল আর হাড়ে হাড়ে লেগে কী বীভৎস ঠক্-ঠক্ শব্দ।

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন জড়িয়ে গুটিয়ে গেল কাগজের মত আর সেই ছিদ্রপথে যেন এক বিরাট মূর্তি নারী উন্মাদিনীর মত আলু-থালু বেগে নেমে আসছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল, বিশ্রী মড়া পচার দুর্গন্ধে চারিদিক পূর্ণ হল, পেছনের আকাশটা আগুনের মত রাঙা মেঘে ছেয়ে গেল, তার নীচে শকুনি উড়ছে সেই গভীর রাতে। শেয়ালের চীৎকার ও নর-কঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি সব জগৎ নিস্তব্ধ, সৃষ্টি নিঝুম।

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে! পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুটে আসছে। তার আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলন্ত দু'চোখে ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ মেশানো, সে কী ভীষণ ক্রুর দৃষ্টি। সে পূতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন-রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েছে একই উদ্দেশ্যে—সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে চায়।

যে শবটার ওপর বসে আছি—সে শবটা চীৎকার করে কেঁদে উঠে বললে—আমায় উদ্ধার কর, রোজ রাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন করে মেরে ফেলেছে বলে আমার গতি হয়নি—আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি এই শ্মশানে। ছাপান্ন বছর কাকেই বা বলি? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন ভোর ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হলে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী বসে মৃদু-মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে···সেই বটতলায় আমি আর পাগলী দু'জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে। আসন ছেড়ে পালিয়ে'ছিলি না?

আমার শরীর তখনও ঝিম ঝিম করছে।

বললাম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মহা- বিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ ছেড়ে দিলি। দূর, ওসব হাঁকিনীর মায়া। ওরা সাধনার বাধা। তুই ষোড়শীকে চিনিস না, শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।

'এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।'

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা। তুই আর জানিস কি? ও-সব মায়া।

আমি সন্দিগ্ধ সুরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন সে। আরও এক বিকট মূর্তি পিশাচীর মতো চেহারার নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না। তার পরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল—কী সেটা?

পাগলী বললে···তোর ভাগ্য ভাল। শেষকালে যে বিকট মূর্তি মেয়ে দেখেছিস, তিনি মহাডামরী মহাভৈরবী···তুই তার তেজ সহ্য করতে পার'ল নে···আসন ছেড়ে ভাগলি কেন?

তারপর সে হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠে বললে···মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার। উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের। আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করি নে—হাঁকিনীদের নিয়ে কারবার কার। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেল্কি দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে বসে আছিস বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই? সকাল কোথায় এখন, যে সারারাত সাধনা করে আসন ছেড়ে এলি? এই তো সবে সন্ধে···

…অ্যাঁ!

আবার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা হয় হয়। আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল ছ'টায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙায় তোলা। শবসাধনা, নরকঙ্কাল, যে ড়শী, উড়ন্ত চিল-শকুনির ঝাঁক,…সব আমার ভ্রম!

হতভম্বের মত বললাম…কেন এখন ভোলালে আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে?

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। তোর মধ্যে সে জিনিস নেই, তোর কর্ম নয় তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোনদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও আর দেখা পাবিনে।

বললাম…একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি তো অসাধারণ শক্তিধর। তুমি ভেল্কি নিয়ে থাক কেন? উচ্চতন্ত্রের সাধনা কর না কেন?

পাগলী এবার একটু গম্ভীর হল। বললে…তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামরী, ত্রিপুরা, এঁর মহাবিদ্যা। ব্রহ্মশক্তির নারী রূপ। এঁদের সাধনা একজন্মে হয় না—আমার পূর্বজন্মও এমনি কেটেছে, এ জন্মও গেল; গুরুর দেখা পেলাম না। যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব বকে কী করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশী দিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাই নি, ভয়েই যাইনি। পাগলীর দেখাও পাইনি আর কোনদিন।

তখন চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে, পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারে কেউ ছিল না সে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্য পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত, তুমি আমি সামান্য মানুষে তার কী বুঝব? যাক্ সে কথা, শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারিনি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন

এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও? এস, চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে।

আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাততঃ চন্দ্র-দর্শন অপেক্ষাও গুরুতর কাজ বাকী। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহার আমি কোন জবাব দিব না।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। কল্লোল যুগের পাশাপাশি একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতেই তাঁর প্রবেশ ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যে নিসর্গ চরিত্রকে এমন ভাবে রূপায়িত করা বিভূতিভূষণের পূর্বে সম্ভব হয়নি গ্রাম-বাংলা এবং বিহার অঞ্চলের মনোরম নৈসর্গিক পটভূমি তাঁর রচনায় বার বার উৎকীর্ণ হয়েছে। সেখানে প্রকৃতি শুধুমাত্র পটভূমি নয়, জীবন্ত চরিত্রও বটে। কথাসাহিত্যে এই নতুন ধরনের মিষ্টিসিজম্ বিভূতিভূষণের নিজস্বতার বিশিষ্ট পরিচয়বহ। তাঁর পথের-পাঁচালী, আরণ্যক, অপরাজিত, ইচ্ছামতী, দৃষ্টিপ্রদীপ, যাত্রা বদল, মেঘ মল্লার প্রভৃতি গ্রন্থে এই পরিচয় সঞ্চারিত। তাঁর অসংখ্য গল্পেও সেই দৃষ্টান্ত সপ্রমাণিত। বাংলার তন্ত্রসাধনার বিষয়েও তাঁর অপার কৌতূহল ছিল। সেই বিষয়েও তাঁর কয়েকটি অনবদ্য গল্প রচিত হয়। অলৌকিক গল্পের ক্ষেত্রে এগুলি মূল্যবান সংযোজন সন্দেহ নেই। ১৮৯৪ সালে এই প্রতিভাবান লেখকের জন্ম হয় এবং ১৯৫০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

ভূতের গল্প



ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সে বার শরীরটা বেশী রকমের খারাপ হয়। ঘুম হত না রাত্রে। ভোর বেলা তন্দ্রা আসত, কিন্তু ভীষণ স্বপ্ন দেখতাম। দুর্গন্ধ কোব্‌রেজী তেলে উপকারের মধ্যে খুব সর্দ্দি হল। ঘুম না হওয়ার জন্য যা কষ্ট তার চেয়ে বেশী সর্দ্দির। সারাদিন মন খারাপ করে থাকতাম, কোথাও যে বেড়াতে যাব তাও ভাল লাগত না। আর যাবই বা কিসে? ট্রামের চাকায় ও মাথায় ভারি বিদ্যুৎ চমকায়, মোড় ফেরবার ও থামবার সময় কিচ্‌ কিচ্‌ করে ওঠে, চলবার সময় শব্দ হয়। বাসে চড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ট্যাক্‌সী রোজ রোজ কিছু চড়া যায় না—বাঙ্গালী হিন্দু ড্রাইভারও ডাকতে না ডাকতে মেলে না। ড'ক্তারেরা পরামর্শ দিলেন দার্জ্জিলিং কিংবা শিলং যেতে, কোবরেজে বল্লেন পুরী। শেষে হোমিওপ্যাথের মতেই কাজ করলাম। গেলাম চন্দননগরে।

সেখানে থাকবার সুবিধা ছিল। আমার দাদা দূরসম্পর্কের হলেও পরমাত্মীয়, সেখানে থাকতেন। তাঁর বাড়ী খুব বড় ও খোলা যায়গায়, গঙ্গার ধারে না হলেও কাছে একমিনিটের রাস্তায়। সংসারে এক স্ত্রী ভিন্ন দ্বিতীয় বালাই নেই। বৌদিও চমৎকার লোক মোটর পর্য্যন্ত চালাবার দরকার হলে পিছপাও হন না, ইংরেজী বলেন, ডিনার খান অর্থাৎ সিগারেট খান না, খোঁপাও বাঁধেন। তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা অতি মধুর সম্বন্ধ ছিল যার জন্য অতিথি অভ্যাগতের

প্রতি সৌজন্যরক্ষা অতি সহজেই সম্পন্ন হত। তাঁর বাড়িতে প্রতি শুক্রবার সহরের ভদ্র যুবকদের বৈঠক বসত। সে বৈঠকে আমি যোগ দিয়েছি, কখনও কোন আড়ষ্টভাব কিংবা অভদ্রতা লক্ষ্য করিনি। সব সময়েই খুব যে উঁচুদরের কথা হত তা নয়। হাসি ঠাট্টা, খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা, মজা তামাশাও হত, আবার ছন্দ নিয়ে কূটতর্কও বাদ যেতনা। এক এক শুক্রবার আবার নতুন কিছু একটা মজা করা হত দাদা-বৌদির সংসারে সত্যিকারের লক্ষ্মী বাসা বেঁধে ছিলেন, এমন সুষ্ঠু সংসার চোখে পড়ে না। তাই যখন হোমিওপ্যাথ গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করে মাথা ঠাণ্ডা করতে উপদেশ দিলেন আমি বৌদিকে একখানা চিঠি লিখলাম, কিছু দিন গিয়ে থাকতে পারি কি না, অনেক দিন যাইনি, কোন খবরও পাইনি, যেতে ইচ্ছে করছে। অসুখের কথাও লিখলাম গুছিয়ে, দাদা ডাক্তার কিনা। পরের দিনই উত্তর এল, যেন বৃহস্পতিবারে না গিয়ে শুক্রবারেই যাই। ষ্টেশনে গাড়ি থাকবে। শুক্রবারেই পৌছতে অনুরোধ করার কারণ এই যে হয়ত শনিবার দাদাকে একবার চুঁচড়ো যেতে হবে—সিভিল সার্জ্জনের সঙ্গে কনসাল্‌টেসনে।

ফরাসীদের চন্দননগর হলেও পাড়া গাঁ। সন্ধ্যাবেলায় ঝিঁ ঝি পোকা ডাকে, রাতে শেয়ালের ডাকও শোনা যায়। অন্ধকার সূচিভেদ্য না হলেও রাস্তার আলোর পক্ষে রীতিমতই দুর্ভেদ্য। সব রাস্তাগুলোই যেন বাগানের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। দুপাশে খোলা নালা, নিশ্চয়ই সাপ আছে। বাগানের মধ্যে বাড়ির গায়েই বুড়ো বুড়ো গাছ, তাল, নারিকেল, আম, কাঁটাল, বাজ পড়লে আর রক্ষে নেই, বেত আছড়া সাপ লাফিয়ে ঘরে ঢুকতে পারে। তবে ঐ যা, কোন বাস-ট্রামের গোল নেই—যা হয় শনিবারের রাত্রে, রাস্তার মোড়ে, তাও কলের ও কোলকাতার বাবুদের গলায়। যখন পৌছলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। ষ্টেশনে মোটর আসেনি দেখে একটু চিন্তিত হলাম। একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার বল্লেন, 'তার আর কি? আসুন না আমাদের গাড়িতে। সহর থেকে অমন অনেক শেয়ারের গাড়ি যাতায়াত করে।

মাথায়ও লোক চড়ে দরকার হলে। আমি ভেতরেই স্থান পেলাম। নড়বড়ে গাড়ি, কিন্তু চলে মন্দ নয়, শব্দ হয় মড়মড়, ক্যাঁচকোঁচ, তার ওপর ছপ্‌টির ছপাং ছপাং। গাড়িতে উঠেই কানে বোরিক তুলো গুঁজে দিলুম; বাজ ও ধাতবপদার্থের ঘর্ষণের আওয়াজ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদাই খানিকটা মেডিকেটেড তুলো সঙ্গে রাখি, কেটে গেলে দরকার হতে পারে। কানে গুঁজলাম লুকিয়ে, কেননা লোকদের কানেও যে চামড়া নেই আমি সঙ্গীতের আসরে গিয়ে পরিষ্কার বুঝেছি। একটা চৌমাথার মোড়ে আমাকে নামতে হল, গাড়োয়ান সুটকেস্‌টা নামিয়ে দিলে, পয়সা চুকোবার সময় বলে দিলে 'ঐ কাঁসিতলার গলির শেষের বাড়িটা, বড় ফটকঅলা বাড়ি, দেখলেই চিনতে পারবেন। সুটকেসটা হাতে নিয়ে অগ্রসর হলাম। ঠিক গলি নয়, কোলকাতার বড় রাস্তার মতন। তবে এ রকম অন্ধকার কোলকাতার কোন বাই লেনেও নেই। যত সব পাখী গাছের ওপর আওয়াজ করছিল। অদ্ভুত আওয়াজ সব, মোটেই পরিচিত নয়, বোধ হয়, বাদুড়ের। না হোক্, চামচিকের—অন্তত গন্ধে তাই মনে হল। একটা চামচিকে—চামচিকেই বোধ হয়, আমার অগ্রদূত হয়ে উড়ছিল। পাখীটা কানা, নচেৎ অত ঘোরে কেন? কিংবা হয়তো কোন ভাঁটিতে পড়ে গিয়েছিল। পাখীটার দিকে চাইতে চাইতে হোঁচট খেলাম। খুব দূরে মনে হল একটা আলো জ্বলছে। দশবিশ কদম এগোতেই দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ফটক হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভের শেষে গাড়ি-বারাণ্ডা, তাইতে একটা আলো ঝুলছে। নিশ্চয়ই এ বাড়ীটা, কেননা এ বাড়ী আমার পরিচিত। তবে পাড়াগাঁ-কে বিশ্বাস করতে নেই, বিশেষতঃ রাত্তিরে। কি জানি, ঐ ধরনের অনেক বাড়ি হয়ত আছে। বাড়ির ত আর নম্বর নেই, আলোর বহরও এত কম যে তাতে করে বাড়ী চেনা যায় না। মনটা একটু বিরক্তও হয়েছিল, অতটা রাস্তা একলা আসব সুটকেস ব'য়ে, জানলে হয়ত আসতাম না। যা হোক্, এসে যখন পড়াই গেছে তখন মন্দ হল না। একটু

এডভেঞ্চার না হলে জীবনটা নীরস হয়ে যায়। স্নায়ু দৌর্ব্বল্যের পক্ষে একটু আধটু বৈচিত্র্য ভালই।

দারোয়ান হাত থেকে সুটকেস নিয়ে এগিয়ে চলল। গাড়ি বারাণ্ডার নীচে সিঁড়ির উপর একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছেন। এক চট্‌কায় দেখে চেনা-মুখ বলে মনে হল না। পেশোয়ারী চালে ধুতী পরা, ছোট পাঞ্জাবী, চোখে কাল টর্টিজ শেলের মস্ত গোল চশমা। আমাকে দেখে, 'এই যে দাদা' বলে এগিয়ে এলেন। 'এ কি, হেঁটে যে! গাড়ী কোথায়? তাও ত' বটে! রঘুটা চিনতে পারেনি নিশ্চয়ই। মালি হয়েও ফুল চিনলি না, ব্যাটা আহাম্মক। যাক গে পৌঁচেছেন এই ভাগ্যি। গলিটাও ভাল নয় আবার। ওরে চা দে'।

ড্রইংরুমে আলো নেই দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দাদা বৌদি বুঝি বাড়ী নেই? 'না ডাক্তারবাবুকে হঠাৎ চুঁচড়ো যেতে হয়েছে, আজ রাতে হয়ত আসবেন না। বৌদি, আহা বৌদি···কেন আপনি কি জানেন না?'

'কেন, বৌদি বুঝি বাপের বাড়ি গেছেন?

'হু··· ·আজ আমাকেই অতিথি সৎকার করতে হবে-নিজগুণে দোষত্রুটি দেখবেন না।

ছোকরাটি ভারি সপ্রতিভ। নিশ্চযই যুদ্ধের ফেরৎ! ফরাসী সভ্যতার ছোঁয়াচে মানুষ সামাজিক হয়ে ওঠে, বোবার মুখ ফোটে, ব্যবহার সহজ হয় – আর ইংরেজী সভ্যতা! ওজাতের ভদ্রতা কোথায়? পোড়ামুখো জাত, তাই বাঙ্গালীরাও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি আমাকে ড্রইংরুমে নিয়ে গেল। নিজে প্রথমে ঢুকে আলো জ্বেলে দিলে। প্রকাণ্ড ঘর, মাঝখানে একটা চৌকা লণ্ঠন জ্বালো, বৈদ্যুতিক লণ্ঠনটি মজার। কাল ঘেরা টোপের ওপর বোধহয় একটা চানে ড্র্যাগন কিংবা গারগইলের মতন জন্তু আঁকা। এই ধরনের bizarre ও exotic রুচি আমার ভাল লাগে না। যখন সুক্ষ্মরুচি ভোঁতা হয়ে যায়, জীবন স্রোতে ভাঁটা পড়ে, দৈনান্দিন সুপরিচিতের আস্বাদ মুখে রোচেনা, তখনই অদ্ভুত একটা কিছুর প্রয়োজন হয়। আলোক

দিকে চেয়ে থাকতে দেখে ছেলেটি বল্লে, ওটা আমার আঁকা। আচ্ছা এবার চা আজ্ঞা হোক।' চা এল সঙ্গে খাবার। চা এর সঙ্গে খাবার খাইনা সাধারণত চা এর রসভঙ্গ হয়, কিন্তু ছেলেটির নিরতিশয় অনুরোধে খেতেই হোল। কর্তব্য জ্ঞানের দায়িত্ব সে নাছোড়বান্দা হয়েছে। নিয়ম ভঙ্গের জন্য মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল, সেও বুঝলে অন্যায় হয়েছে। তাই দুইজনেই একটু কেমন চুপচাপ হয়ে রইলুম। অপ্রস্তুত হয়েছে দেখে আমিই কথা পাড়লাম—

'আচ্ছা, এ গলিটার নাম কেন ফাঁসিতলা ?

'বহুপূর্বে ঐ মোড়ে যে গাছটা দেখলেন তার নীচে একবার একটি লোককে গিলোটিন্ করা হয়েছিল। সে ভারি আশ্চর্য কাণ্ড, শুনবেন ?

'না, থাক্‌গে, তাহলে ওখানে বেশী আলো দেওয়া উচিত।

'দেওয়া হয়, কিন্তু হাওয়াতে কেবল নিয়ে যায়।

'চন্দননগরে খুব হাওয়া বুঝি ? গঙ্গার হাওয়াতে প্রাণ জুড়োয়। একবার রাজগঞ্জে গিয়েছিলাম, মনে আছে হাওয়াতে আমাকে ডেক থেকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আর কি !

'চলুন এই ত' ষ্ট্রাণ্ড; পাশেই। হাওয়া দেখবেন চলুন, কাকে হাওয়া বলে !

'বেশ ত চলুন না আলো নিয়ে যাওয়া যাক। ছেলেটি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল।

'লোকে যে পাগল বলবে দাদা, ষ্ট্রাণ্ডে লণ্ঠন। এ ফারাসী রাজত্ব লোকে ঠাট্টা করতেও জানে, তাই ঠাট্টাকে ভয় করে চলতে হয় দাদা। কোলকাতা নয় যে বড়বাজারে পিদ্দিম নিয়ে রাস্তায় হাঁটলেও ফিরে লোকে তাকাবে না। তাছাড়া, ডাক্তারবাবুর এখানে এসেছেন, তাঁর পসার মাটি হবে যে।'

লণ্ঠন না নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। বাস্তবিকই এমন সুন্দর জায়গা দুর্লভ এদেশে। প্রকাণ্ড চওড়া ও লম্বা পাথর-বাঁধান রাস্তা, গঙ্গার কিনারে বড় ফুটপাথ, তার ওপর বেঞ্চি, দূরে দূরে বড় বড় ঘাট, রাস্তার ওপাশে কাফে, হোটেলে, মেয়েরা খাচ্ছে চোখে পড়ল। ক্যাক্টরী আমার

চক্ষুশূল, কিন্তু রাত্রে ভারী সুন্দর দেখায়, বিশেষতঃ আলোর মালা। গঙ্গার স্রোতে প্রতিবিম্ব একটু কাঁপছিল। যেন স্বপ্নপুর'! একটা বড় গাছের তলায় বেঞ্চিতে আমাকে ছেলেটি বসালে। দৃশ্যের খাতিরে সিগারেটের নতুন টিন খুললাম। এগিয়ে দিতে উত্তর পেলাম—'খাই বটে, কিন্তু আপনার সামনে খাব না।' ছেলেটি সত্যাই অনেষ্ট। না খেয়ে যদি ছেলেটি ঐ কথা বলতে পারত তা হলে অধ্যক্ষ হেরম্ববাবু ভালবাসতেন নিশ্চয়, সিটি কলেজের জলপানি পর্য্যন্ত পেত।

চন্দননগরের ইতিহাস শোনা গেল। অতি পুরাতন সহর, গঙ্গাবক্ষে যুদ্ধ, বর্গীর আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে স্বদেশী যুগের উপেন বাঁড়ুয্যে, চারু রায়, কানাই দত্ত, রাসবিহারী বোসের কাণ্ড সব ই ছেলেটির জানা। তা ছাড়া, প্রায় প্রত্যেক পুরানো বাড়ির গল্প তার ঠোঁটস্থ। আমাদের দেশের লোকেরা নিজেদের পারিপার্শ্বিকের কোন খবরই রাখেনা, তাদের ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান স্বল্প। কারণ বোধ হয় দেশটা ছোট নয়। ইংলণ্ড ফ্রান্সে প্রত্যেক গ্রামের নামের ইতিহাস, রাস্তা, ভাঙ্গা গির্জ্জা ও প্রসাদের ইতিহাস নিয়ে লোকে মাথা ঘামায় তাদের দেশাত্মবোধ এই স্থান মাহাত্ম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে অত সুদৃঢ়। আমাদের দেশে সতীর অঙ্গ যেখানে পড়েছে সেখানে পূজো দিয়েই খালাস, ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের যে প্রয়োজন আছে জানিই না। তাই ছেলেটির মুখে সহরের নানা বৃত্তান্ত শুনে ভারি আনন্দ হল। উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু জেলের ঘণ্টা বেজে উঠল, সেই সঙ্গে গির্জ্জার ঘড়িতে ন'টা বাজল। 'এইবার দাদা উঠতে হবে, আর বসবার হুকুম নেই চলুন, খাওয়া দাওয়া করা যাকগে।'

ওঠা গেল। পথে শুনলাম তার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ, লোকে পুণ্ড্র ব'লে ডাকে। নেহাৎ আত্মীয়েরা পুঁটু বলেন।

'তবে ঐ ব্যাপারের পর কাউকে ও নাম ধরে ডাকতে দিই না, ভাল লাগে না শুধু নয়, দিনের বেলা ও ডাক শুনলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। দিদির এত আদরের ডাক!'

'ও নাম বুঝি আপনার দিদির দেওয়া।'

'হুঁ'

'তিনি বুঝি এখন স্বর্গে?

'স্বর্গেও বটে, মর্তেও বটে। কেন আপনি কি জানেন না?'

আমি একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম। পুত্র বড় স্নেহশীল বুঝলাম। কিন্তু আমি কি করে তার বাড়ির খবর জানব?

বাড়ি ফিরে দেখি সব অন্ধকার। পাড়াগাঁয়ের বিজলী বাতি নিয়মের ভদ্রতার তোয়াক্কা রাখেনা, কল চালাবার সময় গোল হয়না, সাহেবদের কল কিনা, ধনিক তন্ত্র নির্মম ভাবেই কাজ আদায় করতে জানে। গাড়-বারাণ্ডায় প্রবেশ করা মাত্র দারোয়ান হাতলণ্ঠন নিয়ে হাজির, দাঁত বার করে। পিতু জ্বলে গেল। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে পড়লাম। বেয়ারা এসে ড্রইং রুমের টেবিলে একটা আলো বসিয়ে খাবার ঘরে আলো দিতে গেল। ভারী খারাপ লাগছিল। মানুষে আর কত আপ্যায়িত করতে পারে এ যুগে? ছেলেটিও বিমর্ষ হ'য়ে পড়ছে লক্ষ্য করলাম, যেন দাদা চুঁচড়ো থেকে ফিরলে সে বাঁচে, তার দায়িত্ব কমে। বল্লাম, তা আর কি হয়েছে? জীবনটাই এই রকম, এ্যাক্সিডেন্টস্ উইল হ্যাপেন ইন্ বেষ্ট রেগুলেটেড ফ্যামিলিস্।

কি বল্লেন? ভারি সত্যি কথা। কে জানত দিদির আমার এই রকম হবে! এই ঘরে বসে আছি, ভাবছি দিদি এল পার্টি থেকে, না তার বদলে·····যাকৃগে, কাল শুনবেন সব কথা, আজ ক্লান্ত আছেন।

কি জানি কেন প্রাণটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কার কথা বলছে? বৌদি নয়ত? বাড়ি অত অন্ধকার কেন? যেন মৃত্যুর ছায়ায় আচ্ছন্ন। যার দীপ্তিতে গৃহ সমুজ্জ্বল হত তারই অভাবে নাকি?

আপনি কার কথা বলছেন? আমার বৌদির কথা? তিনি ত বাপের বাড়ি গিয়েছেন।

হা ভগবান, বাপের বাড়িই বটে। পরম পিতার কোলে।'

মাথায় যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল, বুকের তার ছিঁড়ে গেল, পেটে কে

যেন ধাক্কা মারলে, শরীরটা হালকা হয়ে গেল, ছোট্ট হয়ে গেল। সেই বৌদি। ওঃ সেইজন্য বাড়ি অন্ধকার, সহরে আলো নেই।

'কই আমি কিছু জানতাম না'

আপনি শক্ পাবেন বলে খবর দেওয়া হয় নি। দাদা নিজে দিতে চান না, তাই আমাকে এই অপ্রিয় কাজ করতে হল। তিনি আপনার বৌদি, কিন্তু আমার, আমাদের সকলের দিদি ছিলেন, মা ছিলেন।

ছেলেটির চশমা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হল। আমি চুপ করে বসে রইলাম। বেয়ারা খবর দিলে, খাবার তৈরী। এই খানে নিয়ে আয় সামান্য কিছু, ঐ ছোট টেবিলে রাখ্। কিছু খেয়ে নিন, খেতে কি কেউ পারে? তবে দিদি না খাইয়ে কখনও ছাড়েন নি, তাঁর আত্মার তৃপ্তির জন্য কিছু মুখে দিন। তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। আপনি না খেলে আপনাকে না খাওয়ালে। খাবার পূর্বে খবরটা দেওয়া উচিত হয়নি, কিন্তু ভাবলাম আপনি জানেন! তা ছাড়া, কখনই বা দিই বলুন, এই স'দশটা বাজল বলে। তখন হয়ত খুবই ভয় পেতেন, আমি একলা, আপনাকে নিয়ে কি করতাম! পরে যদি আপনার অসুখ বেড়ে যেত। আমি দাদাকে কি করে মুখ দেখাতাম? যা হয়, দু-এক টুকরা রুটি ঐ ডিমের কারিটায় মেখে পিত্তি রক্ষে করুন। দুঃখুকে, সারাজীবন ধরেই করতে হবে আমাদের।

ড্রইংরুমের পর্দাগুলো কাল দেখাচ্ছিল-যেন কফিনের ঢাকা। ছাত থেকে যেন লণ্ঠন ঝুলছিল তার শেডের ছবিটা ভীষণ দেখাচ্ছিল, যেন আমাদের দুঃখে অন্ধকারের প্রতিমা ঘরে আকাশ থেকে নেমে আসছে। হাতে রুটি নিয়ে কতক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম জানিনা। গির্জ্জার ঘণ্টায় দশটা বাজল, কবর দেবার সময় যেমন ঢং ঢং করে ভাঙ্গা গলায় ঘণ্টা বাজে। আমার সঙ্গী বলে উঠল—'এইবার! আর দেরী নেই! কোন ভয় নেই, কিছুই বলেন না। আমাদের সয়ে গিয়েছে, এখন প্রতীক্ষাও করি, প্রথম প্রথম কি হত ভগবানই জানেন!'

ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে। তিনি সব বৃত্তান্ত বলে গেলেন। বৌদি

কৃষ্ণভামিনী স্কুলের মিটিং এ সন্ধ্যাবেলা যান। সোফেয়ারের অসুখ করেছিল, নিজেই হাঁকিয়ে যান। ফেরবার পথে এক বাসের সঙ্গে ধাক্কা খান। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। দেহে কোন ক্ষতের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না, হৃৎপিণ্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। যখন বাড়িতে আনা হল শেঠেদের গাড়িতে, তখন কে বলবে যে প্রাণ আর নেই! মুখে সেই হাসি শুধু চোখ দুটো একটু বেশী জ্বলজ্বলে। দামী সাড়ি পরা ছিল, বিস্রস্ত পর্যন্ত হয়নি। যেন পাটি থেকে নামছেন। আমি চুপ করে শুনে গেলাম—কি আব বলব? তাব মুখটা আমার মানস পটে ভাসছিল শুধু। তাঁর দুষ্টু দুষ্টু হাসি মাখান মুখটি যে একবার দেখেছে সে কি কখনও ভুলতে পারে? যেমন পুরানো বাড়ীর দেওয়ালে কোন একটি দামী ছবি চিরকাল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ক'রে প্রত্যেক মনের আসবাবের সামিল হয়, তেমনি আমার বৌদির মুখখানা তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের মনে চিরদিনেব জন্য আপন হয়ে গিয়েছিল। সে ছবি ভোলবার নয়, যে একবার দেখেছে সে আর কখনও ভুলবে না, ভুলতে পারে না। 'তিনিও আমাদের ভোলেন নি। তিনি আসেন।'

'সে কি?'

'হাঁ আসেন। প্রতি শুক্রবার আসেন, এবং বরাবর ওপরের ঘরে না গিয়ে ড্রইং রুমে এসে আপনার ঐ পাশের চেয়ারেই বসেন' আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। 'শুক্রবার কেন?' 'শুক্রবার মারা যান। আমাদের রাত্রে খেতে বলেছিলেন, তারপর সেদিন ঠিক হয়েছিল দাদাকে নিয়ে একটু প্রাকটিক্যাল জোক করা যাবে। কি প্র্যাকটিক্যাল জোকই তিনি করলেন।'

'তিনি আবার কোথায় করলেন?'

'ভগবান করলেন, সেই একই কথা।'

'তিনি কি করেন এসে?'

'সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! রাত্রি ঠিক দশটা তের মিনিটে, আমরা ঘড়ি পর্যন্ত মিলিয়ে নিই, গলির মোড়ে মোটরের হর্ন শোনা যায়, অল্পক্ষণ পরেই গেটের ফটক খুলে যায়, ড্রাইভারের পাথর নুড়ি ওপর

দিয়ে মোটর আসবার কুড় কুড় শব্দ শোনা যায়। তারপর, তার পরের ব্যাপারটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্য। দিদির-প্রাণের পরিচয় পাবেন, তাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিত পাবেন শুনলে। আমরা বুঝেছি যে তাঁর প্রাণ এখনও আমাদের জন্য কাঁদে। অথচ তিনি চান না আমরা যেন কোন ভয়ের লক্ষণ দেখাই। তাঁর ইচ্ছা আমরা যেন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে গ্রহণ করি। তাঁকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করার অর্থই হল দুর্ঘটনাকে সহজভাবে গ্রহণ করা, মৃত্যুকে অনাবশ্যক আড়ম্বরের সঙ্গে না ধরা। এই আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান নেই, ইংরেজ কবি যা বলেছেন মৃত্যুটা নিদ্রা মাত্র, জার্মান কবি গ্যেটে যা বলেছেন—দি এণ্ড অফ লাইফ ইজ লাইফ। অতএব আপনি ভয় পাবেন না। পুণ্ড্রবাবুর কথা সারগর্ভ হলেও আমার স্নায়ু এত শক্ত নয় যে আমি তৎক্ষণাৎ ভয়কে জয় করব। আমি সত্যই ভয়ে কাঁপছিলাম স্বীকার করতে লজ্জিত হচ্ছি না। জীবজন্তুর প্রতি তাঁর ব্যবহার জানতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলাম। শুনলাম যা তা অভূতপূর্ব্ব। গেট খোলার শব্দ হলেই তাঁর এক পোষা কাবলী বেড়াল 'মিউ, মিউ' দুবার মাত্র আস্তে আস্তে ডেকে সিঁড়ি দিয়ে সরাসরি নামে, তারপর বারাণ্ডা দিয়ে এগোয়, মোটরের পা-দানিতে ওঠে, তিনি কোলে তুলে দেন। আলোগুলো তেজ পেয়ে জ্বলে ওঠে। তিনি হ্যাট-র‍্যাকে প্যারাসল রেখে বেড়াল কোলে করে প্রবেশ করেন, মুখে তাঁর হাসি লেগেই থাকে। 'ঐ হর্নের আওয়াজ হল।'

তারপর কি হল সব লেখা যায় না। যতটুকু যায় তার দ্বারা ছোক্‌রার সত্যবাদিতার প্রমাণই হয়। গেট খুলল, কুড় কুড় শব্দ করে গাড়ী বারাণ্ডার নীচে থামল। মিউ মিউ শব্দ শুনলাম, এঞ্জিনের শব্দ বুকের মধ্যে হচ্ছিল হঠাৎ এঞ্জিন থেমে গেল, আমার হৃদ্‌পিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। আমি চীৎকার করতে পারলাম না, পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতন' চেয়ারে বসেই রইলাম। চোখের ওপর যে ছবি ভেসে উঠল তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। বেগুনে পর্দার ফাঁক থেকে দেখলাম—বাইরের সব বৈদ্যুতিক আলো যেন চতুর্গুণ তেজে জ্বলে উঠছে, সেই

হাস্যমুখী বৌদি আমার, তাঁর আদরের বেড়াল কোলে করে এগিয়ে আসছেন। খুট ক'রে ছাতা রাখার শব্দ হল—তারপর পর্দা সরে গেল, ড্রইং রুমের আলো হঠাৎ জ্বলে উঠল, এ যে আমার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছেন। একটা অস্ফুট ধ্বনি আমার মুখ থেকে বেরিয়েছিল। তারপর বৌদির ঠোঁট নড়ে উঠল, তাঁর হাসি অদৃশ্য হল, মুখে ফুটে উঠল চিহ্ন শঙ্কার। খুব দূর থেকে একটা নাকিসুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম—

'এই যে ঠাকুরপো কখন এলে? মিটিং আর শেষ হয় না! দেরী হয়ে গেল ক্ষমা কোরো। খাওয়া দাওয়া হয়েছে ত? এ কি! তুমি যে একদম ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছ। তোমার হয়েছে কি? পুঁটু, বাড়াবাড়ি করেছে বুঝি? মাত্রা রাখতে পার নি? রোগী বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়।'

ছোক্‌রাটি ধীরে ধীরে বলে, 'আমি কি করব! এবারে যে কমপ্লিট নার্ভাস ব্রেক ডাউন, বেড়াল দেখলে পর্যন্ত ভয় পান!'

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(অক্টোবর ১৮৯৪—৫ ডিসেম্বর, ১৯৬১) ভারতীয় মনীষীদের অন্যতম বিদগ্ধ পুরুষ ধূর্জটিপ্রসাদের সুগভীর জ্ঞানচর্চা, বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যে ও মৌলিক চিন্তাভঙ্গী তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেও। সারা-জীবন তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে গেছেন। প্রথমে লক্ষ্ণৌ, পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্বচর্চায় ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন অনন্য ও অগ্রগণ্য। একাধিকবার তিনি বিদেশ ভ্রমণ করেন এবং য়ুরোপেও অধ্যাপনা করে আসেন। যদিও অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং আর্থনীতিক ইতিহাস ছিল তাঁর পঠন-পাঠনের মুখ্য বিষয়, এবং তাই নিয়ে তিনি গ্রন্থ

দশখানি ইংরাজি গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁর জ্ঞানানুশীলনের পরিধি ও ব্যাপ্তি ছিল বিস্ময়কর। সঙ্গীতশাস্ত্রে ছিল তাঁর অসামান্য অধিকার এবং প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ ও সমালোচক হিসাবে তিনি সর্বত্রই সম্মান অর্জন করেন। 'কথা ও সুর' এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্মভাবে রচিত 'সুর ও সঙ্গতি', তাঁর এই দুটি গ্রন্থ সেই কথাই প্রমাণ করে। বাংলা সাহিত্যেও তাঁর দান শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করতে হবে। বিশেষ করে, তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস—'অন্তঃশীলা' 'আবর্ত' ও 'মোহানা' বাংলা কথা সাহিত্যের সাধারণ ধারা থেকে সরে এসে চেতন-প্রবাহের মাধ্যমে নতুন ভাষা 'সৃষ্টি' করে। ধূর্জটিপ্রসাদের এই পরীক্ষাসূচক রচনা বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে একটি নতুন গতিপথ দেখায়। প্রবন্ধ সাহিত্যে 'আমরা ও তাঁহারা,' 'চিন্তয়সি' ও 'বক্তব্য' এবং ডায়েরির ছাঁদে লেখা 'মনে এলো' ও 'ঝিলিমিলি' তাঁর গভীর মননশীলতার উজ্জ্বল পরিচয়। এই সংকলনে তাঁর 'রিয়ালিস্ট' নামে গল্প-সমষ্টি থেকে নেওয়া 'একটি ভূতের গল্প' লেখকের আঙ্গিক ও লিপিকৌশল কি ভাবে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে' কৌতুক-পরিণতিতে এসে সমাধান করে দেয়, তার সার্থক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছে।



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পবগনা তিনভুবনপুরের অন্তর্গত ঘাট ভুবনপুরের পত্তনীদারণী মহামহিম মহিমার্ণবা শ্রীল শ্রীযুক্তা গায়েশ্বরী ঠাক্‌রুনের পাল্লায় পড়ে ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে যে কি নাজেহাল হয়েছিলাম তা আগে বলেছি এর জের আজও চলছে। মেটেনি। ঘাট ভুবনপুরের ঘটনার জের টেনে এসে পড়ল আগয়া নদীর তটভূমিতে সেই বিশাল বটবৃক্ষের ঘটনা। অক্ষয় বট-উপাখ্যানম্। এর জন্যে ভূতভুবনপুরের ব্যাপারে যতখানি নাজেহাল হয়েছিলাম আমি; না, আমি না, নাজেহাল হয়েছিলেন রামকালীবাবু।

অবশ্য রামকালীবাবু আমারই ছদ্মনাম। ভূত সম্পর্কে গবেষণা করবার আগে ওই নামটা আমি গ্রহণ করেছিলাম।

যাগ গে।

না, যাবেই বা কেন? ভাগ্যে নামটা নিয়েছিলাম—না হলে ওই রামনামটা ধরে কি লোকেরা অজ্ঞান অচেতন, আমার কানের কাছে চিৎকার করে ডাকতেন? আর রামনাম না শুনলে কি গয়েশ্বরী ঠাকরুন তাঁর দামিনী ঝি এবং ঘাটভুবনপুরের সেই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধবাসরে সমবেত ভয়ংকর মূর্তি কেঁপে ওঠা এবং ধেই ধেই নৃত্যরত ভূতকুল পিন ফোটানো বেলুনের মত চুপসে যেতো!

এখন জ্ঞান তো ফিরল। মানে মানে কলকাতায় ফিরে এলাম।

এবং ভূতপুরাণটা লিখে ফেললাম। তাতে কিন্তু উলটো ফল হল। আমি আমার থিসিসে প্রমাণ করতে চাইলাম এক কিন্তু লোকে বুঝলে অন্য।

বলতে চাইলাম—ভয়ের মধ্যে ভূতের বাস—

লোকে বুঝলে—ভূত না-মানলে সর্বনাশ।

আমি বলতে চাইলাম—মানুষকে ভূত পারবে না।

লোকে বুঝলে—ভূত কখনও হারবে না। ঘাড়ের দখল ছাড়বে না। যাক—একথা আরও অনেক রকম করেই বলা যায়—কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। তবে ফ্যাসাদে পড়লাম তাতে সন্দেহ নেই; কারণ চিঠিপত্র সহযোগে নানান প্রশ্ন আসতে লাগল। বিশেষ করে রামাই ভূত আর কালীবাবুর বাড়ীর সেই প্রেতটার খোঁজ নিয়ে অনেক প্রশ্ন আসতে লাগল। একটি ছেলে তো আমাকে লিখলে—রামাইয়ের ঠিকানা দেবেন—আমি তাব পেন-ফ্রেণ্ড হতে চাই! এসব থেকেও নিষ্কৃতি আছে কিন্তু এটা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল যে মধ্যে মধ্যে কেউ যেন আশপাশে খসখস ফিসফাস করে ওঠে। কখনও বা ফিসফিসিনির মধ্যে শুনি—বলি—শুনছ!

বুক ঢিবঢির করে ওঠে, চোখ পিটপিট করে, সামনে যেন সরষে ফুল ফোটে—মনে মনে বলি—"জয় রাম শিবরাম। সীতারাম হে! ভূতেদের হাত থেকে কর ত্রাণ হে!"

আশ্চর্য, যে নামে গায়েশ্বরী এবং তাঁর ভূতকুল পিন ফোটানো বেলুনের মত চুপসে গিছলেন প্রায় এক মুহূর্তে, সে নামেও এই ফিসফিসিনি এবং এই খসখসানি বন্ধ হয় না। বুজতে পারি না। ব্যাপারটা কি?

য-ম দত্তকে জিজ্ঞাসা করলাম। দত্তমশায় মালদার আমসীর মত লম্বা শুকনো মুখখানা নিয়ে তিরিক্ষি মেজাজে গোটা মুখের মধ্যে অবশিষ্ট সাড়ে চারখানা দাঁত বের করে বললেন—ও সব গল্প লিখিয়েদের মাথায় আসবে না। মাথায় তো গোবর পোরা আছে। বলি ভূত কতপ্রকার সেটা জানা আছে কি?

বললাম—ভূত প্রেত পিশাচ—

দত্ত বললেন—তোমার মাথা। ভূত প্রথমতঃ দুই প্রকার—মৌলিক ভূত এবং যৌগিক ভূত। সেটা জান?

হাঁ হয়ে গেলাম। দত্ত বললেন—মৌলিক ভূত তারাই যাদের ভূত করেই ব্রহ্মা তৈয়ারী করেছিলেন। তারা পুরুষানুক্রমে ভূত—যেমন ধর মহাদেবের প্রধান ভূত নন্দী মহারাজ—নন্দী মহারাজের বেটা দণ্ডী কি শৃঙ্গী, তস্য বেটা জঙ্গী, তস্য বেটা রঙ্গি—; এ নামগুলো অবশ্য ঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু বেটার বেটা তস্য বেটা তস্য তস্য তস্য বেটা তো আছেই। অর্থাৎ খাঁটী ভূত। মানে কালিকট বন্দরে ভাস্কোডিগামার সঙ্গীসাথী খাঁটী পর্টুগীজের মত খাঁটী ভূত। এদেশের লোককে জোর করে ধর্মান্তরিত করা খৃষ্টানের মত হল যারা, তারা হল মানুষ মরে ভূত। কেউ কিছুর জন্যে মানে অপঘাতে মরার জন্যে ভূত হল—কেউ পিণ্ডি না পেয়ে ভূত হল—কেউ মরার সময় খারাপ লগ্নে মরে ভূত হল। তারা হল দুসরা রকমের ভূত। তারাই রাম নামে চুপসে যায়। অরিজিনাল ভূতেরা হল খোদ শিবের খাস চেলা—তারা এই কালের হিপিদের মত চব্বিশ ঘণ্টাই সিদ্ধি গাঁজা খেয়ে বোম বোম রাম রাম করে নাচছে—তারা রাম নামে ভয় খাবে সেটা বলে কেডা? হুঁঃ—যত সব—!

আমাকে মানতে হল কথাটা। হ্যাঁ কথাটা তো ঠিক। এটা তো আমার বোঝা উচিত ছিল। ভূত দুই প্রকার—ভূতের বেটা ভূত, আর মানুষ মরে ভূত। ভূতের বেটা ভূত হয় তাদের মরণ নাই। মানুষ মরে ভূত হয়, তারাই আবার ভূত মরে মানুষ হয়।

দত্ত বললেন—আরও আছে হে বাপু! মানুষ মরা ভূতগুলো শুধুই ভূত, তার বেশী বিশেষ কিছু না; ওই ধর—বামুন মরে ব্রহ্মদৈত্যি, কায়েত মরে যমরাজার আদালতে কেরানী—গলায় দড়ি দিয়ে মরে 'গলায় দ'ড়ে' আগুনে পুড়ে মরলে চামড়া ওঠা ছালছাড়ানো ও ওলের মত রং যথা ভূত, তারপর ধর—জলে ডুবে মরা মানুষ—মেয়ে হলে শাঁকচুন্নী, পুরুষ হলে 'বিলচর' কি 'খালচর' ভূত। অনেক

আছে। এরাই রাম নামকে ভয় করে। আর আসল ভূতেরা হল শিবের সেপাই—নন্দীর সন্তান—ওরা দেবতাদের মতই—সেই কারণে ওদের আর এক নাম হল 'অপদেবতা'।

বটে ত! ঠিক বলেছে দত্ত! অপদেবতাই তো বটে। শিব পঞ্চমুখে রামনাম গান করেন ডমরু বাজান নন্দী মধ্যে মধ্যে শিঙাতে ফুঁ দেয়। আর অপদেবতা ভূতেরা—ভূত পেত্নীরা, বা অপদেবীরা ধূতরা গুলতে এবং কল্কে ফুলের মালা পরে, পায়ে মরার হাড়ের নূপুর পরে তা থৈ থৈ তা থৈ থৈ—থিয়া থিয়া করে নাচে। তারা রাম নাম শুনে ভয় করবে কেন?

তা হলে? একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে তুমি বলছ যারা খসখস করে নড়েচড়ে বা অদৃশ্য থেকে ফিসফিস করে সাড়া দিচ্ছে তারা মানুষ মরে ভূত নয়।

না—। বলছি যারা রাম নাম শুনেও মরছে না—তারা মানুষ মরা ভূত নয়, খাঁটী তুর্কীর মত খান-খানান, কিংবা খাঁটী হারমাদ কি ইংরেজ কি ফরাসীট্‌বাসীদের লর্ড কাউন্ট কি মিস্টার মশিয়েদের মত খাঁটী ভূতের বেটা ভূত কি অপদেবতা, কি উপদেবতাও হতে পারে।

কথাগুলি যম দত্ত কট্‌-কট্‌ ক'রে কামড়ে-কামড়ে বলার মত বললে। তবে তাতে ফোঁকলা দাঁত বুড়োর কামড়ের মত খুব কষ্ট বা যন্ত্রণাদায়ক মনে হল না। তার উপর বুড়ো আমাকে ভালবাসে। বললে—দেখ না ইশারা-টিশারা দিয়ে—যদি কিছু নতুন তত্ত্ব কি তথ্য মেলে তা হলে আমেরিকা রাশিয়াকেও হারিয়ে দিতে পারবে। ওরা চাঁদে ল্যাণ্ড করে যা জানবে—তা থেকে অনেক বেশী জানা যাবে। মানে মানুষ মরে যেখানে যায় সেখানকার খবর পেয়ে যাবে।

কথাটা বুড়ো মন্দ বলেননি; মনে লাগল। রাশিয়া আমেরিকা চাঁদে নেমে ফিরে আসবে। আমি ঘাটভুবনপুরে বৈতরণীর ঘাটের এলাকা পর্যন্ত গিয়ে তো ফিরে এসেছি। আমারই বেকুবি আমি কিছু নিদর্শন আনতে পারিনি। একটা আধটা ভূতের নখ কি পেত্নীর চুল কি মূলোর মত দাঁতের একটা দাঁত কিংবা খেয়া ঘাটের মাটি,

এসবের কিছুই আনতে পারিনি। পারলে তো বাজিমাত হয়ে যেতো তা যখন আনা হয়নি তখন তো প্রমাণ করতে কিছু পারছিনা। তবে দেখছি গ্রহগ্রহান্তরে—রেডিও সিগনালের মত ওদের কাছ থেকে ইশারার যেন সিগন্যাল পাচ্ছি। সেই ইশারায় সাড়া দিয়ে দেখাই যাক না। যম দত্ত উপদেশ দিলে—প্রথমেই কিন্তু 'রামনাম সত্য হ্যায়'; বুঝেছ! তাহলে আর ট্যাস ফিরিঙ্গী কি কালো দেশী তুর্কীর মত মানুষ মরা ভূত আসবে না। মানুষ মরা ভূত হলে চামচিকে হয়ে ফুড়ুত হয়ে যাবে; আর খানদানী মৌলিক ভূত হলে বলবে—নাচবো নাকি? যেমন নাচি শিবের সঙ্গে?

ফলটা হাতে-হাতেই ফলল।

আশেপাশে যখন তখন ফিসফিসিনি খসখসানি কমে গেল। তবে মধ্যে মধ্যে দুচারখানা দীর্ঘনিশ্বাস কি মিহি নাকি সুরে করুণ খুনখুনুনি আওয়াজ পেতে লাগলাম। যার অর্থ হল—হায়রে হায় বা তুমি মানুষটা বড় খট্রোগা! বেরসিক লোক।

ওতে আমি কিন্তু এতটুকু সংকোচবোধ করলাম না।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'রামনাম সত্য হ্যায়'! মানুষ মরা ভূতের পরওয়া হম নেহি করতা হ্যায়। আওয়াজ ছাড়লেই সব একেবারে নিস্তব্ধ। বুঝতে পারি—শূন্যলোক অদৃশ্য চামচিকে বা ফড়িংয়ের মত ভূতের দল উধাও হয়ে গেল।

• * • *

হঠাৎ সেদিন। এই তো ১৩৭৬ সালের ৪ঠা বৈশাখ।

ওই যে ঝড়ের দিন। পেল্লায় ঝড় হয়ে গেল। গোটা বাংলা দেশই প্রায় তছনছ হল সেদিন। বেলা তিনটে থেকে ঝড়ের শুরু হল—দমকায় দমকায় তিনবারে প্রায় ঘণ্টা চারেক ঝড় আর জল। পশ্চিম আকাশ অন্ধকার করে সে ভীষণ কালো পালবন্দী বুনো মহিষের দলের মত মেঘ যেন তেড়েফুড়ে খুরের দাপটে, শিঙের খোঁচায় গাছপালা টেলিগ্রাফের পোস্ট উপড়ে দিয়ে (বোধ করি সমূলে উৎপাটিত করে বলাই ভাল) ঘরের চাল উড়িয়ে দিয়ে উলটে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে

চলে গেল। আমি তার আগের দিন রাত্রি থেকে ট্রেনে আসছিলাম। ওরা রাত্রে পাটনা থেকে রওনা হয়ে দেড়টা দুপুরে নেমেছিলাম আমাদের বাড়ির ইস্টিশান--আমদপুরে ; সেখান থেকে একটা মোটরে লাভপুর গিয়ে মাকে প্রণাম করে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলাম—তখন বেলা দুটো। গাড়িতে চড়ে মনে হল পশ্চিম আকাশের একেবারে দিগন্তে—প্রথম বুনো মোষের পালটা যেন বন থেকে মুখ বের করে তৈরী হচ্ছে ; ওদের দলপতি একটা হাঁক দিয়ে ছুটতে শুরু করলেই দড়বড়—দড়বড়-গাঁ-গাঁ শব্দ তুলে গোটা পালটাই দৌড়ুতে আরম্ভ করবে। ভয় হল কিছুটা, কিন্তু হলে কি হবে আমারও একটা কেমন গোঁ আছে, সেই গোঁয়ের বশে মেঘ গ্রাহ্য না করেই বললাম—চলো। ছেড়ে দাও গাড়ি।

মোটরে সাত মাইল পথ ? পথ এখন নতুন কালের পিচঢালা পথ। কতক্ষণ লাগবে ? বড় জোর বিশ মিনিট। ইতিমধ্যে মনে হল মোষের দলটা যেন দিগন্তের ওপাশে মুখ সরিয়ে নিয়ে—বোধহয় মতলব বদলালে। দৌড়টা আজ মুলতুবি রাখলে। শুধু তাদের নিশ্বাসে ওড়া খানিকটা লাল ধুলো উড়ল—কিছুক্ষণ বৃষ্টি হল ; আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কিন্তু হরি হরি। হরির মতলব বোঝা ভার। তিনি মারতেও আছেন রাখতেও আছেন। সবেতেই বোধ করি সমান খুসী। আমদপুর স্টেশনে এসে পৌঁছুলাম যখন তখন পশ্চিমাকাশে কালো স্লেটের মত রঙের পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ দক্ষিণে বোলপুর, উত্তরে সাঁইথিয়া পর্যন্ত আকাশ জুড়ে সোজা পুবমুখে এগিয়ে চলেছে। উপমা ওই পালবন্দী বুনো মোষ বা বাইসনের সঙ্গে। শিং নীচু করে লেজ পিঠে ফেলে পরস্পরের গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি লেগে গর্জন করতে করতে ছুটেছে।

এরই মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো ; একটা তীব্র আলো ঝলসানির সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জালে। যেন মোষেরা শিঙে শিঙে ঢু মারলে—তাতেই উঠল আগুন এবং আওয়াজ। তার সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যে এলো বৃষ্টি। সামনেই প্লাটফর্মের ওপাশে পয়েন্টসম্যান প্রভৃতিদের

কোয়ার্টারের ওধারে অনেককালের একটা বাগান। বাগানটার গাছগুলোও অনেকদিনের। যেন মাথায় বাঁশের বাড়ি খেয়ে বড় গাছগুলো একেবারে বাপ বলে শুয়ে পড়ল। স্টেশনের ওয়েটিং রুমের খোলা জানালা একখানা উড়ে চলে গেল। কোথা থেকে ঝড়ে উড়ে এসে প্ল্যাটফর্মের উপর সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়ল একখানা আস্ত টিন বা করোগেটেড শীট। স্টেশন ওয়েটিং রুমে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল, পাখা চলছিল। ফুস করে আলো নিভে গেল, পাখা চলার শব্দ থামল এবং ঘোরার বেগ মন্থর হল—বোঝা গেল ইলেকট্রিক গেছে। ওয়েটিং রুমটার মধ্যে একঘর লোক ঠাসাঠাসি হয়ে বসে রইলাম। বাইরে খোলা প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা, সেখানে মোটাসোটা ফোঁটায় ঘন ধারায় বর্ষণ চলছে। দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্মের রাঙা কাঁকর ফেলা জায়গায় জল জমে জল বইতে লাগল। আমরা বোবা হয়ে বসে রইলাম। এর মধ্যে সৌভাগ্য বা সুরাহা হল এই যে ঝড এবং বৃষ্টির ফলে গুমোট গবমের অসহনীয়তা আর রইল না। একঘব লোক, তা প্রায় জনতিরিশেক—সবাই বোবা হয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে প্ল্যাটফর্মের ওপর জমা জলের উপর বৃষ্টি ধারাপাতের একঘেয়ে দৃশ্য দেখছে এবং শব্দ শুনছে। জলঝড় যখন হয় তখন মানুষকে অভিভূত করা একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। মানুষ অবাক হয়ে দেখে বিমূঢ় হয়ে শোনে। দেখে বৃষ্টি পড়া আর শোনে ঝড়ের গোঙানি।

এরই মধ্যে ঝড়টা কিছু কমল। আকাশ ফরসাও কিছুটা হল। ঝড় অবশ্য বইছিল। আকাশের কালো মেঘ সেই ঝড়ের বেগে পূবদিকে চলে গেল। ওদিকে আপ দার্জিলিং মেলের ঘণ্টা পড়ল। স্টেশনে খবর নিলাম কলকাতার ট্রেনের কত দেরি? খবর পেলাম না। মাস্টার বললেন—টেলিফোনে সাড়া পাচ্ছিনা; বোধ হয় টেলিফোন লাইনে গোলমাল হয়ে থাকবে। দাঁড়ান একটু, মেলটা পার হয়ে যাক।

মনে অস্বস্তিবোধ করছিলাম।

ঘরে বসতে গিয়ে বসলাম না। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আপ লাইনের

সিগনালের দিকে চেয়ে রইলাম। এরই মধ্যে একসময় মনে হল আবার অন্ধকার ঘনালো। উপরে আকাশের দিকে তাকালাম, দেখলাম—আকাশে যেন কালো ছায়া পড়েছে। মেঘের ছায়া। পশ্চিমে আবার ঘন কালো মেঘ উঠেছে। তার চেহারা এমন ভয়াল এবং ভীম যে মনে হল এবার স্বয়ং মহিষাসুর বোধ করি গদা হাতে তার বাছাবাছা সৈন্য সেনাপতির ঠাসা দল নিয়ে বেরিয়েছে।

এরই মধ্যে এল দার্জিলিং মেল। এল ছেড়ে গেল। মেলখানা ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল পার হল—আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম! এক সময় কে যেন বললে—ঘরের ভিতর যান।

কে বললে? কাউকে দেখলাম না। তবে ঝড় এবং জল আবার দ্বিগুণ বেগে নিশ্চিত আসছে বুঝে ওয়েটিং রুমে এসে ঢুকলাম। ঘরে তখন অন্ধকার বেশ ঘন হয়েছে। গুমোটও বেশ ঘন হয়েছে দেখলাম। আর একজন এসে ঘরে ঢুকে বললে—কলকাতার ট্রেনের খবর মিলল না। টেলিফোন টেলিগ্রাফ গন।

—গন মানে?

—গো, ওয়েণ্ট, গন। তার ছিঁড়ে গিয়েছে। পোস্ট ধরাশায়ী হয়েছে। অথবা যন্ত্র কোন প্রকারে অচল হয়েছে।

—তা হলে?

—কে বললে—ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার। চুপচাপ বসে থাকুন অভিসারের প্রতীক্ষায়—

আকস্মিক প্রচণ্ড গর্জনে সব থর থর করে কেঁপে উঠল। চোখ আগেই ধেঁধে গেছে। রসিকতা করার সব শক্তি মন যেন মাথায় লাঠি খেয়ে অচেতন হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল।

ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি হতে শুরু হল—তার সঙ্গে সে এক মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত দীর্ঘকায় জটাধারী পাগলের মাথা নেড়ে নেড়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে গেল।

ঘরের ভিতরটা তখন থমথমে অন্ধকারে ভরে গেছে। মধ্যে মধ্যে দু-একজন এক আধ বারের জন্ত হাতের টর্চ জ্বেলেই আবার নিভিয়ে

দিচ্ছেন। কথাবার্তা নেই। কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কথা কইবেই বা কি করে। শুধু খেয়ালী মানুষের পাথর বা কাঁকড় ছুড়ে ঘুমন্ত কুকুরটাকে সজাগ করবার মত কথা ছুড়ছেন। কেউ ডাকছেন—বাচ্চু!···বাচ্চু কোথায় রে? উত্তর আসে না। তার বদলে ওদিক থেকে কেউ আপসোসের সুরে বলেন—

—ওঃ গাছের পাকা বেলগুলোর আর একটা গাছে থাকবে না সব পড়ে যাবে। রমন্দ বললে পেড়ে নাও। তাও নিলাম না। আঃ আর একটা পাব না। খাসা বেল! মড়ার মাথার মত! আঁ। কজন হাসলে। আবার কেউ বললে, মনটা চাঁহা চাঁহা করছে রে। কিন্তু—যাই বা কি করে ষ্টলে। এনেই বা দেবে কে? কে বললে খিদে পেয়েছে। আমি এরই মধ্যে শুনছিলাম—কেউ যেন খুনখুন শব্দে কাঁদছে। চাপা কান্না। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস। মধ্যে মধ্যে দমকা ঝড় এসে ঢুকছিল। হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকে বললে—বাস্! সব খতম রে বাবা! হয়ে গেল!

একসঙ্গে কয়েকজনই প্রশ্ন করে উঠল—মানে?

—সারা রাত এখন থাকুন বসে।

—কেন? কেন বসে থাকব?

—ট্রেন আসবে না।—

—আসবে না?

—না। ঝড়ে গাছ উলটে লাইনের ওপর পড়েছে। সাঁইতের আগে। দার্জিলিং মেল বাতাসপুরে খোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোপাইয়ের কাছে গাছ পড়েছে,সেখানে আটকেছে দানাপুর প্যাসেঞ্জার। তার পিছনে বোলপুর দাঁড়িয়ে গেছে রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার। সারা জেলার ইলেকট্রিক বুত গিয়া। বাস—তখনও প্রবল বেগে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। এবং ঝড় চলছে। এরই মধ্যে মনে হল পিছনের দিকে বাথরুমের দরজাটি খুলে গেল এবং কেউ যেন খুন-খুন-খুন-খুন করে করুণ সুরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

"বুঁনি। বুঁনি! শেঁষে গাঁছ চাঁপা পড়ে অপঘাতে মরলি বুঁনি।

ওরে আমার বুনিরে! কতবার বলেছি—বনে থাকিস নে—বনে থাকিস নে। হাঁয় হাঁয় ঝঁড়ের সময় তো চলে এলে পারতিস।

অস্পষ্ট ফিসফিসানি নাকি সুরে কথা ক'টি ঘরের বাইরে প্ল্যাটফর্মের ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমি চমকে উঠলাম। "বুনি"?। "কতবার বলেছি বনে থাকিস নে!?" কথা যে বললে সে বাথরুমের কোণ থেকে বেরিয়ে এল। তা হলে ও কি—কুনি? রাম রাম রাম! কিন্তু তবুও কুনির যেন খসখসানি ফিসফিসানি পাচ্ছিলাম।

মনে পড়ে গেল মা বলে ছিলেন "কুনি বুনি" দুই বোন ভূতনীর কথা। 'কুনি' থাকে ঘরের কোণে—'বুনি' থাকে বনে। একদিন এক বামুন গেছিল বনের মধ্যে। কি যেন জড়ি বুটি খুঁজতে গিছল। সেখানে বামুন মাটি খুঁড়তে খুড়তে শুনতে পেলে কেউ যেন বলছে—'কুনিকে বলো গিয়ে বুনির ছেলে হয়েছে।' বামুন প্রথমটা কেয়ার করে নি, পরে বারবার এই কথাগুলো শুনে কেয়ার না করে পারলে না। শুনলে কিন্তু বুঝতে কিছু পারলে না। যাই হোক বাড়ি ফিরে এসে হাত পা ধুয়ে ধর একটু চা খেতে খেতে বললে—'বামনী আজ বনে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে।'

বামনী বললে—আশ্চর্য কাণ্ড? কি রকম আশ্চর্য কাণ্ড? তারপর বললে—তোমার তো সবই আশ্চর্য কাণ্ড। যতঃ সব—হুঁঃ!

বামুন বললে—শোন তবে। বলে বলল—বনের মধ্যে বুঝলি কিনা—আমি মাটি খুঁড়ছি আর কে যেন কোথা থেকে বললে—কুনিকে বলো গিয়ে বুনির ছেলে হয়েছে।

আমি প্রথমটা কেয়ার করি নি। কিন্তু সে নাগাড় বলে চলল—মেয়েছেলের গলা—তাও একটু একটু খোনা খোনা, ওই এক নাগাড় বলে গেল—কুঁনিকে বঁলো গিঁয়ে বুঁনির ছেঁলে হঁয়েছে। কুঁনিকে বঁলো গিঁয়ে বুঁনির ছেঁলে হঁয়েছে ও-বাঁমুন কুঁনিকে বঁলো গিঁয়ে বুঁনির ছেঁলে হঁয়েছে।

আমার শেষটা কেমন গা ছমছম করে উঠল; আমি ছুটে পালিয়ে এলাম।

বামনী বলে—খুব বীরপুরুষ আমার। ভাল করে দেখলেনা একবার খুঁজে পেতে? কোন বদমাশ মেয়েছেলে তোমার সঙ্গে মস্করা করেছে। ভয় দেখিযেছে। খুব ছুটেছ তো?

বলতে বলতে কথা বলা আব শেষ হল না। বামনীর মুখের কথা মুখে থাকল চোখ ছানাবডা হয়ে গেল – বামুন আতঙ্কে আঁ আঁ করে উঠল। কাবণ ঘবেব মধ্যে থেকে—অর্থাৎ ঘরের কোণ থেকে এই এক কালো ধিঙ্গী মেয়ে এই ঝাঁকডা ঝাকডা চুল, এই ভাঁটার মত চোখ, পেঁচার মত নাক, মূলোর মত দাঁত, কুলোব মত কান ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বেবিয়ে এল। আব মুখে সে বেশ সুর করেই বলছিল—কঁই দিবঁসে? কঁয় দিবঁসে? কঁদিঁন হঁলো কঁদিঁন হঁলো। বলতে বলতে এবং নাচতে নাচতে সে বেবিয়ে চলে গেল বনেব দিকে।

এবা কি সেই কুনি এবং সেই বুনি?

মনে তো তাই হচ্ছে। বললে—ঝডেব সময় তো পালিয়ে এলে পাবতিস। সেই বুনি এবং সেই কুনি না হলেও তাদেরই সন্তান-সন্ততি কেউ হবে। এবা তো মানুষ মবা ভূত নয় এরা আদিকালের মৌলিক ভূত—কোণেব অন্ধকাবে ভূত কুনি—বনের অন্ধকারের ভূত বুনি। এবা মৌলিক ভূত—এদেব বংশানুক্রমে কাছে এরা বিয়ে করে এদের ছেলেপিলে হয়। এরা বামনামে পয়েশ্বরী বা মানুষ মরা ভূতদেব মত পিন ফোটানো বেলুনের মত চুপসে মরা চামচিকের মত হয়ে যায় না।

আমি তখনও শুনছিলাম—কুনি কাঁদতে কাঁদতে ঝড়ের মধ্যে চলেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। না ফেলে পারলাম না।

ঝড় থামল কিন্তু সমস্ত অঞ্চলটা অন্ধকাব। ইলেকট্রিক লাইন হয়েছে। বড় বড় গ্রামে ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক জ্বলে। স্টেশনে ইলেকট্রিক জ্বলে। সব অন্ধকার। কেবল টর্চ মধ্যে মধ্যে জ্বলছে এবং নিভছে। তাতে যেন অন্ধকার আরও ঘন হচ্ছে। এরই মধ্যে মানুষ আটকে আছে স্টেশনে। রেললাইনে গাছ উলটে পড়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ। বাস নেই। রাস্তার উপর গাছ পড়েছে। দোকানে

খাবার নেই। অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে মধ্যে টর্চের ইশারা আর হাঁক।—

ও—হে—!

ও—।

এরই মধ্যে একটা আশ্রয় পেয়েছিলাম। ছোট লাইনের মাস্টার একটি ঘরে একটি বিছানা পাতা খাটে আশ্রয় দিয়ে বলেছিলেন—কি করবেন। উপায় তো নেই—এইখানে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিন।

সামান্য খাদ্যও মিলেছিল ক্লান্ত হয়েই ছিলাম—শুয়ে পড়ে ঘুমিয়েই গিয়েছিলাম। আলো ছিল না পাখা ছিল না। না থাক, মেঘ কেটে চাঁদ উঠেছে—ঝড় থেমেছে—একটু একটু শীত-ধরা-ধরা হাওয়া দিচ্ছে; রাত্রি গভীর বলে মনে হল। ঘরে একটা হ্যারিকেনে জেলে দিয়েছিলেন মাস্টার, সেটা নিভে গিয়েছে। একটা খোলা জানালা দিয়ে দুধের মত সাদা জোৎস্না এসে মেঝের উপর স্থির হয়ে পড়ে আছে। শান্ত পৃথিবী। এই ঘণ্টা কয় আগে যে এত বড় প্রলয়ের মত ঝড় হয়ে গেছে সে কথা কে বলবে। আমদপুর স্টেশনের সাইডিং লাইনে কোন একটা এঞ্জিনের স্টিমের একটানা সোঁ সোঁ শব্দ বেজে চলেছিল। তার সঙ্গে আরও কিছু। অর্থাৎ আরও শব্দ ছিল। এঞ্জিনের হুইসিল দিয়ে স্টিম বের হচ্ছে বোধ হয় যার জন্য একটা টানা কোঁ বা পোঁ শব্দ মিলে রয়েছে। এবং আরও শব্দ রয়েছে।

হ্যাঁ। তার সঙ্গে আরও কিছু আছে। কানটাকে যথাসাধ্য খাড়া করলাম—অর্থাৎ সজাগ বা সতর্ক। বুঝতে পারছি না। একটা পেঁচা ডেকে গেল। দুটো কুকুরে যেন কাঁদছে। অনেক দূরে যেন অনেক লোকের সাড়া।

হ্যাঁ। অনেক লোকের সাড়া। এই অনেক কিছুটা যেন অনেক লোকের সাড়া। যেন অনেক দূরে অনেক লোকে একসঙ্গে হয় তো বা জটলা করছে নয়তো গানটান করছে। যেমন ধর্মরাজ পুজোয় কি গাজনে ভক্তেরা মিলে বোলান গান করে। মনে পড়ল ছেলেবেলার মনসার ভাসান গান শুনতাম তাতে বেহুলা কন্যার মান্দাসে লখিন্দরের

দেহ নিয়ে নদীতে ভেসে যেতো, তাই বর্ণন করে পাঁচ ছজন গায়কে গান গাইতো—

"জলে ভেসে যায় রে—সো নার কমলা—।"

আব দলসুদ্ধ সুরে ধুয়ো গেয়ে উঠত—"অ-–গ—অ।"

কলাব মাঞ্জাসখানি নদীসে উচ্ছল।

মাঞ্জাস উলটি দিতে হাসে খলখলা—

—অ—গ—অ। জলে ভেসে যায় বে—এঃ।

এতে একটা হাঁক দিয়ে খপ করে থেমে যেতো।

পাশেব বিছানায ভাই-পো বাপ্পু ঘুমুচ্ছে। ঘোর ঘুমুচ্ছে। নাক ডাকাচ্ছে। জলঝড এবং সবনাশেব মাতন থেমে গিয়ে এখন জমিয়ে ঘুম দেবাব (বাস্তুবা বলে—'পিটোবার') বাত অর্থাৎ আবহাওয়া হয়েছে। আমিও চোখ বুজতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। জানালা দিয়ে ওই অনেক দূরের বোলান গানেব মত বহু লোকের সমবেত কণ্ঠের একটা কিছু আমাকেই ডাকছে বলে মনে হল। ওরা ডাকুক বা না-ডাকুক আমাব মনে হল আমাকেই ডাকছে বা এ-ডাক কিসেব সেটা জানা উচিত। অবশ্য অবশ্য উচিত।

আস্তে আস্তে উঠে জানালাব ধাবে এসে দাঁড়ালাম। জানালার বাইরে পৃথিবীকে আশ্চর্য সুন্দর বলে মনে হল। ধবধবে জ্যোৎস্নায় ভিজে ভিজে বৈশাখ মাসের ফলন-হীন মাঠটিকে আশ্চর্য সুন্দর নরম মনে হচ্ছে—ঠিক যেন সদ্য স্নান করা, থান ঝাপড পরা, পূজাবাড়িব গিন্নীবান্নীর মত লাগছে। মাথার উপবে আবহমণ্ডলের বায়ুস্তব, তার উপবে আকাশ একেবাবে ধোয়া মোছা হয়ে তকতক করছে। নীল নির্মল আকাশে আধখানা চাঁদ ঝলমল করছে।

দেখা যাচ্ছে একেবারে সেই দূরদিগন্ত পর্যন্ত। দক্ষিণ দিকে পশ্চিম দিকে আমদপুরেব বসতি; আজকাল অনেক বড় বড় হাল ফ্যাসানের পাকা বাড়ি তৈরী হয়েছে। সেগুলো জ্যোৎস্নার মধ্যে নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওই দিক থেকেই আসছে সাইডিং লাইনে এঞ্জিনটার স্টীম এবং চাপা হুইসিলের শব্দ। কিন্তু ওই অনেক মানুষের সাড়ার মত

শব্দটা তো এদিক থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে না। উত্তর এবং পূর্ব দিক একেবারে খোলা মাঠ। উত্তর দিকটায় অনেক দূরে গ্রাম। পূবে খানিকটা খোলা প্রান্তরের পর 'আগয়া' নদীর ধারে জঙ্গল এবং রেলের ব্রিজ। ওদিকে তো জনমানবের সঙ্গে এই রাতে একসঙ্গে এত মানুষের সাড়া আসার কথা নয়।

এককালে ডাকাতেরা জমায়েত হত আগয়ার ধারের জঙ্গলে। তারও আগে লোকে বলে আগয়ার বটতলায় নাকি ধর্মরাজের সভা বসত।

বটগাছটার নাকি পাঁচশো বছর বয়স। কেউ কেউ বলে তারও বেশী। আবার অনেকে বলে—না না—শ খানেক—মানে একশো বছরের হবে!

তা—যত শো বছরেরই হোক। বটগাছটা বিরাট। মূল কাণ্ডটা তো আর নাই-ই। কোন কালে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে—এখন গাছটার কাণ্ড যেটা সেটা নামাল। ছেলেবেলায় দেখেছি দিনে দুপুরবেলাতেও অন্ধকার থমথম করত গাছতলায়। এবং লোকে বলত—গাছতলায় বড় বড় সাপ আছে, পোকামাকড়ের তো অন্ত নেই। সাপটা গাছের ডালপালা ধরে ঝুলত—শ দুশো বাদুড়। সন্ধ্যে হলেই তারা আকাশে উড়ত। আর গাছের ডালে ডালে নৃত্য শুরু হত তাঁদের। মানে ভূতদের। আমি জানি না এঁরা কোন ভূত? অর্থাৎ ভেজালহীন আসল মানে খাঁটি জাত ভূত? না—মানুষ মরা ভূত? কেউ কেউ বলত ওই বাদুড়গুলোই ভূত। ভূতটুত নাচে না রাত্রে বাদুড়গুলো ওড়ে চেঁচায় আর খেয়োখেয়োই করে।

আবার এই গাছটাই ছিল অরণ্য ষষ্ঠির ষষ্ঠিবুড়ীর আস্তানা! জ্যষ্ঠি মাসে দুচারখানা গ্রামের মেয়েরা গয়না কাপড় পরে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ষষ্ঠি বুড়ীর পুজো দিয়ে যেতো গাছটার গুঁড়িতে হলুদ সিঁদুর লেপে দিয়ে তালশাঁস আম কাকুড় খেজুর জাম ছোলা ভিজে ও মিষ্টির ভোগ দিয়ে গাছকে গামছা পরিয়ে বাড়ি ফিরে যেত। গাছটা এখন মর মর হয়ে এসেছে। সেখান বা ওদিক থেকে এ আওয়াজ কি করে আসবে।

হঠাৎ জানালাটার বাইরে মাঠের উপর যেন অকস্মাৎ একটি লোককে দেখা গেল। একটি মেয়ে লোক। বেশ একটি মিষ্টি চেহারার মা, চোখে কাজল গৌরবর্ণ রঙের উপরেও হলুদ হলুদ আভা—হাতে শাঁখা—বেশ ঝলমলে করে কাপড়-পরা চমৎকার মেয়ে। তার পিছতে মুহূর্তে যেন আর একজন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটির ন্যাড়ামাথা গলায় গুলঞ্চ ফুলের মালা—পরনে থান কাপড়, চেহারাটা ভাল নয় কিন্তু খারাপ লোক বলে মনে হল না।

আমাকে ইশারা করে ডাকলে। হাত নেড়ে নেড়ে ইশারা। আমি তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম—হঠাৎ যেন অনেকটা অভিভূত হয়ে গেলাম। ভাল করছি কি মন্দ করছি—এবিচারের কথা যেন ভুলে গেলাম। এবং একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে—ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম সেই অনেক লোকের কলরব—যেন মুহূর্তে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে এই কলরব—এ গাইয়ে হোক আর মবপাঠই হোক আর কোন বিচিত্র আলোচনা বাসরই হোক—এটা ওই পুবদিক থেকেই আসছে। অর্থাৎ আগয়ার জঙ্গলের দিক থেকে।

সেই দিকে তাকালাম। ওদিকে মেয়েটি এবং লোকটি এগিয়ে এসে বললে—নমস্কার।

আমিও প্রতিনমস্কার করলাম।

লোকটি বললে—আসুন।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বললে—আমাদের সঙ্গে। বলে তারা চলতে লাগল। আশ্চর্য আমিও চলতে লাগলাম। চলছিই চলছিই। হঠাৎ মেয়েটি বললে—কোন ভয় নেই আপনার।

লোকটি বললে—খুবই দুঃখিত আমরা—এই এত রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিলাম।

মেয়েটি বললে—কি করব বলুন! দুর্ঘটনার উপর তো হাত নেই।

লোকটি বললে—আপনি খুব ভাগ্যবান! বুঝেছেন! তা নইলে—

মেয়েটি ধমক দিয়ে বলল—চুপ কর। কোন বুদ্ধি নেই তোমার

লোকটি বললে—কেন ?

—কেন ? ভয় পেয়ে যান যদি ?

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ভয় পাব কেন ?

—ভয় তো পায লোকে ! অনেক কারণে পায় ।

এবার আমার চমক ভাঙল । মনে পড়ে গেল গয়েশ্বরী দেবীর এজেন্টের কথা । সেই নায়েব গোমস্তা জাতীয় জীবটি যে হ্যা হ্যা করে হাসত । এঁরা আবার তাদেরই কেউ না কি ? আমার উপর এঁদের নেকনজরের কথা তো জানি । বলেছি ভূত ঝুট হ্যায় । ভয়ের মধ্যে ভূতের বাসা ভাই—নইলে ভূতের কোন প্যাওা নাই ! তা, এরা দুজনেও তাই নাকি ?

মনে পড়ে গেল দশরথ বাজাব বড় ছেলেব নাম । মনে মনে বললাম —রামরামবাম জয় রাম জয় রাম । ভূত আমার পুত—পেত্নী আমাব ঝি—রাম লক্ষ্মণ বুকে আমার করবে ওরা কি ?

আমি মনে মনে বললাম, ওবা কিন্তু দুজনেই খিলখিল করে হেসে উঠল । মেয়েটি হাসলে খিলখিল শব্দে, লোকটাব হাসি খ্যা-খ্যা বা খ্যাক্ খ্যাক্ করে । আমি চমকালাম এবং প্রায় নিশ্চিত করে বুঝলাম যে এঁরা মানুষ-মরা-তাঁরা নন । এঁবা হলেন জাত তাঁরা । নন্দী মহারাজার সইয়ের বউয়েব বকুল ফুলের বোনপো বউ এবং কাকার শালার মামার মেসোর পিসেব জাত ভাই । ভয় এসে গেল—বাতাস দিলে পাতা যেমন দোলে ঠিক তেমনি ভাবে ওদের হাসিব হাওযায় আমাব মনের পাতা ভয়ের দোলায় দুলল একটু । তবু আমি সাহস সঞ্চয় করে বলতে গেলাম—হাসছ কেন তোমবা এমন করে ?

আমি কিছু বলবাব আগেই লোকটি বললে—জয় রাম সীতা রাম রামকালী বাবু ! বামজীর দোহাই আপনার কোন ভয় নাই ! আমরা ওসবে ভয় পাই না ।

আমি বলতে গেলাম—তবে আপনারা সেই আদি ও অকৃত্রিম—

মেয়েটি তার আগেই বললে—উ-হু, উ-হু, উ-হু ! আমরা তাও নই । আমরা ভূত মানে অপদেবতাই নই রামকালী বাবু । আমরা হলাম—

লোকটি বললে—উপদেবতা—

মেয়েটি বললে—এক নম্বরের মুখ্যু তুমি। অপতে উপতে তফাতটা কি? যা অপ তাই উপ। লালমুখো বাঁদর আর মুখপোড়া হনুমান—এই তো!

লোকটি বললে—তা হলে?

মেয়েটি বললে—আমরা হলাম শিডিউলড্ দেবতা।

এবার আমার বিস্ময়। এ রকম কথা কখনও শুনি নি। শিডিউল্ড কাস্ট আছে, ট্রাইবাল কাস্ট আছে—কিন্তু দেবতার বেলায় এরকম তো শুনি নি!

মেয়েটি বল্‌ল—হ্যাঁ, তফশিলী দেবতা বলতে পারেন। ও তফশিলী—আমি ট্রাইবাল—মানে "আদিবাসী"র মত আদিবাসী দেবতা।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম তার দিকে। সে বললে—ও হল ধর্মরাজের দেবাংশী দেবতা আর আমি হলাম মা ষষ্ঠীর সখী দেবতা। আমরা ভূত নই। আমাদের পুজো হয়।

হ্যাঁ—তা হয়। মনে মনে স্বীকার করতে হল তা হয়। বারো মাসে তের ষষ্ঠী তেলে হলুদে ডগমগ চেহারা, চোখে কাজল, হাতে ঝিনুক, পরনে ঢোলা পাড় শাড়ি,—মা ষষ্ঠী মাসে মাসে আসেন; কখনও অরণ্যে কখনও পুকুর নদীর ঘাটে নামেন। পরের সাত পুত কোলে করে নিজের সাত পুত পিঠে করে মা ষষ্ঠী সন্তানবতী মায়েদের আর ছোট খোকাখুকীদের দেবতা। মেয়েরা উলু দেয়, ব্রত কথা শোনে। ছেলেরা প্রসাদ পায়। আর ধর্মরাজও আসেন বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায়। ড্যাং ড্যাং ড্যাড্যা ড্যাং;ড্যাড্যা, ড্যাড্যা, ড্যাড্যা ড্যাং—শব্দে ঢাক বাজে—ভক্তেরা নাচে। জয়ো ধম্ম রজ্জো হে! গুলঞ্চ ফুলের মালা গলায় পরে। পণ্ডিতেরা বলে ধর্মরাজ আসলে হলেন—"অমিতাভবুদ্ধ"! অহিংসার প্রেমের অমৃত তাপস—সাক্ষাৎ দশ অবতারের অন্য অবতার। কিন্তু আশ্চর্যভাবে আমাদের দেশে বটগাছ তলায় কি অশথগাছ তলায় পাথর হয়ে বসে আছেন। অহিংসার তপস্বী পাথর হয়ে বামুন দেবাংশীদের পাল্লায় পড়ে পাঁঠা খাচ্ছেন। বাতের তেল হাঁপানীর কবচ

চোখের অসুখের 'আজন' দিচ্ছেন! কথাগুলো তো মিথ্যে নয়। তাঁদের প্রতাপ খুব। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী থেকে কম নয়। অবিশ্যি এ-কালে সরস্বতী ঠাকরুনের নাম একসঙ্গে কারুর সঙ্গেই করা যায় না, তবে গ্রীষ্মের রাত্রে অচেনা অজানা জায়গায় অন্ততঃ পাড়াগাঁয়ে শুয়ে কি রাত্রে মাঠের পথে যাবার সময় মা মনসাকে হেলা করা যায় না। এ সবই সত্যি কথা কিন্তু এই ধর্মরাজের দেবাংশী আর মা ষষ্ঠীর জয়া বিজয়ার কেউ একজনা অকস্মাৎ জোট বেঁধে এই নিশুতি রাতে আমার কাছে কেন রে বাপু? উনি তফশিলী দেবতা—ইনি ট্রাইবাল অর্থাৎ আদিবাসী দেবী—দুজনে খাঁচার পাখি আর বনের পাখির মত কি মনে করে মিলেছেন? আর এত মানুষ থাকতে আমার কাছেই বা কেন?

মনে করবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম, সেই শিডিউল্ড দেবতা অর্থাৎ ধর্মরাজ ঠাকুরের দেবাংশী বেশ একটু বিরক্তির সুরে বললে—আসেন না ক্যান মশায়—ঠিক ঠাঁইয়ে গেলেই বুঝতে পারবেন। চোখে দেখবেন কানে শুনবেন!

মা ষষ্ঠীর জয় বা বিজয়া।

আমার ভাবনা শেষ হতে না-হতে মেয়েটি হেসে বললে—আমি হলাম ষষ্ঠী বুড়ির ষষ্ঠী মেয়ে, মানে বুড়ীকে হাত ধরে ধরে নিয়ে বেড়াই। তারপর মেয়েটি বললে—নোটন দেবাংশীর কথায় কিছু মনে করবেন না। বয়স হয়েছে তা ছাড়া মানুষটাই একটু গোঁয়ারগোবিন্দ। আজকের তো কথাই নাই। অক্ষয় বট উপাধ্যায় মশায় মারা যাচ্ছেন আমরা নিরাশ্রয় হচ্ছি—এখন কোথায় যাব? কি হবে? কি করব আমাদের আর ভাবনার শেষ নেই।

আমি বললাম—অক্ষয় বট উপাধ্যায়?

—হ্যাঁ। তাঁকে আপনি তো জানেন। কত বার তার পাশ দিয়ে গিয়েছেন—তার কাছে বসেছেন—তাকে নিয়ে কত ভাবনা ভেবেছেন। আগয়া নদীর ধারে, সেই আদ্যিকালের বুড়ো বটগাছ, যে দেহ পালটে পালটে—কাণ্ড মরে গেলে ঝুড়ি নামিয়ে তাকেই কাণ্ড

কবে বেঁচেছিল এক সময় হয়েছিল সাত-বক্ষ মহাবট, রাবণ হয়েছিল দশমুণ্ড রাবণ আব আমাদের বট সাত সাতটা ঝুরি কাণ্ডেব সাত ছাতি নিয়ে হয়েছিল মহাবট-অক্ষয়বট। এ কালে তাঁর হয়েছিল একটি কাণ্ড, বাকিগুলো সব-থম্‌বসিস্ হয়ে প্যারালিসিস্ হয়ে শুকিয়ে গেছে। আজ এই প্রলয় ঝড়ে সেই শেষ দেহটিও সমূলে উৎপাটিত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছেন।

নোটন দেবাংশী বললে—ভালমন্দ অনেক খেয়েছে, সেই বসুমতীর বুকের মধ্যে মধ্যে শেকড় চালিয়েছে। পাথর ফাটানো শেকড়। তার ওপর বড় ঘরের ছাওযাল তো সজনে নাজনে শ্যাওড়া ফ্যাওড়া তো নয় —বট! শেকড গাড়লে তো বাস—ম'নুষের কুড়ুল না ঠেকলে চক্ষু বুজে একশো দেড়শো বছর। বুয়েচ। তপিস্যেও তো আছে, মহাবিরিঞ্চির মহাপেরান, ঠিক জানতে পেরেছ তুমি মশায় আমদপুরে এই গাট সাহেবদেব—কি কম কি কম গো—?

মেয়েটি একটু হেসে বললে—নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে ভূত তুমি। এইকালে মানুষগুলো চন্দ্রলোকে যা চ্ছ—আর তুমি 'রানিং রুম' কথাটা মনে রাখতে পার না ?

--উঁহু, এত সব মনে থাকে না আমাব। আমি বাবার পেসাদী মদ পাঁটা ভাঙ-টাঙ খাই আর ধবম বাবার সেই ঘোড়াটা যেটার ডানে পা টো লটরপটর, বাঁ পা খান খোঁড়া, ধরম বাবার ঘোড়াটা চরিয়ে আনি আর বাস।

মেয়েটি বললে—তা নইলে তোমার এমন দুঃখের দশা কেন হবে বল! মানুষ দেবাংশীরা দিব্যি ধরমবাবার আশীর্বাদী দিয়ে পাকোলা গোদের ওষুধ বেচে টাকার কাঁড়ি করলে—দালান-কোঠা বানালে, আর তুমি—। মাগো চেহারা দেখলেই মনে হবে উপদেবতা না হয় অপদেবতা? হয় ট্রাইবাল নয় অচ্ছুত মানে শিডিউল! বলুন আপনিই বলুন!

শেষ কথাগুলি বললে আমাকে।

আমি বললাম—আমি কি বলব বলুন, আমি কিছু বুঝতেই পাচ্ছি না।

—আচ্ছা তাহলে শুনুন। ব্যাপারটা স্পষ্ট করে দিই। মেয়েটি মাথার উপর টানা আধ ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে বললে—ওই যে অক্ষয় বট উপাধ্যায়—

* * * *

আজকের যে প্রলয়ংকর ঝড়টা গেল—যে ঝড়ে আজ তিনটে গাছ উপড়ে পড়েছে রেললাইনের উপর এবং দার্জিলিং মেল—দানাপুর এক্সপ্রেস, রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার বারাউনি প্যাসেঞ্জার আটকে পড়েছে, গোটা এলাকাটার ইলেকট্রিক লাইন ছিঁড়ে বিলকুল অন্ধকার করে দিয়েছে, হাজার কতক ঘরের চাল উড়েছে, মানুষ মরেছে জখম হয়েছে—সেই ঝড়ে ওই অক্ষয় বট উপাধ্যায় সশব্দে উৎপাটিত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছেন।

ধরাশায়ী হয়েও একেবারে মরে কাঠ হয়ে যান নি। এখনও পাতা সবুজ আছে শিকড়গুলো ছিঁড়ে গিয়েও সতেজ আছে, তবে হাড়গোড় ডালপালা অনেক ভেঙেছে। একেবারে শিকড়গুলো আকাশের দিকে তুলে মাঠের উপর মাথা অর্থাৎ শীর্ষদেশের ডালপালা গুঁজড়ে পড়েছেন।

—সে ভীষণ শব্দ হয়েছিল। শুনতে পান নি?

বললাম—না।

—আমাদিগে ঝড়ের ঠিক আগে বলেছিলেন—তোমরা খুব সাবধান। তা সাবধান হয়ে হবে কি—একেবারে ডিগবাজি খেয়ে চিৎপটাং। বুড়ো বয়সে এই মরবার আগে আস্পদ্ধার কাণ্ড দেখ তো! তার ফল লাও হাতে হাতে!

মেয়েটি বললে—তুমি থাম। আমি বলি।

"ঝড়ে উপড়ে পড়ে উনি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। উনি অজ্ঞান হয়েছিলেন, তার সঙ্গে ভীষণ হতাহতের ঘটনা বিপর্যয়ের কাণ্ড। গাছে প্রায় পোকামাকড় ছিল আট দশ হাজার, সাপ ছিল গোটা বারো, বিছে ছিল সাতাশিটা আর মানুষ মরা ভূত ছিল পাঁচ জন। এক-জন গলায়-দড়ে তিনি এই গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়েছিলেন।

একজন ঠ্যাঙাড়ের হাতে মরা রাহী, গলা কাটা ভূত। একজন ঠ্যাঙাড়ে ভূত—সে ঠেঙিয়ে মানুষ মারত। একজন হল রাজনৈতিক নেতা ভূত, তিনি পাশের গাঁয়ে বক্তৃতা দিতে এসে হার্ট ফেল করে মরেছিলেন আর একজন গেছে পেত্নী সে বেঁচে থাকতে রাত্রে এসে গাছের ডালে চড়ে, ডাল দুলিয়ে লোককে ভয় দেখাতো, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে, ঘাড় ভেঙে মারা যায়। এ ছাড়া ছিল অসংখ্য বাদুড়। সে গুলোও হল এই ষষ্ঠী বুড়ীর ষষ্ঠীর ছা, যারা ষষ্ঠীর প্রসাদে মায়ের কোলে জন্মে ছেলে বয়সেই মরে ভূত হয়ে ফিরে এসেছে ষষ্ঠীর কাছে। ওই ডালে ডালে শুকনো হাড় ঝিরঝিরে ছেলের মত চেঁচাচ্ছে আর নীচু মুখ করে গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলছে। মনে হচ্ছে ওরা বাদুড় কিন্তু বাদুড় ওরা নয়। বাদুড়ের চেয়েও বেশী আছে চামচিকে। বটগাছের গায়ে মরা ডালে গর্তে গর্তে অসংখ্য চামচিকে। ওরাই তাই। ওরা হল পঞ্চতন্ত্রের সেই অনাগতবিধাতারা। অর্থাৎ যারা পরে জন্মাবেন। মা ষষ্ঠীকে তো এরপর মুঠো মুঠো ছানা দান করতে হবে।

মেয়েটি বললে—এরা সব মরে একাকার হয়ে গিয়েছে। বেঁচেছি দেবতা—সে ট্রাইবালই হই আর শিডিউলড্ হই—যাই হই দেবতা বলেই আমরা বেঁচেছি।

এখন এঁর জ্ঞান হতেই উনি বললেন—কে বেঁচে আছ?

আমরা দুজন গেলাম বললাম—আমরা আছি।

উনি বললেন—হ্যাঁ। তোমাদের থাকবার কথা বটে। তা দেখ আমার শেষ কাল উপস্থিত। আমি মরব। এখন আমার শেষ ইচ্ছা তোমরা পূরণ কর দেখি। অনেক পুণ্য হবে তোমাদের।

আমরা বললাম—কি বলুন।

উনি বললেন—আমদপুর ছোট লাইনে গার্ডদের রানিং রুমে রামকালী শর্মা নামক একজন ব্যক্তি আছেন। তিনি আজ ওখানে এই ঝড়ের জন্যই আটকে গেছেন। তাঁকে ডেকে আন। শেষ কথা তাঁকে আমি বলে যেতে চাই। গতবার এই ছোট লাইনেরই ও প্রান্তে ঘাট ভুবনপুরে গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর বাপের শ্রাদ্ধের দিনে গয়েশ্বরীর লোকেরা

ট্রেনে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাদেব কথা লিখেছেন। গয়েশ্বরীদের কাল যেতে বসেছে। লোকে তাদের উড়িয়ে দিচ্ছে। উড়েও তারা যাবে। ফুংকারে যেমন শিমুল ফল ফাটার ছোট ছোট টুকরো উড়ে যায়—তেমনি ভাবেই উড়ে যাবে। তবু তারা ওই লেখায় থাকবে। সুতরাং তাকে ডেকে নিয়ে এস—তোমাদের কথা এবং আমার কথাও আমি তাঁকে বলে যেতে চাই।

মেয়েটি বললে—তিনি আপনার পথ চেয়ে রয়েছেন। তাঁর কথাতেই আমবা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

বললাম—আর কত দূর যেতে হবে?

নোটন বললে—তা দূর একটু আছে গো। এক কাজ কর না।

বললাম—কি?

চোখ বন্ধ কর; তারপর মনে কর তুমি যেন ঘুমিয়ে গেছ।

—সে কি—আমাকে তুলে নিয়ে যাবে না কি?

—দেখ না। এই ফুস মন্তরের চোটে কি হয় দেখ না। মনসাব কথায় শোননি—তুলোব চেয়ে হালকা হওয়া, বাঁটুলের মত গুড়িয়ে-সুড়িয়ে গোল হওয়া—আর সাপেদের ফণায় ভর করা? তেমনি করে ভর কর; বুঝলে?

বুঝতে না বুঝতে পা দুটো যেন মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠল। আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—সোঁ—।

* * * *

সোঁ—সোঁ—সোঁ—সোঁ—।

বেশী না। গোটাচারেক বার। তারপরই মাটিতে পা ঠেকল।

লোকটি ঘাড় থেকে নামালে আমাকে; আমায় হাত ধরে মেয়েটি বললে আমরা এসে গিয়েছি। চোখ খোল।

চোখ খুলে অবাক হয়ে গেলাম। এই কি আগমার জঙ্গল নাকি? কোথায় জঙ্গল কোথায় উপড়ে পড়া বৃহৎ বট? এ যে ভেঙে পড়া এক ভাঙা ঠাকুরবাড়ি। বিরাট এক প্রাচীন ঠাকুরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। পাশেই এক কানায় কানায় ভরা নদী। বাঁধানো ঘাট। নাটমন্দিরে আশ্চর্য

বুড়ো মাথা ফাটিয়ে ফাটিয়ে হাত ভেঙে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত অবস্থায় শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার কাছে হলুদ রঙের কাপড়পরা আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ী—তার গায়ের রঙ সোনার বর্ণ; পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি; হাতে শাঁখা, ব'সে তালপাতার তৈরী পাখা নিয়ে হাওয়া দিচ্ছে আর মিটমিট করে তাকাচ্ছে। আর বুকের কাছে বসে ন্যাড়ামাথা গেরুয়াপরা এক বৃদ্ধ। এদের চিনতে দেরি হল না; একজন ষষ্ঠী ঠাকরুন, অন্যজন ধর্মবাজ। এরা ছাড়া সে প্রায় শতখানেক কি তারও বেশী মানুষ; সে কাচ্চা বাচ্চা বুড়ো জোয়ান নানান বয়সের নানান জাতের মানুষ ঘিরে বসে আছে আর কাঁদছে। দৃষ্টি আরও পরিষ্কার হতেই দেখি—আজকের ঝড়েই এই পুরনো মন্দিরটা ভেঙে চাপা পড়ে কত মানুষ যে মরেছে সে আর গুণে শেষ করা যায় না। ওরে বাপরে! চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

সেই আশ্চর্য বিশালকায় আহত এবং রক্তাক্ত দেহ বৃদ্ধ আমাকে দেখে বললেন—আসুন। কোন ভয় করবেন না! আমি গয়েশ্বরী নই। আমি অক্ষয় বট। আমি ধীর আমি স্থির আমি মহাবলী অথচ মহাশান্ত। আমার ধর্ম ছায়া বিতরণ আশ্রয় দান। আজ আমার শেষ দিন শেষ ক্ষণ।

সে-বৃদ্ধের সে-কণ্ঠস্বর অতি আশ্চর্য এবং বিস্ময়কর। গম্ভীর অথচ মিষ্ট, স্পষ্ট এবং ধীর। আজ এই শোকাবহ ঘটনার জন্য আমিই খানিকটা দায়ী। সে সব কথাই আপনাকে বলে যাবার সময় ও সুযোগ পেয়ে এই শোচনীয়ভাবে অপঘাত মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

—"আপনার কাছে আমি হার স্বীকার করে যাচ্ছি। আমরা পরাজিত।"

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। কি বলছে? কিসের পরাজয়?

বৃদ্ধ বললে—মৃত্যুর জন্য দুঃখ নাই। জন্মিলে মরিতে হবে। অমর কে কোথা কবে? তবে বেঁচেছি তো কম দিন নয় অনেক দিন।

এই অনেক দিন ধরেই তোমাদের আমরা ছায়া দান করি ফল দান করি—তোমরা আমাদের দেবতা বলে পূজা কর। দেবতারা আমাদের আশ্রয় নেয়—ভূত প্রেত পেত্নী এ সবের কথা বলেই কাজ নেই; মরার পর তাদের গ্রামশহরই হল গাছের ডালপালা।

হঠাৎ একটু থেমে থেমে যেন কথাবার্তার স্বর পালটে দিয়ে হাল্কা-পল্কা ভাবে বললে—সোজা করে বলি শোন।

আমি আগয়ার ধারের বুড়ো বট।

আমি যখন জন্মাই তখন কালটা বোধ হয় মুসলমান আমল। এই যে আগয়া নদী এবং এর আশপাশ সব ছিল খুব নির্জন। দেশের লোকসংখ্যা ছিল কম। এখানে ওখানে ছোটখাটো দু দশখানা ঘরওয়ালা দু একটা গ্রাম ছিল। এই যে পাকা রাস্তাটা এটার চিহ্নই ছিল না। তবে পায়ে হাটা পথ ছিল। এই জঙ্গলে নদীর ধারে ছিল বুনো-শূয়োর আর ভিতরে ছিল খরগোশ, শজারু, দু একটা বাঘ কখনও সখনও আসত। সাপ ছিল বিস্তর আর পাখি ছিল অনেক। গাছের মধ্যে গাছ বেশির ভাগই ছিল অর্জুন। প্রতি বর্ষায় হাজার হাজার চারা হত। এরই মধ্যে জন্মালাম আমি।

এখানে আগয়া নদীর ধারে কতকগুলো কালো মোটা মোটা পাথর ছিল মাটির সঙ্গে। মাটির গড়নই এমনই। এখানে ওখানে পাথর আছে দেখেছ তো: ঠিক তেমনি। সেই পাথরের উপর একটা পাখি একাধারে আমার পিতামাতা—বটবীজটিকে খেয়ে এখানে বসে বিষ্ঠা-ত্যাগ করেছিল--সেই বীজকণা থেকে আমি জন্মে আস্তে-আস্তে ওই অর্জুন গাছের জঙ্গলের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলাম। তখন আমি প্রায় তিন চার হাত লম্বা হয়েছি; চারপাশে তখন তিনটি শাখা মেলেছি।

এই সময় একদিন কাঁদতে কাঁদতে এল একটি অল্পবয়সী মেয়ে। তার ছেলে হয়ে মারা গেছে; ছেলের শোকে কাঁদবার জন্য এসেছে এই নির্জনে। এসে পাথর দেখে বসল এই পাথরে একেবারে আমার গোড়ায় এবং কাঁদতে লাগল। ভরতি দুপুর বেলা, গরমের সময়, আমি তখন ছোট গাছ—আমার একটুখানি ছায়া তখন; সেই ছায়াতেই

কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে গেল। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে যে, যে বটগাছটির ('মানে আমার'—বুড়ো বটের আত্মা বললে) ছায়ায় শুয়ে আছে তার কচি ডালগুলোর ডগায় ডগায় যে 'থোকা থোকা' বট ফল ধরে আছে সেগুলো আসলে বট ফল নয়—ওগুলো সব হল ছেলেপুলে।

হাওয়া লেগে ডাল দুলছে—সঙ্গে সঙ্গে ছেলেপুলেগুলো দুলছে; তা দেখে ওই মা-টির মনে হল—যেন ছেলেগুলোকে নিয়ে দোলা দিচ্ছি আমি (মানে বটগাছ)।

ঘুমের ঘোরেই মেয়েটি ফোঁপাতে লাগল।

আমি— ; —

সেই আহত রক্তাক্ত দেহ বুড়ো, সেই বট গাছের আত্মা বললে —বুঝছ, আমি—তখন সেই কালের সেই আমি তাকে বললাম—দেখ, তুমি এক কাজ কর, কাল এখানে আমার গোড়ায় আবার এসো। স্নান করে পূজো সাজিয়ে এসো। এসে—তুমি যে দেবতা বা দেবী ছেলেপুলের দেবী তাকে পূজো করে যেয়ো। বুঝেছ? আমি সেই ঠাকুরকে ডেকে রাখব। মেয়েটি বললে—বেশ। বুঝেছ—সেকালে সহজেই এ সব কথা বিশ্বাস করত। আলো দেয় সূয্যি ঠাকুর, জ্যোৎস্না, দেয় চন্দ্র ঠাকুর, জল দেয় ইন্দ্র রাজ, আগুন দেয় অগ্নি দেব, ধান দেন লক্ষ্মীমা, বিদ্যে দেন সরস্বতীমা, তখন ছেলেমেয়েও নিশ্চয় কোন না কোন দেবতাই দেন। আমি মনে মনে তাকে ডাকতে লাগলাম।—আহা মেয়েটির বড় দুঃখু। ছেলেমেয়ে দেবার ঠাকুর বা ঠাকুরুন তুমি বাপু দয়া করে এস। মেয়েটি কাল পূজো আনবে; তুমি পূজো নিয়ে ওকে দয়া করে একটি ছেলে দিয়ো।

পরের দিন মেয়েটি এল—গরমের সময়—গাছে গাছে খেজুর পেকেছে জাম পেকেছে আম পেকেছে, ফুটি পেকেছে মাঠে, চাষের ছোলা কলাই ভিজিয়ে নিয়ে—পূজোর থালা সাজিয়ে নিয়ে এল। তার সঙ্গে কাপড় গামছা দিলে। হলুদ বাটা সিঁদুর আনলে। এনে আমার গোড়ায় ঢেলে দিয়ে বললে—এই আমার পূজো নাও, তোমার অনেক ছেলে—অনেক ফল ধরেছে তোমার—আমাকে একটি ছেলে দাও।

আমি বললাম—হে দেবতা দয়া কর।

স্বর্গ থেকে এক বুড়ী এল, হলুদ মেখে, কাজল পরে, সেই বলে যে 'হলুদে ঘুটঘুট—কাজলে ভুটভুটু সিঁদুরে সুটুসুটু,'—(এর মানে কি তা বুঝলাম না আমি, কিন্তু বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল না।) ঠিক তাই। বুড়ী বললে আমি এসেছি। আমি হলাম স্বর্গের দেবতাদের দাঈ। আমি ছেলেপিলের দেবতা। স্বর্গের ইন্দ্ররাজার ছেলে জয়ন্তের আঁতুড়ে আমি ছিলাম। মা দুর্গার গড়া পুতুল যখন জ্যান্ত হয়ে কেঁদে উঠল—তখনও আমাকে ডেকেছিল। গণেশকে তুলে আমিই দুর্গামায়ের কোলে দিছিলাম। আমার নাম 'ষষ্ঠী ঠাকরুন'। আমি পৃথিবীতে বারোমাসে তের বার আসি—কখনও আসি অরণ্যে কখনও পুকুর নদীর ঘাটে—কখনও কিছুতে কখনও মিছুতে। তা, এই জষ্টি মাসে তোমার এই গাছতলায় এসে পূজো নিয়ে যাব। আর মেয়েটির ছেলে হবে।

এই বলে সে চলে গেল। আর তারপর আমি যত বড় হলাম তত ডালপালা মেললাম, ছায়া বড় হল ; নানান পশুপক্ষী এসে আশ্রয় নিল। আর এল এক বামুন। সে হল ওই মেয়েদের পুরুত। সে পূজো নিবেদন করতে আসত। সে পূজো করত আর ষষ্ঠী মায়ের মহিমা প্রচার করত। লোকে পূজো যা দিত সেই নিত। আমার গোড়া সে পরিষ্কার করত। আমার ডাল কাটতে দিত না। আমার ডালে বাদুড় চামচিকেরা এসে যখন ঝুলল তখন সেই বললে—ওরা মা ষষ্ঠীর ছানা। ওদেরই মা দান করেন মায়েদের।

তারপর অনেকদিন পর এল ধর্মরাজ।

ধর্মরাজকে নিয়ে এলেন এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী ঠাকুরটি তকতকে গাছতলা নির্জন স্থান আর অরণ্যঅরণ্য ভারের ঠাঁইটি দেখে বাসা গাড়লেন। ঠাঁইটি মানে আমার তলদেশটি আরও ঝকঝকে তকতকে হল। বেদী বাঁধলে। মাটির বেদী। চেলা চামুণ্ডা জুটল। যত সব নিকেজো মানে বেকার বাউণ্ডুলে লোক এসে জমে গেল বাবা সন্ন্যেসীকে ঘিরে। গাঁজা ভাঙ খেতে লাগল আর যারা কাজ

করে—তাদের কাছে গিয়ে দেবতার নাম নিয়ে মাতব্বরি করতে লাগল।

রামকালীবাবু আজ আর তোমার কাছে লুকোব না, স্বীকার করব সত্য কথা। দেবতা কেউ চোখে দেখেনি স্বর্গে কেউ যায়নি—কেউ স্বর্গ থেকে আসেনি—কিন্তু দেবতা স্বর্গ পরকাল আর ভূত এরা জীবন্ত মানুষের রাজ্যে আশ্চর্যভাবে এক অদ্ভুত সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার করে বসে আছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ গণেশ কার্তিক—গাজনের শিব ধর্মরাজ মনসা ষষ্ঠী। সুন্দর বনের বাঘের ঠাকুর কোথাও ভালুকের ঠাকুর—ঠাকুরের যে ছত্রিশকোটি বংশাবলী এ সব ভূয়ো—সব ভূয়ো। ভালমানুষ সহজ মানুষরা এককালে আলো যে দেয় তাকে দেবতা ভেবেছে, জল যে দেয় তাকে দেবতা ভেবেছে এমনি করে যা কিছুর কারণ খুঁজে না পেয়েছে তাই ধরে নিয়েছিল এ সব করেন দেবতারা। কিছু কিছু চালাক চতুর লোক—তারা বেশির ভাগ বামুন পাণ্ডা বেকার বাউণ্ডুলে—তারা গাছতলায় পাথর বসিয়ে সিঁদুর লেপে বোম।বিশ্বনাথ জয় ধর্ম রজ্জো বলে বসে পড়েছে। আমার সেদিনকার সেই বাড়বাড়ন্তর দিনে আমাকে ঘিরে এই সব ঠাকুরদের আস্তানা পড়েছিল। গোড়াতে একদিকে মা ষষ্ঠী একদিকে ধর্মরাজ, আর ওই দেখ একটু দূরে নদীর ওপারে ওই যে ডাঙাটায় ওই যে ঘরটা ওটা হল মা মনসার-ঘর—আরও খানিকটা দূরে এই তো সেদিন রেলের কুলীরা রামদাস হনুমানের নামে মহাবীরের ঝাণ্ডা টাঙিয়েছে।

বারো মাসে তেরো পর্বণ হত। মধ্যে মধ্যে মেলা বসত আমাকে মাঝখানে রেখে এই চারপাশে। রাত্রে আলো জ্বলত। লোকেরা ঢোল বাজিয়ে গান গাইত; কবিগান যাত্রাগান হত; দিনের বেলা ঢাক ঢোল বাজিয়ে পুজো দিত লোকেরা; বলিদান হত; ছাগ ভেড়া হাঁস কাটত; আবার খোল বাজিয়ে হরিনামও করত।

আমি মাথা তুলে আকাশকে যেন মাথায় ধরে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মনে হত আমি সম্রাট। আমার নিজের শক্তিতে নিজেই আমি আশ্চর্য হতাম। প্রায় ঝগড়া হত আমার মেঘেদের সঙ্গে আর

ঝড়ের সঙ্গে। সূর্য্যিঠাকুর লোক ভাল। চন্দ্রঠাকুর সেও খুব ভাল। কিন্তু এই ঝড়ো ঠাকুর আর এই জলের ঠাকুর মেঘের দেবতা এরা দেবতা হিসেবে যা হোন মানুষ ভালো নন। কুটিল পেঁচালো জেদী, ন্যায় অন্যায়ের বিচার নাই—স্বেচ্ছাচারী! চাঁদসদাগরের সঙ্গে মনসা ঠাকরুনের বাদের কথা জান তো? তুই আমাকে পুজো কর—না করলে তোকে কামড়াব। তাও সামনাসামনি নয়—লুকিয়ে চুরিয়ে রাত্রিবেলা। আর ঠাকরুনের মুরদ তো খুব—একটি লাঠির এক ঘা পড়লেই কাত! তারপর ধর শ্রীবৎস রাজা আর শনিঠাকুরের কথা। নলরাজা আর কলি ঠাকুরের কথা। কত বলব বল, সব দেবতার এক বোল। আমাকে পুজো কর। না করলে ছলে বলে তোর সবনাশ করব। ওই যে বুড়ী ষষ্ঠীবেটী ওর চরিত্তির তাই গো। শেতল ষষ্ঠীর দিন কোন মা ষষ্ঠীর ভিজে ভাতের পেসাদ না-খেয়ে গরমগরম খেয়েছিল—অমনি বুড়ীর মেজাজ খাপ্পা।

দেখ না রামকালী থুড়থুড়ী বুড়ী কটকট করে তাকিয়ে আছে দেখ না।

যাকগে। শোন যা বলছি শোন। সে কালে আমার সঙ্গে ওই ঝড় আর মেঘের দেবতাদের সঙ্গে লড়াই হত। বুঝেছ! আওয়াজ দিয়ে ঝড় সমুদ্র লঙ্ঘনকারী হনুমানের মত পশ্চিম দক্ষিণ কোণে স্থির হয়ে দাঁড়াত, দম ধরত, সারা শরীরকে শক্ত করে তুলত—বড় বড় কুস্তিগীরদের মত তারপর 'গোঁ-ওঁ-ওঁ' শব্দ করে দিত ঝাঁপ—শূন্যলোক তোলপাড় করে যা খানিকটা মাথা তুলেছে তারই মাথায় ধাক্কা মেরে ভেঙেচুরে দিয়ে চলে যেত। আজও যায়; আজই তো দেখলে। তার পিছন পিছন আসে মেঘ আর জল—তার সঙ্গে থাকে ইন্দ্রদেবতার বজ্র। বড় বড় তাল গাছের মাথা দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেয়। আজও পড়েছে বাজ। ওই সুন্দীপুরে পড়েছে তালগাছের মাথায়—হরিরামপুরে পড়েছে পুরোনো মন্দিরের চূড়ায়—আরও দুটো পড়েছে কোপাই নদীর ওপারে।

আগে আগে আমার উপর বজ্রের আঘাত করেছে—একবার নয় চার

চার বার। চার বারে চারটে ডাল শুকিয়ে গেল।

আমি ঝড়কে জলকে ইন্দ্রকে মানতাম না কিনা।

বলতাম—তোমাদেরকে মানব কি হে? তোমরাই তো আমার তলাতে এসে আশ্রয় নিয়েছ। মনসার কাচ্চাবাচ্চারা থাকে, ষষ্ঠী বুড়ী থাকে তার বাচ্চা বাদুড় চামচিকে থাকে, ভূতেরা থাকে, পাঁচটা ভূত থাকে আমার ডালে, ধর্মরাজ থাকে। আমি তোমাদের মানব কেন?

ঝড় বলত—তবে নে, সামলা।

আমিও তাল ঠুকে শক্ত মাটিতে খুঁটি নিয়ে দাঁড়াতাম আর মুখে কোন কথা না বলে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। ঠিক ধুলোমাটি মাখা নেঙট কষা মল্লবীরের মত। ঝড় গোঁ-ওঁ শব্দে এসে ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ে মুচড়ে মাটিতে ঠেসে ধরে ঘাড় ভেঙে দিতে চাইত। আমি নুয়ে পড়তাম প্রথমটায়, তারপরেই ঝটকা দিয়ে ঝড়কে ঘাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার সোজা হতাম। আবার ঝাঁপ দিত ঝড়। আমি আবারও তেমনি করে লড়াই দিতাম। একবার দুবার তিনবার তারপর ধস্তাধস্তি ধস্তাধস্তি। সে ফেলে আমি ছুঁড়ে ফেলে দি। সে গোঙায় গোঁ গোঁ আমি হা-হা করে হাসি। আমার তলায় ভয়ে বোবা হয়ে বসে থাকে ধর্মরাজ—ষষ্ঠীবুড়ী। সাপখোপ পোকামাকড় বাদুড় চামচিকে আমার গায়ের গর্তটর্ত দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়ত। ঝড় ক্রমে ক্রমে ক্লান্ত হল—বৃষ্টি শেষ হত, আমি মাথা তুলে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকতাম। হাসতাম মিষ্টি মিষ্টি। মাথার উপরে আকাশে চাঁদ থাকলে বলতাম—তুমি সাক্ষী ঠাকুর। সূর্য থাকলে তাঁকে বলতাম —প্রভু তুমি সাক্ষী। অনেক গাছের দর্প চূর্ণ করেছে, অনেকে হেরেছে আমি হারিনি। আমার সঙ্গে একটা আপস হয়ে গিয়েছিল শেষ দিকে। কারণ অনেক দেবতার আশ্রয় তো আমি।

বেশ দিন যাচ্ছিল। আমার বয়স বাড়ছিল তবু বুড়ো হইনি। মূল কাণ্ডটা মরল, তখন আমি নতুন ঝুরি নামিয়ে আরও তিনটে কাণ্ডে ত্রিদেহী মহাবট হয়ে উঠেছি। তোমাদের মধ্যে যমজ ছেলে হয় জোড়া লাগা যমজ—তোমরা তাকে বলো শ্যামটুইন—এ টুইনের থেকে বেশী।

লোকে বলত দেব চরিত্র বোঝা ভার।

হঠাৎ কাল পালটাল। মানুষ পরশমণির চেয়েও দামী মণি পেলে। বিজ্ঞান মণি।

যে জ্ঞানের বলে আগের কালের সকল বিশ্বাসের ওপর আলো ফেলে বিশ্বাসের কালো অন্ধকার ঘুচিয়ে বিশ্বাসকেই মুছে দিলে।

আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে লাগল সব।

লোহার গাড়ি জলে আগুনে কয়লায় লাইনের ওপর চলতে লাগল তারের মুখে বিদ্যুতের আলো জ্বলল। তেল নেই সলতে নেই প্রদীপ নেই ঝড়বাদলে নেভা নেই আলো জ্বলছে। অবাক হয়েই দেখছিলাম। চমকাই নি।

হঠাৎ চমকে উঠলাম—মানুষদের চিৎকার শুনে।

—ভূত নাই, ভগবান মানি না—দেবতা মিথ্যে!

—ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

আশ্চর্য! আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ভূতেরা মিলিয়ে যেতে লাগল। তোমাদের গ্রামের সেই বিখ্যাত রামাই ভূত কেমন করে নিখোঁজ হল জান? সে সেই বড় শিমুল গাছটার মাথায় বসে পৈতে হাতে নিয়ে জপ করছিল—

ববম ববম ভোলা—জয় কালী জয় কালী—
ধিতাং ধিতাং নাচি—হাতে দিয়ে তালি!

ঠিক এই সময়েই গাছটার একটু দূরের রাস্তা ধরে যত হাল আমলের ছোকরাদের মিছিল চলছিল—তারা হাঁক দিচ্ছিল—ভূত! নেহি হ্যায়। প্রেত—বিলকুল ঝুট; ভূত প্রেত মুর্দাবাদ। ভেঙে দেও—জাহান্নম। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চমকে গিয়ে রামাই সেই উঁচু শিমুল গাছের সেই উঁচু ডগার ডাল থেকে ফট করে শিমুল ফলের মত ফেটে গেল। শিমুল ফলের তুলো আছে সেগুলো উড়ে বেড়ায় বাতাসে খোলাটা লেগে থাকে বোঁটায়—এর খোলাও নেই ভেতরে তুলোও নেই। সুতরাং ফট করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে ভূত শূন্যে ফুস করে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মত মিশে গেল।

শেষ পর্যন্ত ওই বৈতরণী ঘাটের ধারে ঘাট ভুবনপুরে ওরা জড়ো হয়ে আছে। কিন্তু তাও আর থাকবে না। এবার মানুষরা চন্দ্রলোকে যাচ্ছে গো। মহা বিপদ! কোথাও গিয়ে পরিত্রাণ নেই। তাই—

বললাম—কি ভাই? খুব বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল।

বৃদ্ধ বটের আহত আত্মাপুরুষ বললেন—দেখ, সব দেবতারা এবার শঙ্কিত হল। ভূত গেছে—এবার এরা মহাশূন্যে মহাযান চালিয়েসব খুঁজে পেতে ভগবানকে ধরতে যাবে।

ভগবান বুড়ো কোথায় থাকে তা ওই ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণও জানে না। বিশ্বাস না হয় উপনিষদ পড়ে দেখো। তাই দেবতারা খুব চঞ্চল হল। সব দেবতা। এরা তো এবার দেবতা-টেবতাদেরও মানবে না। ঘাড় ধরে ধরে নিকালে দেবে! তখন কোথায় যাব সব? মানুষ যদি দেবতাদের না মানে তবে তারা যাবে কোথায়? খাবে কি? অক্ষম পঙ্গু নড়তে পারে না চড়তে পারে না কথা কয় না বেচারারা যে শুকিয়ে হেজে-মজে, অঙ্গহীন হয়ে, পুতুল হয়ে, পাথর হয়ে, না হয় নস্যাৎ হয়ে উড়ে যাবে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছিল। আকাশের চাঁদ পশ্চিমদিকে ঢলে পড়েছে। বৃদ্ধ বট পশ্চিমের ঝড়ে উপড়ে পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হয়ে পড়েছেন। বিশাল শাখাপ্রশাখা মাটির উপর ভেঙেচুরে দুমড়ে মাটির বুকে মুচরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তার পাশেই তাঁর আত্মা আহত হয়ে পড়ে আছে। দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বোধ হয় রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবেন স্বর্গলোকে। আশেপাশে অপ বা উপদেবতারা বা শিডিউল্‌ড আর ট্রাইবাল দেবতারা জমায়েত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ধর্মরাজ থুত্থুরে বুড়ো। ষষ্ঠী আত্তিকালের বত্তি বুড়ী। মনসা ঠাকরুণ গাজনের শিব, শিবের সেনাপতি বাণ গোঁসাই, রক্ষেকালী শ্মশানকালী, সুন্দর রায়, খোসপাচড়ার দেবতা ঘেঁটু ঠাকুর—ওরফে ঘণ্টাকর্ণ, তার উপর গলায় দড়ি, পুড়েমরা ভূত, ঘাড়ভাঙা ভূত, জলে

ডুবে মরা ভূতনী, সাপে কামড়ে মরা ভূত, তেরোস্পর্শে মরা ভূত, শেখ সাহেবদের মামদো, পাদরীদের সাহেব ভূত সব এসে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

দাঁড়াবে না?—বটগাছ যে তাদের আশ্রয়দাতা!

বুড়ো বটের আত্মা বলল—এইসব নিয়ে আমাদের সভা-সমিতি প্রায়ই হচ্ছিল। কি করা যায়? কিভাবে বাঁচা যায়। মানুষের ওপর কি করে টেক্কা দেওয়া যায়? টেক্কা তুরুপ ছাড়া তো পথ নেই। দেখছ তো রাশিয়া আমেরিকার ব্যাপার? এ একটা আকাশযান ছাড়ছে তো ও আর একটা ছাডছে। এ যদি শূন্যযানে কুকুর পাঠায় তো ও পাঠায় মানুষ। তখন ও পাঠায় মেয়েছেলে। তারপর এ পাঠায় দুজন। আবার মহাকাশে হেঁটে বেড়ায়। দুটো মহাকাশ-যানে দেখা হয়। এবার আমেরিকা তাজ্জব করে দিলে। লোক এবার নামাবেই চাঁদের উপর। তাই আমাদের ঠিক হল—আমরা তার আগেই পাঠাব আমাদের প্রতিনিধি। আমাদের যন্ত্রের দরকার নেই। যন্ত্র আমরা বুঝি না। আমরা দেবতা। আমরা উড়ব। তাই ঠিক হয়েছিল আমি উড়ব। ঝড়ের দেবতা রকেটের মত আমাকে বৃক্ষদেবতাকে আকাশে ছুঁড়ে দেবে আর আমার ডালে ঝোলা হাজার-খানেক বাদুড় আর একলক্ষ চামচিকে পাখা ঝাপটাতে থাকবে আমরা মাধ্যাকর্ষণ পার হয়ে চাঁদে গিয়ে ঝপ করে নেমে গোটা চাঁদকে দখল করে হাঁকব—দেবতালোক জিন্দাবাদ। জয়—দেবতাদের জয়।

ঝড়ও এল। দেখছ কি ঝড়! সে আমাকে তুলেও দিলে—কিন্তু দেবতারা বিজ্ঞান জানে না। বাদুড়ের চামচিকের পাখায় ভর করে শূন্যলোকে উড়ে চন্দ্রলোকে যাওয়া যায় না। আমি ধপাং করে পড়ে গেলাম মাটির বুকে। এবং—

মাঝপথেই থেমে গেল বুড়ো বটের আত্মা এবং একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

তারপর আবার বললে—ভূত দেবতা ভগবান এ সবের কাউকে কিংবা কিছুকে রাখবে না মানুষ।

আমি বললাম—তাতে কি গাছ তো থাকবে।

গাছ বললে—হ্যাঁ। কিন্তু

—কিন্তু কি?

—দেবতা হয়ে তো থাকবে না।

—দরকার কি? গাছ গাছ হয়েই থাকুক। মানুষও তো মানুষ হয়েই থাকবে?

গাছ বললে…মানুষদের তো আমরা খুব ভালবাসি। যখন মানুষেরা ঘর গড়তে জানত না—তখন তো ঝড়ের হাত থেকে জলের হাত থেকে রোদের হাত থেকে আমরাই বাঁচিয়েছি।

বললাম—কে অস্বীকার করছে?

করছ না? করবে না?

না, মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়।

গাছ বললে—হৃদয়হীনও যেন হয়ো না।

গাছের ওই শেষ কথা। তারপরই পাখি ডাকতে লাগল। পূর্ব দিকের আকাশে যেন লালচে আভা ধরেছে। বাসু আমাকে নাড়া দিয়ে ডেকে তুললে। জেগে দেখলাম আমি আমদপুর স্টেশনেই শুয়ে আছি।

ওঃ। তা হলে সারারাত্রি স্বপ্ন দেখেছি।

না—স্বপ্ন ঠিক নয়। কারণ সকালে যখন ট্রেন চড়ে বাড়ি ফিরলাম তখন দেখলাম আগয়ার ব্রিজের পাশে আগয়া, নদীর চরের উপর কুলীরা কাটারী দা কুড়ুল নিয়ে গতরাত্রে ঝড়ে উপড়ে পড়া সেই ষষ্ঠী বুড়ী ও ধরমতলার বটগাছটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে লাইন থেকে সরিয়ে ফেলেছে; এখন বাকী অংশটাকে টুকরো টুকরো করবে। দেখলাম লরী দাঁড়িয়ে আছে। গাছ তুলে নিয়ে যাবে। শুনলাম এখানকার স মিল মানে করাতকলওলারা গাছটাকে কিনে ফেলেছে। চিরে কেটে টুকরো করে বিক্রি করবে।

আরও দেখলাম—অনেক মজুর চাষী দাঁড়িয়ে আছে। বটগাছটা

গেল এবার জায়গাটা কেটে জমি করলে কেমন জমি হবে তাই তারা দেখতে এসেছে।

বিকেলবেলা কলকাতা যাবার জন্যে বাড়ি থেকে আবার এই পথেই ফিরলাম—তখন আগয়ার ধরমতলা ষড়তলা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এরপর জমি হবে। মাঠটার দুটো নাম হবে—ধরমতলার মাঠ আর ষষ্ঠীতলার মাঠ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে আশ্চর্য প্রতিভা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল তারাশঙ্কর। সুবিস্তৃত প্রেক্ষাপটে মানব সংসারের বিচিত্র উত্থান পতন এবং অনিবার্য পরিণতি রূপায়ণের তিনি এক অসামান্য শিল্পী। সুগভীর দৃষ্টি এবং পরিব্যাপ্ত জীবনবোধের সমন্বয়ে তারাশঙ্কর রচনা করেছেন তাঁর তাবৎ গল্প-উপন্যাস। গ্রাম বাংলার রাঢ় অঞ্চল দত্ত বারবার তাঁর রচনায় ছায়াপাত করেছে তবুও নিঃসন্দেহে তিনি সমগ্র বাংলারই রূপকার। অবহেলিত অজ্ঞাত অন্ত্যজদের গভীর মর্মকথা উদ্ঘাটন করে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন। মাটির গন্ধ গায়ে মেখে তাঁর উপন্যাস-গল্পের চরিত্ররা উঠে এসেছে পাঠকের হৃদয়ের কাছাকাছি। তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে কবি, আরোগ্য নিকেতন, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, কালিন্দী, দুই পুরুষ, গণদেবতা, ধাত্রী দেবতা, পঞ্চগ্রাম, শতাব্দীর মৃত্যু ইত্যাদি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বদেশীয় প্রায় সবগুলি উচ্চপুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। একদা তিনি বিধান পরিষদের সম্মানিত সদস্য ছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই বরেণ্য লেখক ১৮৯৮ সালে বীরভূম জেলার লাভপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭১ সালে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কামিনী



শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টেশনে ট্রেন থামিতেই হ্যাট-কোট পরা সুরনাথবাবু নামিয়া পড়িলেন। স্টেশনটি ছোট, তাহার সংলগ্ন জনপদটিও বিস্তীর্ণ নয় ট্রেন দু'মিনিট থামিয়া চলিয়া গেল।

সুরনাথ ঘোষ একজন পোষ্টাল ইন্সপেক্টর। সম্প্রতি এদিকটার গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি নূতন পোস্ট অফিস খুলিয়াছে, সুরনাথবাবু সেগুলি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি এদিকে কখনো আসেন নাই।

ছোট সুটকেসটি হাতে লইয়া তিনি স্টেশনে বাহির হইলেন সঙ্গে অন্য কোন লটবহর নাই। সুটকেসের মধ্যে আছে এক সেট্ প্যাণ্টলুন ধুতি গামছা সাবান, দাঁত মাজিবার বুরুশ ইত্যাদি।

স্থানীয় পোষ্ট অফিসটি স্টেশনের কাছেই। ডাক এবং তার দুই-ই আছে, কিন্তু সবই শহরের অনুপাতে; একজন পোষ্টমাস্টার, একটি কেরানী ও দু'জন পিওন। পোষ্ট অফিসের পশ্চাদ্ভাগে পোস্টমাস্টার সপরিবারে বাস করেন।

বেলা আন্দাজ এগারটার সময় সুরনাথবাবু পোষ্ট অফিসে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন, পোষ্টমাস্টার খাতির করিয়া তাঁহাকে ভিতরে

লইয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে আহারাদির ব্যবস্থা পোষ্টমাস্টারবাবুর বাসাতেই হইল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সুরনাথবাবু ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার ধড়াচূড়া পরিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি খবর লইয়াছেন, যে তিনটি পোষ্ট অফিস পরিদর্শনে তিনি যাইবেন তাহার মধ্যে সবচেয়ে যেটি নিকটবর্তী সেটি বারো মাইল দূরে। কাঁচা-পাকা রাস্তা আছে। সুরনাথ 'তার' পিওনের সাইকেলটি ধার লইয়াছেন। আজ সন্ধ্যার সময় উদ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছিবেন, কাল সকালে সেখানকার পোষ্টঅফিস তদারক করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসিবেন, তারপর আবার অন্য পোষ্ট অফিসেব উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবেন।

সাইকেলের পশ্চাদ্ভাগে ছোট সুটকেসটি বাঁধিয়া সুরনাথ তাহাতে আরোহণের উদ্যোগ করিলে পোষ্টমাস্টার বলিলেন, 'এখান থেকে মাইল পাচ ছয় দূরে রাস্তা দু-ফাঁক হয়ে গেছে। ডান হাতি রাস্তা দিয়ে গেলে একটু ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু আপনি ওই রাস্তা দিয়েই যাবেন।'

সুরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, বাঁ-হাতি রাস্তাটা কী দোষ করেছে?'

পোষ্টমাস্টার বলিলেন, 'ও রাস্তাটা ভাল নয়,'

সাইকেলে আরোহণ করিয়া সুরনাথ বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি শহরের এলাকা পার হইলেন। তারপর অবারিত মুক্ত দেশ।

দেশটা বর্ণসংকর। অবিমিশ্র পলিমাটি নয়, আবার নির্জল মরুকান্তারও নয়। স্থানে স্থানে ঘন বন আছে, কোথাও নিস্তরুপাদপ শিলাভূমি, কোথাও নরম মাটির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুক্ষ পাথরের ঢিবি মাথা তুলিয়াছে। এই বিচিত্র ভূমির উপর দিয়া নির্জন পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে।

আকাশে পৌষ মাসের স্নিগ্ধ সূর্য, বাতাসে আতপ্ত আরাম। সুরনাথ প্রফুল্ল মনে মন্থর গতিতে চলিয়াছেন। মাত্র বারো চৌদ্দ মাইল পথ

সাইকেলে যাইতে কতই বা সময় লাগিবে।

সুরনাথের বয়স চল্লিশ বছর। মধ্যমাকৃতি দৃঢ় শরীর, মুখশ্রী মোটের উপর সুদর্শন। তিনি বিপত্নীক, বছর তিনেক আগে স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে। আবার বিবাহের প্রয়োজন তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন, কিন্তু বিপত্নীকত্বের ফলে যে ক্ষণিক স্বাধীনতাটুকু লাভ করিয়াছেন তাহা বিসর্জন দিতেও মন চাহিতেছে না।

তিনি যখন ছয় মাইল দূরস্থ পথের দ্বিভুজে পৌঁছিলেন তখন সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকখানি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সম্মুখে দুইটি পথ ক্রমশ পৃথক হইতে হইতে ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে ; মাঝখানে উঁচু জমি তাহার উপর তাল খেজুরের গাছ মাথা তুলিয়া আছে।

হঠাৎ কোথা হইতে ক্ষুদ্র একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল, চারিদিক অস্পষ্ট ছায়াছন্ন হইয়া গেল। সুরনাথ পথের সন্ধিস্থলে সাইকেল হইতে নামিলেন।

আগে পাশে নিকটে দূরে জনমানব নাই। আকাশ নির্মল, কেবল সূর্যের মুখের উপর একটুকরা মেঘ লাগিয়া আছে, যেন সূর্য মুখোশ পরিয়াছে, সুরনাথ একটু চিন্তা করিলেন। এখনো ছয় সাত মাইল পথ বাকি, আধঘণ্টার মধ্যেই সূর্য অস্ত যাইবে ; অন্ধকার হইবার পূর্বে যদি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে না পারেন, দিকভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

পোষ্টমাস্টার বলিয়াছেন বাঁ-হাতি রাস্তা ভাল নয়, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট। সুতরাং বাঁ-হাতি রাস্তা দিয়া যাওয়াই ভালো।

সুরনাথ সাইকেলে চড়িয়া বাঁ-হাতি রাস্তা ধরিলেন। পোষ্টমাস্টার মিথ্যে বলেন নাই, পথ অসমতল ও প্রস্তরাকীর্ণ, কিন্তু সাবধানে চলিলে আছাড় খাইবার ভয় নাই। সুরনাথ সাবধানে অথচ দ্রুত সাইকেল চালাইলেন।

সূর্যের মুখ হইতে মেঘ কিন্তু নড়িল না। মনে হইল মুখে মুখোশ আঁটিয়াই সূর্যদেব অস্ত যাইবেন।

মিনিট কুড়ি সাইকেল চালাইবার পর সুরনাথ সামনে একটি দৃশ্য দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। অস্পষ্ট আলোতে মনে হইল

যেন রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট কুটির দেখা যাইতেছে, দু'একটা আবছায়া মূর্তিও যেন সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

আরো কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পাশের দিকে চোখ ফিরাইয়া সুরনাথ ব্রেক্ কষিলেন। একটি ছোট মাটির কুটির যেন মন্ত্রবলে রাস্তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আশে পাশে অন্য কোন কুটির দেখা যায় না; এই কুটিরটি যেন গ্রামে প্রবেশের মুখে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

সুরনাথ রাস্তার ধারে যেখানে সাইকেল হইতে নামিলেন সেখান হইতে তিন গজ দূরে কুটিরের দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া একটি যুবতী বসিয়া আছে। সুরনাথের চোখের সহিত তাহার চোখ চুম্বকের মত আবদ্ধ হইয়া গেল।

চাষার মেয়ে! গায়ের রং মাজা পিত্তলের মত পীতাভ, দেহ যৌবনের প্রাচুর্যে ফাটিয়া পড়িতেছে: মুখের ডৌল দৃঢ়, তাহাতে প্রগলভতার সমাবেশ। মাথার অযত্নবিন্যস্ত চুলের প্রান্তে একটু পিঙ্গলতার আভাস, চোখের তারা বড় বড়। পরিধানে কেবল একটি কস্তাপাড় শাড়ি, অলঙ্কার নাই। সধবা কি বিধবা কি কুমারী বোঝা যায় না। তার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন আগুন রাঙা চুল্লীর দিকে চাহিয়া আছি।

"হ্যাঁগো, তুমি কোথায় যাবে? যুবতী প্রশ্ন করিল। দাঁতগুলি কুন্দশুভ্র, গলার স্বর গভীর ও ভরাট; কিন্তু কথা বলিবার ভঙ্গী গ্রাম্য।

সুরনাথের বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল। দীর্ঘকালের অনভ্যস্ত একটা অন্ধ আবেগের স্বাদ তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু তিনি লঘুচেতা লোক নন, সবলে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, 'রতনপুর'।

যুবতী দাওয়ার কিনারায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে প্রগল্‌ভতা ছাড়াও এমন কিছু আছে যাহা পুরুষের স্নায়ুশিরায় আগুন ধরাইয়া দিতে পারে। শেষে হাসি থামাইয়া সে বলিল, 'রতনপুর যে অনেক দূর, যেতে যেতেই রাত হয়ে যাবে, পৌঁছতে পারবে না।'

সুরনাথ রাস্তার দিকে চাহিলেন। দূর হইতে যে গ্রামের আভাস পাইয়াছিলেন সন্ধ্যার ছায়ায় তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। তিনি উদ্বেগ স্বরে বলিলেন, 'তাহলে গ্রামে কি কোথাও থাকবার জায়গা আছে?'

'এখানেই থাকো না।'

সুরনাথ চকিত চক্ষে যুবতীর দিকে চাহিলেন। যুবতীর দৃষ্টিতে দুরন্ত আহ্বান, আরো কত রহস্যময় ইঙ্গিত। সুরনাথের বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি শরীর শক্ত করিয়া নিজেকে সংবরণ করিলেন, একটু স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'বাড়ির পুরুষেরা কোথায়?'

যুবতী দূরের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া বলল, 'তারা মাঠে গেছে, সারা রাত ধান পাহারা দেবে। মাঠে ধান পেকেছে, পাহারা না দিলে চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে।'

সুরনাথ কণ্ঠের মধ্যে একটা সংকোচন অনুভব করিলেন, বলিলেন 'তা—যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই থাকব।'

যুবতী দশনচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া হাসিল, প্রায়ান্ধকারে তাহার হাসিটা তড়িদ্দীপালির মত ঝলকিয়া উঠিল। সে বলিল, 'তোমার গাড়ি দাওয়ায় তুলে রাখো। আমি আসছি।'

যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল, একটি মাদুর আনিয়া দাওয়ার এক-পাশে পাতিয়া দিল। এক ঘটি জল ও গামছা খুঁটির পাশে রাখিয়া বলিল, 'হাত মুখ ধোও। চা খাবে তো? আমি এখনি তৈরী করে আনছি।'

যুবতী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। সুরনাথ হাত মুখ ধুইয়া মাদুরে বসিলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। আলোর পীতবর্ণ ধারা দাওয়ার উপর আসিয়া পড়িল।

বাইরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। চরাচর গ্রাস করিয়া লইয়াছে। সুরনাথ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মানসিক অবস্থার বর্ণনা অনাবশ্যক। ব্যাধ শরাহত মৃগ, বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের মানসিক অবস্থা কে কবে বিবৃত করিয়াছে!

'এই নাও, চা এনেছি।' চা দিতে গিয়া আঙুলে আঙুলে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হইল—'আমি রান্না চড়াতে চললুম।'

সুরনাথ ক্ষীণস্বরে আপত্তি তুলিলেন, 'আমার জন্যে আবার রান্না কেন? ঘরে মুড়ি মুড়কি যদি কিছু থাকে, তাই খেয়ে শুয়ে থাকব।'

'ওমা মুড়ি মুড়কি খেয়ে কি শীতের রাত কাটে! রাত উপোসী হাতী টলে। তোমার অত লজ্জায় কাজ নেই, এক ঘণ্টার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে।'

যুবতী চলিয়া গেল। সুরনাথ চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন। পিতলের বাটিতে গুড়ের চা, কিন্তু খুব গরম। তাহাই ছোট ছোট চুমুক দিয়ে পান করিতে করিতে তাঁহার শরীর বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সুরনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন কুটিরের মধ্যে দুটি ঘর একটি রান্না ঘর, অপরটি বোধ হয় শয়ন কক্ষ। তিনি অনুমান করিলেন দাওয়ায় মাদুরের উপর তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইবে। সেই ভাল হইবে। কোন মতে রাত কাটাইয়া ভোর হইতে না হইতে তিনি চলিয়া যাইবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে যুবতী দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'ভাত বেড়েছি, খাবে এস।'

সুরনাথ উঠিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের ঠাণ্ডার তুলনায় ঘরটি বেশ উত্তপ্ত। পিঁড়ের সামনে ভাতের থালা, প্রদীপটি কাছে রাখা হইয়াছে। আয়োজন সামান্যই, ভাত ডাল এবং একটা চচ্চড়ি জাতীয় তরকারী।

সুরনাথ আহারে বসিলেন। যুবতী অতি সাধারণ গৃহস্থালির কথা বলিতে বলিতে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুরনাথ লক্ষ্য করিলেন, রান্না করিতে করিতে যুবতী কখন পায়ে আলতা পরিয়াছে।

যুবতী সুরনাথের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিতেছে, অথচ তিনি হুঁ হাঁ ছাড়া কিছুই বলিতেছেন না। বিপদের সময় যে ডাকিয়া ঘরে আশ্রয় দিয়াছে, খাইতে দিয়াছে, তাহার সহিত অন্তত একটু মিষ্টালাপ

করিবার প্রয়োজন আছে। তিনি শামুকের মত খোলের ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া বলিলেন, 'তোমার নাম কি?'

এক ঝলক হাসিয়া যুবতী বলিল, 'কামিনী'।

নামটা তপ্ত লোহার মত সুরনাথের গায়ে ছ্যাঁক করিয়া লাগিল। তিনি শামুকের মত আবার খোলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আহারান্তে সুরনাথ হাত মুখ ধুইলে কামিনী বলিল, 'পাশের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছি, শুয়ে পড় গিয়ে।'

সুরনাথের বুক ধড়াস করিয়া উঠিল। তিনি তোতলা হইয়া গিয়া বলিলেন, 'আমি—আমি বাইরে মাদুরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব।'

কামিনী গালে হাত দিয়া বলিল, 'ওমা, বাইরে শোবে কি! শীতে কালিয়ে যাবে যে! যাও, বিছানায় শোও গিয়ে।'

সুরনাথ কথা কাটাকাটি করিলেন না, কামিনী রাত্রে কোথায় শুইবে প্রশ্ন করিলেন না, দণ্ডাজ্ঞাবাহী আসামীর মত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। মেঝের উপর খড় পাতিয়া তাহার উপর তোষক বিছাইয়া শয্যা। সুরনাথ সুটকেস আনিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিলেন, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াই শয়ন করিলেন।

চোখ বুজিয়া তিনি পাশের ঘরে খুট-খাট ঠুম্-ঠাম্ বাসন-কোশনের শব্দ শুনিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনের উত্তাপ একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল।

চোখ বুজিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর তিনি আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ চট্‌কা ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন, কামিনী নিঃশব্দে কখন তাঁহার বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়াছে; তাহার মুখে বিচিত্র হিংস্রমধুর হাসি।

তিন দিন পর্যন্ত সুরনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন না তখন পোস্টমাস্টারবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কেবল সুরনাথবাবুর

জন্যে নয়, সেই সঙ্গে পোষ্টঅফিসের সম্পত্তি সাইকেলটিও গিয়াছে। পোষ্টমাস্টার পুলিশে খবর দিলেন।

পুলিশ খোঁজ লইল। সুরনাথের যে তিনটি পোষ্ট অফিসে যাইবার কথা সেখানে তিনি যান নাই। পুলিশ তখন রীতিমত তদন্ত আরম্ভ করিল।

সাতদিন পরে সুরনাথকে পাওয়া গেল। বাঁ-হাতি রাস্তায়একটিও কুটির নাই, সেই রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সাইকেলটা অনতিদূরে মাটিতে লুটাইতেছে তাহার পশ্চাতে সুরনাথের সুটকেস রহিয়াছে, সুটকেসের মধ্যে কাপড়-চোপড় সাবান মাজন বুরুশ সমস্তই মজুত আছে। কিছু খোয়া যায় নাই।

সুরনাথের দেহে কোথাও আঘাতচিহ্ন নাই। কিন্তু দেহটি প্রাচীন মিশরীয় 'মমির' মত শুষ্ক ও অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে, যেন রক্ত-চোষা বাদুড় দেহটা শুষিয়া লইয়াছে।

পুলিস হাসপাতালে লাশ চালান দিল। পোষ্টমাস্টার যখন সুরনাথের মৃত্যু-বিবরণ শুনিলেন তখন তিনি আক্ষেপে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা! ডাইনীর হাতে পড়েছিলেন! কামিনী ডাইনী এখনো তল্লাটে আছে, মায়া বিস্তার করে বেচারীকে টেনে নিয়েছিল। আমি ইন্সপেক্টববাবুকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, বাঁ-হাতি রাস্তা ভাল নয়। কিন্তু উনি শুনলেন না।'

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিরল ব্যাক্তিত্ব। জন্ম ৩০শে মার্চ ১৮৯৯ সালে বিহারের জৌনপুরে। মুঙ্গের স্কুল থেকে ১৯১৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই ১৯১৯ সালে বি. এ. পাশ করেন। ১৯২৬ সালে পাটনা থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিপূর্বে ১৯১৭-১৮ তে

'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কোরে' যোগদান করে মিলিটারী শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২৭ সালে ওকালতী ছেড়ে সম্পূর্ণত সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৮ সালে বোম্বাই থেকে হিমাংশু রায়ের আহ্বানে 'সিনারিও' লেখার কাছে সেখানে যান। ১৯৫২ সালে চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পুনায় পুণায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যান এবং সাহিত্যকমে মনোনিবেশ করেন। তাঁর 'ব্যোমকেশ' এবং বরদা অপূর্ব সৃষ্টি। গৌড়মল্লার তুঙ্গাভদ্রার তীরে, 'ঝিন্দের বন্দী উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। শরদিন্দুর 'জাতিস্মর', 'চুয়াচন্দন', 'বুমেরাং' প্রভৃতি গল্পসংগ্রহ 'বন্ধু', 'ডিটেকটিভ, প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। বাংলা ডিটেকটিভ গল্প ও রহস্য গল্পের ক্ষেত্রে শরদিন্দুর ভূমিকা অসাধারণ। অতিপ্রাকৃত এবং ভৌতিক গল্প রচনায় শরদিন্দু এক অনন্য স্বাদবৈচিত্র্য এনেছেন। তার অতিপ্রাকৃত রসপ্রধান গল্পসংকলন 'কল্পকুহেলী' বাংলা অতিপ্রাকৃত গল্পের ক্ষেত্রে স্বকীয় মর্যাদায় ভাস্বর। শরদিন্দুর গল্পে জীবন-বৈচিত্র্যের স্বাদ উচ্চাঙ্গের কাব্যিক ঐশ্বর্যে বিমণ্ডিত।

I don't believe in God, but I do believe in ghosts,

John Huston

'Ghost stories are as old and older than Literature'



সরোজকুমার রায়চৌধুরী

আমাদের ছেলেবেলার বাংলাদেশকে আজকে আর খুঁজে পাই না। তখন আমাদের গ্রামের চারপাশে যে বিস্তীর্ণ মাঠ তার ওপারে আমাদের চোখের দৃষ্টির বাইরে, ছিল রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানা, বুড়ো আঙ্গুলের মত ছোট ছোট বামন, জলপরী আর স্থলপরীদের দেশ। তখন কচুবনের নিচে যে প্রকাণ্ড কোলা ব্যাঙ মক্ মক্ করত, তার সঙ্গে যক্ষপুরীর রাজকন্যার যে আলাপ ছিল, এ নিয়ে আমাদের মনে কোন সংশয় ছিল না। বর্ষার অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টি ধারার তালে তালে ব্যাঙের ছাতার নীচে পরীদের নাচ—মায়ের কোলের কাছে শুয়ে আমরা স্পষ্ট শুনতে পেতাম। ঝড়ের হাওয়ায় বাঁশবনে যখন ঠকাঠক শব্দ হত, তখন ঘুম ভেঙ্গে যেত ;—স্পষ্ট বুঝতে পারতাম একানড়ে তার তালগাছের বাসা থেকে নেমে একটা পায়ে ঠক্ ঠক্ করে কি যেন খুঁজে বেড়াত। তেঁতুল অশ্বত্থের ডালে ডালে যে সমস্ত ছেঁড়া ন্যাকড়া ঝুলত, সেগুলো যে ভূত পেত্নী শাকচুন্নীদের পরিধেয় বস্ত্র, এ বিষয়েও আমরা সুনিশ্চিত ছিলাম। আর চাঁদনী রাত্রের আলো ছায়ায় কতদিন যে জটা ত্রিশূলধারী ব্রহ্মদৈত্যকে প্রায় প্রত্যক্ষ করেছি—তার আর ইয়ত্তা নেই।

বড় হয়ে তাদের কাউকেই আর কোথাও খুঁজে পাইনি। আমার জগৎ থেকে তারা আজ একেবারে নির্বাসিত। জানতে

কৌতূহল হয় তোমাদের জগতে আজও তারা আছে কি না? হাওয়ায় যখন তালের পাতা দুলে ওঠে, তোমরা তখন একানড়ের হাততালি শুনতে পাও? শুনতে পাও তারায় ভরা আকাশের নীচে শুয়ে রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়ার উড়ে যাওয়ার শব্দ?

জানি না। কিন্তু এমনিতর ছোটবেলায় নিজের চোখে যে ঘটনা একদিন দেখেছিলাম আজ সেই গল্প শোনাব। বিশ্বাস করতে পার কোরো, না পার কোরো না।

আমার বয়েস তখন নয় দশের বেশী নয়। কত রাত্রি জানি না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ন'কাকার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল: খোকা, শিগগীর ওঠ। তাঁতি বাড়িতে ভূত তাড়ানো হচ্ছে।

তাঁতিবাড়ি! ভূত! আমার সমস্ত শরীর কি একটা উত্তেজনায় ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। এক হাতে কোমরের কাপড়ের কসি ধরে এবং অন্য হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এসে ন'কাকার আঙুল ধরলাম। বললাম—চল।

বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। নদীর ধারের তেঁতুল বন থেকে শন্ শন্ আওয়াজ আসছে। থেকে থেকে শুকনো পাতা নড়ছে খড়খড় করে। দূরের বাঁশবনে জোনাকীরা যেন আলোর মেলা বসিয়েছে। তাতে যেন এদিকের অন্ধকার আরও বেড়ে গেছে। আর আকাশ ভরা তারা, লক্ষ লক্ষ তারা।

তাঁতিবাড়ি দূরে নয়। রামহরি তন্তুবায়কে আমরা জ্যাঠা বলতাম। হাড় বের করা লিকলিকে পাড়াগাঁয়ের, কালো চেহারার লোকেরা যেমন তেল মেখে চুকচুকে হয়ে থাকে, মনে হয় গায়ে মাছি বসলে পিছলে যাবে, রাম জ্যাঠা তেমন থাকতো না। সমস্ত সময়ই তার গায়ে যেন খড়ি উঠতো, মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সামনের দুটো দাঁত ছিল ভাঙা। কর্কশ ভাঙা গলায় হাঁ করে যখন সে হাসতো, আমরা দিনের বেলাতেও ভয় পেয়ে যেতাম।

সেই রাম জ্যাঠার বাড়িতে ভূত?

ন' কাকা বললেন, বাড়িতে নয় সেই রামকেই ভূতে পেয়েছে। ভূত ঠিক নয় ডাইনীতে। একটু থেমে বললেন, ওর দশ বারো দিন থেকে জ্বর হয়েছিলো। ডাক্তার বলেন, নিউমোনিয়া। কিন্তু সেটা নাকি জ্বরও নয়, নিউমোনিযাও নয়! আসলে তাঁকে ডাইনীতে পেয়েছে। ওঝা এসেছে ডাইনীটাকে ছাড়াতে।

ডাইনী সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল, জীর্ণ দেহ নিরানব্বুই বছরের একটা থুরথুরে বুড়ী। মাথায় বিঘৎ পরিমাণ শনের নুড়র মতো সাদা চুল কুঁজো হয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে ঘুরে বেড়ায।

ভয়ে তখন আমার বুকের ভিতরটা কাঁপছে কিন্তু সেই সঙ্গে কৌতূহল হচ্ছে প্রবল। ন' কাকার আঙুলটা আরও জোরে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, তাকে দেখা যাচ্ছে?

—কাকে?

—সেই ডাইনীটাকে?

ন' কাকা হো হো করে হেসে উঠলেন: দূর পাগল। ডাইনী এখনও দেখা যায়? ভয় আমার যত বেশীই হোক, ডাইনীটাকে দেখতে পাওয়া যাবে না শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ক্ষুন্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কি করে বোঝা গেল ওটা ডাইনী?

গম্ভীর কণ্ঠে ন' কাকা বললেন, ওদের দেখা যায় না। কিন্তু যারা ওঝা তারা বুঝতে পারে। মন্তর জানে কিনা।

তা হবে।

কিন্তু তখন আমরা এসে পড়েছি দু'পাশের দুই এঁদো ডোবার মাঝখানে সংকীর্ণ পথটার কাছে। এতই সংকীর্ণ যে দুজনে পাশাপাশি যাওয়া যায় না। এইখানটায় এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। চিন্তার কারণ ছিল। একজনকে আগে, একজনকে

পিছনে যেতে হবে। তাঁতিবাড়ি থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসছিল। যদি আমি আগে যাই, ওঝার তাড়া খেয়ে ডাইনীটা ছুটে এসে, আমার নাকটা টেনে ধরে, তাহলেই গেছি। আবার পিছনে একলা ছেলেমানুষ পেয়ে ডাইনীর জ্ঞাতী—গোষ্ঠী,—তারাও নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও রয়েছে,—যদি আমার ঘাড়ে শনের নুড়ি দিয়ে সুড়সুড়ি দেয়, তাহলে এই শীতে, ডোবার জলে ডুবে মরা ছাড়া আমার উপায় থাকবে না।

ন' কাকাকে বললাম, কোলে কর।

তিনি নিশ্চয়ই আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন। কিছুই না বলে,—কিংবা সেই অন্ধকারে নিঃশব্দে হেসে থাকলেও টের প্যাইনি। কোলে করে জায়গাটা পার করে দিলেন।

ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি, বহু লোক জড় হয়েছে। প্রকাণ্ড বড় উঠান অন্ধকারে থমথম করছে। তার মাঝখানটা খালি, বোধ করি ভয়ে,—কিন্তু চারিধারে বহু লোক গুচ্ছে গুচ্ছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কি যেন একটা ভয়ংকর কিছুর প্রতীক্ষা করছে। অন্ধকারে তাদের চেনা যাচ্ছে না, তাদের ঘেঁসাঘেঁসি দাঁড়ানো, ফিসফাস কথা সেইরকমই একটা আভাস দিচ্ছিল। নিজের এক কুঠুরী উঁচু দাওয়া-ওলা ঘরের দাওয়ায় রাম জ্যেঠা একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসে। কিন্তু এ যেন হাসি খুশি রঙ্গপরায়ণ রাম জ্যেঠাই নয়। দূরে এক কোণে একটা বাঁশের খুঁটির কাছে একটা কুপী জ্বলছিল। তার থেকে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই উদ্গীর্ণ হচ্ছিল বেশী। মধ্যরাত্রের হাওয়ায় সেই কম্পিত স্বল্পালোকে রাম জ্যেঠার ঘনকৃষ্ণ শীর্ণ দেহ এবং মুখের স্থানে স্থানে এসে পড়েছিল। জবাফুলের মত লাল দুটো চোখ যেন গভীর কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। থেকে থেকে অশ্রাব্য ভাষায় রাম জ্যেঠা কাকে যে গালি গালাজ করছিল, বুঝতে পারছিলাম না। তখন তার মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছিল। পরক্ষণেই ক্লান্তিতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এলিয়ে

পড়ছিল। ওঝাকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু গালাগালি নিঃসন্দেহে তাকেই দিচ্ছিল। যাই হোক, রাম জ্যেঠাকে সব শুদ্ধ মিলিয়ে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।

আমি আর ন'কাকা গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, ওদিকের কোণের ছোট কুল গাছটার অদূরে। এদিকটা একেবারে নির্জন বললেই হয়। তখন বুঝিনি কেন। পরক্ষণেই কার চাপা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম।

ঠাহর করে দেখি কুল গাছটার নীচে অন্ধকারে দুটি লোক বা ঘর মতো থাবা গেড়ে যেন শিকারের প্রতীক্ষায় বসে!

আমি ভয়ে কাকাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম! মনে হোল, তিনিও যেন চমকে উঠেছিলেন। চাপা গলায় কিছুটা আমাকে সাহস দেবার জন্যেও বললেন ওরাই ওঝা বোধহয়।

সঙ্গে সঙ্গে কুলগাছটার নীচে মন্ত্রের অস্ফুট গুঞ্জন উঠলো। প্রথমে ধীরে ধীরে তারপরে আরও স্পষ্ট এবং দ্রুতবেগে। এবং প্রায় তখনই সাকরেদ ওঝা যেন অন্ধকার থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে মাঝ উঠানে দাঁড়িয়ে উঠানময় ছটফট করতে লাগল। তাকে দেখামাত্র বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো রাম জ্যেঠাও সোজা হয়ে বসলো। রাগে তার দাঁত কড়মড় করতে লাগলো এবং ফোকলা দাঁত বের করে যখন হাঁফাতে লাগলো, মনে হোল এখনই লাফিয়ে নেমে সে বোধ করি সাকরেদ ওঝাকে গিলেই খেয়ে নেবে।

তখনই আরম্ভ হোল গালিগালাজ, উভয় পক্ষেই। রাম জ্যেঠা যে গালি দেয়, সে তো আমাদের অতি পরিচিত গ্রাম্য গালি, সাকরেদ ওঝা যে মন্ত্র পড়ে, ছন্দ থাকলেও, তাও তাছাড়া আর কিছুই নয়।

আধঘণ্টা কি কতক্ষণ হবে কে জানে উভয় পক্ষে এই যে কটূক্তির কুস্তি চললো, যদিও তা শারীরিক কুস্তি নয় তবুও আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, রামজ্যেঠার কাছে এই সাকরেদ ওঝা

নিতান্তই দুর্বল। সে বিষয়ে আমরা আরও নিঃসংশয় হলাম যখন এই রকম বাক-যুদ্ধ চলতে চলতে হটাৎ এক সময় সাকরেদ ওঝা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলো এবং রাম জ্যাঠারও তড়পানি যেন বেড়ে গেল

ভয়ে আমাদের সকলেই তখন কাটের মতো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে সকলেই আরও পিছিয়ে গেল। ন'কাকাও পিছনের ভাঙ্গা পাঁচিলটার দিকে চেয়ে দেখলেন, তেমন তেমন কিছু ঘটলে আমাকে কোলে নিয়ে ওই পথে লাফ দিয়ে পালাতে পারবেন কি না।

আমার তো তখন কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কারণ আমি নিশ্চয় বুঝছিলাম, শুধু ন'কাকা কেন, এখানে যারা সমবেত হয়েছে তাদের কারও সাধ্যি নেই পালায়।

সকলেরই পা মাটির সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেছে। নিশ্চয় বুঝেছিলাম, এখনই রাম জ্যাঠার দেহে যে ডাইনী আশ্রয় নিয়েছে সে এসে সমবেত প্রত্যেকটি লোকের ঘাড ধারে ধারে মট্‌কে ভেঙ্গে আবারওই ছেঁড়া মাদুরে বসে বিজয়োল্লাসে হাঁফাতে থাকবে। সেটা অবশ্য আমরা দেখতে পাব না।

এই রকম যখন অবস্থা তখন দেখলাম, কুলগাছের নিচে থেকে আরেকজন শান্ত গম্ভীর পদক্ষেপে সাকরেদের পিছনে এসে দাঁড়'লো। তার কাঁধে হাত রেখে গম্ভীর গলায় বললে, ভয় কি! সঙ্গে সঙ্গে সাকরেদটি ঠাণ্ডা হোল, রামজ্যেঠাও যেন থমকে চুপ করে গেল। শুধু বড় বড় চোখে নিঃশব্দে লোকটির দিকে চেয়ে রইল।

আমরাও তখন যেন পাথর হয়ে গেছি। শরীরে রক্ত চলাচল বোধহয় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

লোকটিকে অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। কুপীর আলোয় এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, লোকটি দীর্ঘচ্ছন্দ ঋজু দেহ।

মাথায় বড় বড় চুল চূড়া করে বাঁধা। মুখের পাকা দাড়ি বুক পর্যন্ত ঝুলছে। গায়ে একটা আলখাল্লা।

বাঁ হাতে একটা হাতলওলা ধুনুচিতে গণগণ করছে কাঠের আগুন। আলখাল্লার ওপরে কোমরে একটা গামছা বাঁধা, তার কোঁচরটা কিসে যেন ফুলে রয়েছে।

লোকটা স্থির দৃষ্টিতে রাম জ্যেঠার দিকে চেয়ে রইল। রামজ্যেঠাও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ লোকটা তার মোটা গলায় একটা বিকট হেসে উঠলো যে, শুধু আমরা নই জ্যেঠা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো।

—আমাকে চিনিস? রামজ্যেঠাকে জিজ্ঞাসা করলে লোকটা।

—না চিনি না, যা। - রামজ্যেঠা যেন মরিয়া।

—এইবারে চিনবি।

বলেই লোকটা সাকরেদকে বাঁ হাতে ঠেলে কুলগাছের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে ধুনুচটা উঁচু করে রায়বেঁশের মতো চক্রাকারে নৃত্য করতে লাগলো। মনে হোল না লোকটি বুড়োমানুষ।

ঘোরে আর মন্ত্র পড়ে। ঘোরে আর মন্ত্র পড়ে। হঠাৎ এক সময় মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে লোকটি হুঙ্কার দিলেঃ সামলা এইবারে।

বলেই গামছার কোঁচড় থেকে এক মুঠো ধূপ নিয়ে ছুঁড়ে দিলে ধুনুচির গনগনে আগুনের দিকে। এক ঝলক আগুনের ফুলকির মতো সেই ধূপ ছুটলো রামজ্যেঠার দিকে।

অট্টহাস্য করে রাম জ্যেঠাও সেই আগুনের বাণ গিলতে লাগলো হাঁ করে। আগুনের স্ফুলিঙ্গের আভায় তার মুখ বিবরটা সগু কাটা ছাগলের গর্দানের মতো লাল দেখাচ্ছিল। আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম।

একবার। ... দু'বার... এবং বোধহয় আরও একবার...

তারপরে বেত খাওয়া কুকুরের মতো রামজ্যেঠা আর্তনাদ করে উঠলো। সেই আর্তনাদ অন্ধকার নিশীথ রাত্রের বুক চিরে যেন আকাশে উঠলো এবং সেখান থেকে ফিরে আমাদের শিরা-উপশিরায় যেন বরফের প্রবাহের মতো বয়ে গেল।

রাম জ্যেঠা চিৎকার করে উঠলো: আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও।

—তুই কে বল?

—রঙ্গিনী।

—কোথায়, থাকিস্?

—ন্যাড়া বটগাছের ডালে।

—যাবি? না, আরও বাণ ছুঁড়ব?

রাম জ্যেঠা আবার আর্তনাদ করে উঠলো: যাব, যাব।

—তাহলে এই চটিটা মুখে করে নিয়ে যা।

তাই হোল। ওঝার চটিটা মুখে নিয়ে হামা দিয়ে রামজ্যেঠা সদর দরজা পর্যন্ত গিয়েই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

তারপরে?

তারপরে কি হোল তা আমার পক্ষে বলা কঠিন। কারণ আমি নিজেও সেই সঙ্গে বোধ করি সংজ্ঞা হারিয়েছিলাম। জ্ঞান যখন হোল, তখন বাড়িতে মায়ের কোলে শুয়ে। তখন ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই।

কিন্তু আজও যে প্রশ্ন আমার মনে ওঠে সে হচ্ছে এই যে, এর কিছুদিন পরে রামজ্যেঠা সত্যই ভালো হয়ে উঠলো। কিন্তু এই ঘটনার কিছুই তার মনে নেই। কি যে হয়েছিল কিছুই বলতে পারে না।

স্বীকার করলাম, এর সমস্তই বুজরুকি। কিন্তু রামজ্যেঠা সেরে উঠলো কি করে?

বিজ্ঞানে হয়তো এর অর্থ পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি জানি না।



নিশীথ রাতের হাসি

অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

বিন্দু যেন বিদ্যুৎ বেগে এতটা পথ চলে এসেছে। এখন ট্রেনের কামরায় বসে ভাবতে ওরই অবাক লাগছে। শনিবার কলেজে মাত্র দু'ঘণ্টার ক্লাশ ছিল। ছুটতে ছুটতে ফিরে এসেছে মেসে। আগে থেকে ম্যাটিনী শোর টিকিট কেনা ছিল। 'ওথেলো' দেখবার একটি সুপরিকল্পিত আয়োজন ছিল বন্ধুদের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলায় ছিল কলেজের প্রীতি সম্মেলন।

কিন্তু কোন কিছুতে যোগ দেওয়া ওর কপালে নেই। ওই যে কাব্যের ভাষায় যাকে বলে 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত'—সেই জাতীয় একটি বেমক্কা রকম কাণ্ড ঘটে বিন্দুর সব কিছু প্ল্যান ওলট-পালট করে দিল আর সত্যি কথাই তো! দেশ থেকে ওই রকম একটি টেলিগ্রাম এলে হাত পা আপনা থেকেই পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায় ওর বাবার নাকি শক্ত অসুখ—এক্ষুণি বাড়ি রওনা হতে হবে। টেলিগ্রামটা করেছেন—ওর পাড়া সম্পর্কে বিনোদ কাকা। সত্যি একটা বাড়াবাড়ি কাণ্ড না হলে বিনোদ কাকা কখন এভাবে টেলিগ্রাম করে বসতেন না। এই তো সেবার ওর মার সাঙ্ঘাতিক বসন্ত হয়েছিল। তবু তিনি বিন্দুকে খবর দিতে দেন নি। পাড়ার ছেলেরা পালা করে দেখা শোনা করেছে। বিনোদ কাকা নিজে সব সময় খবরাখবর নিয়েছেন; ডাক্তার ডাকা ওষুধ আনার ব্যবস্থা করেছেন, প্রয়োজন মত রাত জেগেছেন, তবু ওর পড়ার ক্ষতি হবে বলে কাউকে খবর দিতে দেন নি। কলেজের ছুটি হলে বাড়ি গিয়ে মাকে দেখে

আঁৎকে উঠেছিল। সমস্তটা মুখে একেবারে বিশ্রী রকম বসন্তের দাগ হয়েছে। তার মাযের অমন সুন্দর দুধে আলতার মতো রং ·· তা যেন জলে কালো হযে গিয়েছে। এই বয়সেও বিন্দু মায়ের বুকে মুখ লুকিযে কান্না চেপে রাখতে পারেনি।

মা ওর চুলে আঙুল চালিযে ঠাণ্ডা করে বলেছিলেন, "দূর পাগলা। বুড়ো ছেলে বুঝি এমনি কাঁদে? আমি যদি তোর মেয়ে হতাম ত' ভাবনার কারণ ছিল। এই বিচ্ছিরি মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে দিযে পারতিস নে। সারা জীবন গলায ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াতে হত।" সেদিন মাযের মুখের হাসিও কিন্তু কান্নার মত শুনিয়েছিল।

গাড়ির দোলানির যেন বিরাম নেই—ওর ভাবনার তেমনি শেষ নেই মাত্র দু'খানি ধুতি নিয়ে সে কি ভাবে ছুটে এসেছে······ তারপর ঠেলাঠেলি মারামারি করে টিকিট কিনে ট্রেনের কামরার মধ্যে ঢুকেছে, সে কথা ভাবতে সত্যি অবাক লাগে।

এই দিন দুয়েক আগেও ত' সে ছোট বোন সিন্ধুর একখানা চিঠি পেয়েছে। তাতে বাড়িতে অসুখ বিসুখের কোন উল্লেখই নেই। বরঞ্চ বুধি গাই, বাঘা কুকুর, মেনী বিড়াল, আর কথা-সর্বস্ব কাকাতুয়ার কুশল সংবাদই ছিল। হঠাৎ এই দু'দিনের মধ্যে বাবার এমন কি শক্ত অসুখ হল—যার জন্য বিনোদ কাকা টেলিগ্রাম করতে বাধ্য হলেন?

বিন্দুর মনে শুধু একটি প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল—বাড়িতে পৌঁছে সে তার বাবাকে দেখবে ত?

রেল গাড়ির ধোঁয়ায় ওর ভাবনা চিন্তার সুতোগুলি কেবলই যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ মনে পড়ল, ছোট বোন সিন্ধুর চিঠিতে আবদার ছিল, এবার বাড়ি যাবার সময় চুলের লাল সিল্কের ফিতে নিয়ে যেতে হবে। এত ছুটোছুটিতে কি ছাই মনে থাকে? ভালো কথা, একটা স্টেশনে গাড়ি থামলে কোনো ফিরিওয়ালার কাছে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

কিন্তু ঝিঁক্‌য়ালার জন্য অপেক্ষা করতে হোল না। একজন ক্যান্‌ভাসার এসে ঢুকলো। তার বাক্সে না আছে এমন জিনিষ নেই। দু' ... বেছে নিলে—সিন্ধুর জন্য লাল সিল্কের ফিতে আ ... তরল আলতা। ওর এক ... দি এখন ও ... র চেনা অঞ্চলে। তাঁর জন্যে কিছু হাতে করে না নিলে স ... বিন্দু। ওই

ক্রমে ... র রাস্তার ওপর ... াড়ির যাত্রীও একে একে কমতে থাকে। ... আজ। ... র কাছে তারা সত্যি ভাগ্যবান। ... ইবার ... শেষ ... পৌঁছে গেছে। মায়ের হাতের রান্না ... কি ... নিয়ে খাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। বিন্দুর খিদে ... পা ... ও কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করছে না। পেছন দিকে হেলান ... খ বুজেছে বিন্দু। গাড়ির ঝাঁকুনিতে মাথাটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলছে। কামরার ভেতর লোকের কথার কচকচানি বন্ধ হয়ে গেছে। দু'তিন জন লোক যা দূরে দূরে বসে আছে তাদেরও চোখ ঢুলে এসেছে। হঠাৎ কানের কাছে কে ফিসফিস করে বল্লে, আমাদের দেখতে আসছিস খোকা? আমরাও যে তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি।"

চমকে উঠল বিন্দু! ঠিক ওর মায়ের গলা। মা ওকে খোকা বলে ডাকেন।

নাঃ, ও কিছু নয়। হয়ত নিজের অজান্তে মা—বাবার কথা বেশি করে ভাবছে, তাই ওই রকম কিছু শুনে থাকবে।

আর একটা স্টেশনে গাড়ি থামতে খাবারওলা এলো খাবার বেচতে; কিন্তু কিছু মুখে দিতে মন চায় না। যদিও অনেক রাত্তিরে গাড়ি পৌঁছুবে ওদের স্টেশনে...তবু কি জানি কেন, বিন্দু পেটের খিদেকে মোটেই আমল দিলে না।

দুপাশে শুধু রাশি রাশি অন্ধকার কোথাও জোনাকীর ঝাঁক··· নাম না জানা পাখির একটা আওয়াজ, ট্রেনের বাঁশী ধোঁয়ার একটা

উৎকট গন্ধ···এরই ভেতর দিয়ে কখনো ঘুমিয়ে, খনো তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে বিন্দু বাকি সময়টা কাটিয়ে দিলে।

গাড়ি যখন ওদের স্টেশনে গিয়ে ... ...বিধেই
ছুটো। এর পর আছে ক্ষেতের আ... ...
দ্বাদশীর চাঁদ মাথার ওপর। পু... ...রাত্তিরে আপনার ঘরের বার
আবছা ভাব। সেই চাঁদও ... চলুন, আপনাকে আমি ধরে
সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে ... ...শ, "না-না আমায় ধরে নিয়ে যেতে হবে
ঘোমটা পরছে আবার ... ...
... কেউ গায়ে আঙুল

কুয়াসা নয়, অথচ কেমন যেন ... উঠল! চল. তোর মা
মাঠখানা জুড়ে! তাড়াতাড়ি যেতে ... নিয়ে ঠক-ঠক করছে
মাঝামাঝি ধরে একটি পায়ে-চলা পথ ...
চলবার পর ওর মনে হল—কে যেন পে... ...র চলে গেল।
পায়ের অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিনা জোর... তার সঙ্গে
না, কিন্তু বেশ অনুভব করা যায় যে, একটি লোক তা... কাবে এগিয়ে আসছে। দৃষ্টি তার ঠিক ওর পিঠের ওপর। ও যা হঠাৎ থেমে যায়—তবে পেছনকার লোকটিও দাঁড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তাকালে পরে চোখে পড়ে না।

বিন্দু বেশ বুঝতে পারলে যে, এত রাত্তিরে একা একা পথ চলছে বলেই ওর মনে ভয় বাসা বেঁধেছে। ভয়কে তাড়াবার ওষুধও বিন্দুর জানা আছে। সে বিকট গলা ছেড়ে গান ধরলে। সুকণ্ঠ বলে বিন্দুর খানিকটা সু-নাম ছিল। কিন্তু আজ এ কি কাণ্ড ঘটছে? গলাটা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে আসছে কেন? মনে হচ্ছে, বেশ খানিকটা শ্লেষ্মা জমেছে কণ্ঠনালির ভেতরে। কিছুতেই সেটাকে দূর করা যাচ্ছে না। গলা খুলে গান গাইতে পারলে আর ভয়টা কোথায়? কিন্তু কিছুতেই সে গলাটা আগেকার মতো হাল্কা করতে পারছে না।

যাই হোক—থামা আর চলা, গান গাওয়া আর কান পেতে

কিছু শোনা—এইভাবে মাঠটাকে পেরুনো গেল। ওই ত' সামনে ক্যান্‌ভাস...দের নাট-মন্দির আর ধানের গোলা, ওরই পাশ দিয়ে ...তে হবে ...সেখান থেকে ওদের বাড়ি আর বেশি দূরের নেই। ...

ফিতে অ...

এখন ও... র চেনা অঞ্চলে। ...সে পড়েছে তাই গলার গুণ-গুণা'ন নিলে সা... বিন্দু। ওই ...র বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়ির ঠিক ক্রমে... র রাস্তার ওপব ...াড়ির ...তেঁতুল গাছটি। কিন্তু কি থাকে। ... আজ। গাছের পাতাট অব... নড়ছে না। তা হলে ...এইবার ... শেষ আগ্রহ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে এগিয়ে যায় সে ...

কি... তেঁতুল গাছটার ঠিক নীচে যেখানে ...টি ... কিছু খো...জমাট বেঁধেছে—সেইখানে দাঁড়িয়ে আছেন ... বুজেছে ...ই বাধানো লাঠিটা। ওরই ওপর দেহের ভর ...মের মতো ...এক দৃষ্টে তাবই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

বন্ধ হ...রা অবাক হয়ে গেল বিন্দু। ছুটে গেল ওঁর কাছে, বল্লে, আপনি এত রাত্তিরে এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আপনাব অসুখের টেলিগ্রাম পেয়েই তো আমি ছুটতে ছুটতে আসছি—"

ক্ষীণ কণ্ঠে বিন্দুর বাবা বল্লেন, "তা জানি বাবা। বিনোদেব যেমন কাণ্ড! সামান্য কি একটু অসুখ করেছে—আর অমনি তোর বিনোদ কাকা এক টেলিগ্রাম করে বসল। আমরা সবাই ভেবে বাঁচিনা। আজই যে তুই ছুটতে ছুটতে আসচিস্ সে ত জানা কথাই। সেই সন্ধ্যে থেকে তোর মার মুখে আর অন্য কথা নেই! খোকা নিশ্চয়ই আসছে আজ আমাদের দেখতে। তাইত আগে বাড়িয়ে তোকে নিতে এসেছি—"

ওর বাবার কথা শুনে ভারী রাগ করল বিন্দু। উত্তর দিলে "আপনার ও ত" কম বাড়াবাড়ি নয়! আমি আসছি—তাই বলে আপনি এত রাত্তিরে অন্ধকারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন? অসুস্থ শরীর...একটা লণ্ঠনও ত' হাতে করে আনতে হয়।"

—"না—না, আবার লণ্ঠন কিসের জন্যে? এই ত দিব্যি আচ্ছা চাঁদের আলো। পথ চলতে কোনো অসুবিধেই হয় না।"

বিন্দু ব্যস্ত হয়ে বল্লে, "না-না এত রাত্তিরে আপনার ঘরের বার হওয়া একেবারেই উচিত হয়নি। চলুন, আপনাকে আমি ধরে নিয়ে যাচ্ছি—"

বাবা আৎকে উঠে বল্লেন, "না-না আমায় ধরে নিয়ে যেতে হবে না। বাতের ব্যথায় এমন কষ্ট পাচ্ছি বাবা যে, কেউ গায়ে আঙুল ঠেকালেও মনে হয় হাডগুলো কন্‌কন্ করে উঠল! চল্, তোর মা ভারী ব্যস্ত হয়ে আছে। আমি আমার লাঠি নিয়ে ঠক্-ঠক্ করতে করতে দিব্যি যেতে পারবো।"

মাকে দেখ্‌বার জন্যে বিন্দু ছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেল। বাক্‌ যাঁর অসুখের কথা শুনে ভাবনার অন্ত ছিল না—তাঁর সঙ্গে ত আগেই দেখা হয়ে গেল।

মা ওরই অপেক্ষায় শোবার ঘরের দাওয়ায় বসেছিলেন। বল্লেন, 'বসবি আয়। রাস্তায় কোনো কষ্ট হয়নি ত'?"

"না—না, কষ্ট আর কি? টেলিগ্রাম পেয়েই তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে হল—তাই তোমার শাড়ী আনতে পারিনি!"

"তাতে আর কি হয়েছে? এখন আর আমার শাড়ীর দরকার নেই। আমার গয়নাগুলি একটা ন্যাকড়ার পুঁট্‌লিতে বেঁধে চালের জ্বালার মধ্যে গুঁজে রেখে দিয়েছি। কলকাতায় নিয়ে যাস। আমার বৌমা এলে তার হাতে দিস।"

বিন্দু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলে, "কি আজে বাজে কথা বলছ মা? তোমার গয়না আমি কলকাতায় নিয়ে যাব কেন? কিন্তু আমার যে ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে। ঘরে কিছু নেই? চিড়ে, মুড়কি, নারকেল নাড়ু?"

মা খুশি হয়ে বল্লেন, 'খাবি? তাই বল না। তুই যা-যা

ভালোবাসিস—দেবো। অ বৌমা, এই দাওয়াতেই বিন্দের একটা ঠাঁই করে দাও।"

বিন্দু শুধোলে, "কেন মা, ঘরের ভেতরে গিয়ে খাবো না? বৌদি, সিন্ধু পোড়ারমুখা কোথায় গেল? আলো জ্বালতে বলো না ওদের। ভালো করে তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছিনে।"

মা উত্তর দিলেন, "আজ ঘরে একটুও কেরোসিন নেই বাবা! ওদের যেমন সংসার করা। আগের থেকে কিছুতেই বলে না—তা আজকের মত—এই দাওয়াতে বসেই খেয়ে নাও,—চাঁদের আলো আছে, অসুবিধা হবে না।"

হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, বৌদি ওর সামনে দাঁড়িয়ে। নানা রকম তরকারী, ভাত—ডাল সব আসনের কাছে সাজানো।

এত সব খাবার বৌদি আনলে কখন? মায়ের সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে এদিকে খেয়ালই করেনি!

কিন্তু বৌদির মুখে এত বড় একটা ঘোমটা কেন?

বিন্দু সুটকেস থেকে আলতাটি বের করে বল্লে, "বৌদি এই তোমার তরল আলতা।"

বৌদি মৃদুস্বরে উত্তর দিলে, "ওই দাওয়ার ওপরই রাখো ঠাকুরপো! আমি পরে এসে তুলে রাখবো'খন।"

মা বল্লেন, "আর দেরি করিস নে, এইবার খেতে বোস।"

বিন্দুর সত্যি খুব ক্ষিদে পেয়েছিল আর দ্বিরুক্তি না করে আসনের ওপর গিয়ে বসল। তারপর অবাক হয়ে বল্লে, "এ তুমি করেছ কি মা? আমি যা যা ভালোবাসি সব রান্না করে বসে আছ? বাড়িতে এমন অসুখ বিসুখ চলছে,—তোমার নিজের শরীরটাও ত—তেমন ভালো দেখ্‌ছিনে! তার মধ্যেও এত রান্না করলে কখন?

মা ধমক দিয়ে উঠলেন, "তুই কথা বলবি না খাবি? আমি কিন্তু খুব বেশিক্ষণ আর বসতে পারবো না।"

—"কেন তোমার শরীরটা খারাপ লাগছে বুঝি? তা হলে তুমি আর রাত কোরো না, শুয়ে পড়ো গে—"

ওর বাবার খক্ খক্ কাশি পেছনে শোনা গেল। তাকিয়ে দেখলে, তিনিও, দাওয়ার ওপর এসে বসেছেন। বিন্দু বল্লে, "আপনি শুয়ে পড়ুন বাবা। আবার রাত জেগে অসুখ বেড়ে যাবে।"

—"না—না, তোর সঙ্গে জরুরী কয়েকটা কথা রয়েছে যে!" হাঁপাতে হাঁফাতে ওর বাবা উত্তর দিলেন।

বিন্দু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলে, "কথা ত' আর পালিয়ে যাচ্ছে না বাবা। কাল সকালে ধীরে সুস্থে শোনা যাবে।"

ওর বাবা কোনো অনুরোধই শুনলেন না, চুপচাপ দাওয়ার ওপর বসে কেবলি মাথা নাড়তে লাগলেন।

বিন্দু বুঝলে, তার খাওয়া শেষ না হলে কেউ নড়ছে না। তাই তাড়াতাড়ি ভাত ভেঙ্গে নিলে। তারপর বল্লে, "সত্যি, তুমি কি কাণ্ড করেছ বলত মা! আমি যা যা খেতে ভালবাসি সব জুটিয়েছ এক সঙ্গে! ঢেঁকি শাক, ছাঁচিকুমড়োর তরকারী, এঁচোড়ের ডালনা ...আমাদের পুকুরের মাছ বুঝি? ঘরে পাতা দৈ? পায়েস,—তোমার হাতে তৈরী ছানার সন্দেশ তুমি কি শেষ খাওয়া খাওয়াচ্ছ নাকি আমাকে?"

মা বলে উঠলেন, 'ষাট! ষাট। ওকথা বলতে নেই।"

ওদিকে বাবাও যেন অধৈর্য হয়ে উঠেছেন! —"আমার কথাগুলি আগে মন দিয়ে শোন্। ওপাড়ার শিকদার বাড়ীর ত্রৈলোক্য শিকদার দিন পনেরো আগে শ'পাঁচেক টাকা ধার নিয়েছে। কোনো লেখাপড়া নেই। ওর বাবার শ্রাদ্ধে হঠাৎ আটকা পড়ে গিয়েছিল। সিন্দুক থেকে টাকাটা বের করে দিলাম। খেয়াল রাখিস ভুলে যাসনে যেন!"

হেসে উঠে বিন্দু জবাব দিলে, "ওসব টাকা-কড়ি আপনি খেয়াল

রাখুন গে। আমি কোনো দিন খেয়াল রেখেছি—না, আমাকে কখনো খেয়াল রাখতে বলেছেন?”

—“না—রে-না। অমন করে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিসনে। পরে বুঝতে পারবি সব।”

এমন সময় সিন্ধু সেখানে এসে হাজির হল। কিন্তু ওকে ঘরের ভেতর থেকে কিংবা দাওয়া ধরে হেঁটে আসতে দেখলে না ত' বিন্দু! ও যেন একেবারে মাটি ফুঁড়ে বেরুলো!

সবাই যেন আজ অদ্ভুত লাগছে বিন্দুর; মা বাবার কথা, বৌদির ব্যবহার, সিন্ধুর কাণ্ড! এই ক'টি দিনে কি সবাই বদলে গেল?

বিন্দু বল্লে, “সিন্ধু, আমাদের বাগানে যে গন্ধ লেবুগাছ আছে একটি লেবু নিয়ে আয় না—ডাল দিয়ে খাই”—

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু হাতের মুঠোর ভেতর থেকে দু-টুকরো লেবু বের করে ওর পাতে ফেলে দিলে।

বিন্দু অবাক হয়ে গেল বোনের কাণ্ড দেখে! সিন্ধু বল্লে, “দাদা আমার সেই লাল সিল্কের ফিতে? তুমি আনোনি বুঝি?” বিন্দু জবাব দিলে, “এনেছিরে পোড়ারমুখী এনেছি—এই নে।”

বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে বের করে সে ওর হাতে দিতে গেল। সিন্ধু কিন্তু প্রবল আগ্রহে দাদার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিলে না। “দাওয়ার ওপর রাখো, আমি এই এলুম বলে।”

বিন্দু তাকিয়ে দেখে, সিন্ধু আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই! ওকে কোনো প্রশ্ন করবার ফুরসৎ না দিয়ে হঠাৎ মা বলে উঠলেন, “গাঁয়ের লোক অনেক পরামর্শ দেবে তোকে, কারো কথা শুনিসনি। খুব অল্প খরচে কাজ সারবি—ভবিষ্যৎ ভেবে সব সময় চলতে হবে তোকে।”

বিন্দু খেতে খেতে মুখ তুলে তাকালো, বললো, “কি আবোল তাবোল বকছ মা'? আমি ভবিষ্যৎ ভেবে চলবো তো তোমরা মাথার ওপর রয়েছে কেন?”

বাবা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কোঁড়ন কাটলেন—"আর বাবা কবে আছি কবে নেই সেই জন্যেই তো গোটা কয়েক কথা বলে যেতে চাই—সময় থাকতে। ওই যে নন্দীরা রয়েছে আমাদের আম বাগানের পশ্চিমে—ওদের ইচ্ছে আমাদের আম বাগানটাকে হাত করবার অনেক লোভও দেখাবে তোকে। কিছুতেই রাজী হস্‌নে খোকা! এই বাগান তোর ঠাকুর্দা নিজে হাতে তৈরী করে গেছেন। আমি ছেলে বেলায় ওখানে আম কুড়িয়েছি, তুই কুড়িয়েছিস আবার তোর ছেলেমেয়েরাও কুড়োবে—

মা বল্লেন, "আর দেখ আমার যে দেখন-হাসি সই আসে—তার মেয়েকে বিয়ে করবি। আমি এতদিন কাউকে বলিনি, কিন্তু তাকে যে কথা দেয়া আছে। তুই মায়ের শেষ কথা রাখবি তো খোকা?"

বাবা বল্লেন, "খুব বেশী সময় ত' আর হাতে নেই বাবা, সব চাইতে যে দরকারী কথা সেইটে আগে বলে নি। আমাদের যে তুলসীমঞ্চ, তার তলায় আছে দুটি পেতলের ঘড়া। একেবারে মোহরে ভর্তি। বংশ-পরম্পরায় এ আমাদের সম্পত্তি। কাকপক্ষীতে কেউ জানে না। আজ তোকে বলে গেলাম।

মা-বাবার কাছ থেকে এই জাতীয় বৈষয়িক কথা বিন্দু কখনো শোনেনি। তাই সে ভারী হক্‌চকিয়ে গেল। ঘরের আশে পাশে কি রকম ছমছমে ভাব মনে হচ্ছে আরো যেন অনেক আছে—তারা সব ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা বলছে! একটা কালো বাদুর বিন্দুর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। হঠাৎ গোয়াল ঘরের পেছনে একটা বেড়াল ডেকে উঠল—"ম্যা—ও!"

বিন্দু এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। উঠোনের দিকে নজর পড়তেই দেখে—ওখানে এত জঞ্জাল জমে আছে কেন? কতকগুলো দড়ি, ময়লা ন্যাকড়া কলাগাছ, শূন্য ভাঁড়·····কি এ সব? কতকগুলো কড়ি ছড়ানো সিঁড়ির ধারে—

হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে গেলাসে হাত ধুয়ে নিল বিন্দু। বল্লে, "মা, বাবা, ব্যাপার কি খুলে বলত! তোমরা কি ভাবে কথা বলছ—আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। এত ফাঁকে—ফাঁকে রয়েছ কেন তোমরা? সিন্ধুটা অমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? এ যেন সবটাই হেঁয়ালী।"

এই বলে সে পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে জ্বালতেই চারিদিক থেকে একটা বিরাট হা হা আর হি-হি শব্দ ভেসে এল। তাকিয়ে দেখে সে, কোথায় তার মা আর বাবা? বৌদির জন্য আনা আলতাটা গড়িয়ে পড়েছে দাওয়ায় আর সিন্ধুর সিল্কের ফিতেটা হাওয়ায় উড়ছে এদিক-ওদিক।

সেই বুকফাটা হাসির শব্দ তখনো আশ-পাশ থেকে মিলিয়ে যায় নি। বিন্দু ডাকলে - 'মা-বাবা!'

আড়াল থেকে মায়ের গলা পাওয়া গেল—'ভয় পাসনে বিন্দু, ওসব কিছু নয়,—এখানে আরও সব বাইরের দুষ্টু লোক আছে কিনা!'

এমন সময় বিনোদ কাকার হাঁক শোনা গেল--"ওরে বিন্দু, আমি আসছি······ভয় নেই ভয় নেই।"

লণ্ঠন হাতে ছুটতে ছুটতে বিনোদ কাকা এসে পাশে দাঁড়ালেন। ভয়ে আর উত্তেজনায় তিনি হাঁফাচ্ছেন।

বিন্দু শুধোলে, "কি ব্যাপার বলতো বিনোদ কাকা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। মা- বাবা—"

ওকে থামিয়ে দিয়ে বিনোদ কাকা অস্ফুট কণ্ঠে বল্লেন, "আমারই ভুল হয়েছে রে বিন্দু। আমারই ষ্টেশনে যাওয়া উচিত ছিল।"

এইবার বিন্দু তার কাকার ডান হাতখানা জড়িয়ে ধরে বুকফাটা চীৎকার করে শুধোলে, "কাকা কি হয়েছে আমায় খুলে বল—"

বিনোদ কাকা ধরা গলায় জবাব দিলেন, 'কলেরায় একদিনের মধ্যে সবাই চলে গেল রে— আমি কিছুই করতে পারলাম না। কোন মুখে তোকে সে খবর দেবো?

মাথার ওপর সেই কালো বাদুড়টা আবার ডানা ঝট্ পট্ করে উঠল। আস্তাকুঁড়ে কেঁদে কেঁদে ফিরছে কুকুরটা!

বিন্দু সেই দাওয়ার দিকে আবার তাকালে—যেখানে তার মা বসেছিলেন—বাবা কথা কইছিলেন। তারপর হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ধাক্কা লেগে বিনোদ কাকার হাতের লণ্ঠনটা পড়ে গিয়ে নিভে গেল।

আবার সেই অন্ধকার!

সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের সেই খিলখিলে হাসি।

স্বপনবুড়ো (অখিল নিয়োগী)

বাংলার শিশু সাহিত্যে স্বপনবুড়ো একটি অতি পরিচিত নাম। মূলতঃ তিনি শিশুদের মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই অজস্র রচনা উপহার দিয়েছেন। অলৌকিক কাহিনীও তিনি কিশোরদের জন্যই লিখেছেন। কিন্তু সেই রচনা বয়স্ক পাঠকদের কাছেও সমভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ভৌতিক কাহিনী বিন্যাসের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর সরস এবং সহজ বর্ণনাভঙ্গি পাঠকের কাছে খুবই পরিচিত মনে হয়। 'সব পেয়েছির আসর' প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। এই লেখকের আসল নাম, অখিল নিয়োগী। ১৯০৫ সালে তাঁর জন্ম হয়। তিনি এখনো বিভিন্ন রচনার প্রতি পূর্ণ উদ্যমে মনোযোগী।



বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বাগবাজারে গোবর্ধনের বাড়ীতেই আড্ডাটা আমাদের প্রায় জমতো। গোবর্ধন বড়লোক নয়, অতি সামান্য গৃহস্থ। একটি ছোটখাট কারখানা চালায়, আর চালায় এই আড্ডা। সদাহাস্যময় রোগা ছিপছিপে মানুষ, সংসারে আপনজনদের দেশে রেখে একটি বন্ধুর বাড়ীর বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে সে থাকে এবং সেই বৈঠকখানায় আড্ডা দিতে আসে হরেক রকমের মানুষ।

বড় রাস্তার ঠিক ধারেই ঘরখানি। সন্ধ্যে হতে না হতেই গোবর্ধন ধূনো গঙ্গাজল দিয়ে আড্ডার উদ্বোধন করে, তারপর একে একে লোক জমায়েত হতে থাকে। সেখানে আসে গাইয়ে, বাজিয়ে, উকীল, ব্যবসাদার, ডাক্তার আরও নানান্ ধরনের লোক। বৈঠকখানার একটি কোণে চায়ের জল চড়ানোই থাকে, মাঝে মাঝে আড্ডাধারীদের পয়সায়, মাঝে মাঝে বা গোবর্ধনের খরচায় চা, মুড়ি, বেগুনি, ফুলুরি আসে, আর সেই বস্তুগুলির সদ্ব্যবহার করতে করতে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু নিয়ে আলোচনা সুরু হয়। গোবর্ধনের সময় সময় চায়ের খরচ বেড়ে যায়, কিন্তু তাতে তার দুঃখু নেই—পাঁচটা লোক এসে তার ভাঙা তক্তাপোষে বসে যে গল্প করে যায় এতেই তার আহ্লাদ ধরে না। কোনোদিন লোক সমাগম কম হলে সে রাস্তা দিয়ে একটু চেনা-মুখ দেখলে তাকে ধরে এনে বৈঠকখানায় বসায়, চা দেয় ও একটু আড্ডা দিয়ে নেয়।

আষাঢ়ের সন্ধ্যে তার ওপর আবার ছুটির দিন, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে—ঘরের মধ্যে কুশুমশাই তাঁর নেয়াপাতি ভুঁড়িটি নিয়ে ভূপাল ঘোষালের সঙ্গে গীতার চর্চা করেছেন—

কেষ্ট আর মাখনলাল পাড়ার কবরেজ মশায়ের সঙ্গে একজন সিনেমা-শিল্পীর পেটের অসুখ হতে কজন ডাক্তার এসে সারাদিন তার বাড়ীতে বসেছিল, তাই নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে—গোবর্ধন চা করছে, এমন সময় বৃদ্ধ সন্তোষবাবু সেখানে ছাতি নিয়ে ঢুকলেন।

সন্তোষবাবু প্রবেশ করতেই সকলে আলোচনা বন্ধ করে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ব্যস্ত হওয়ার কারণ ছিল। সন্তোষবাবু এলে আড্ডাটা জমতো খুব, যেহেতু সন্তোষবাবু এমন সব উদ্ভট্ খবর আনতেন যা কেউ বিশ্বাস করতো না মোটেই, কিন্তু মজাদার বলে সেগুলো শুনতে ভাল লাগতো সবারই। নবাগত কোন লোক এলে কিন্তু তার পক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না, কারণ সন্তোষবাবুর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, গাম্ভীর্য ও প্রাচীন বয়সের একটা ব্যক্তিত্ব লোককে বুঝতেই দিত না যে বক্তা যা বলেছেন তা সবই গাঁজাখুরি গল্প, এর মধ্যে সত্যের ভাগ আদৌ আছে কিনা সন্দেহজনক। বিশ্বাস না করলেও সময় সময় অবিশ্বাস্য ব্যাপার শুনতে ভাল লাগে এবং তাতে আড্ডাও জমে ওঠে, তাই আড্ডার একটি স্তম্ভ ছিলেন এই ভদ্রলোক।—

তবে সময় সময় সন্তোষবাবু এমন মাত্রাতিরিক্ত আজগুবী কাহিনী ফাঁদতেন যা শুনলেই বোঝা যেত ডাহা বাজে এবং এটি সন্তোষবাবুর স্ব-কপোলকল্পিত। কিছুদিন আগে তখন আসামে নাগাদের খুব উৎপাত চলছে, সেই সময় একদিন অতি গম্ভীর মুখে সন্তোষবাবু আড্ডায় প্রবেশ করলেন। গোবর্ধন জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার কি সন্তোষবাবু? আজ এত গম্ভীর কেন?

সন্তোষবাবু চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, আর গম্ভীর, অবস্থা খুব গুরুতর। নাগারা বোধ হয় এসে পড়লো।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, কোথায় আসছে মশাই, আসামে?

সন্তোষবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে উঠলেন, আসামে হলে তো বাঁচা যেত, খাস্ কলকাতায় পাকিস্থানীদের নিয়ে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করছে, সাত আট দিনের মধ্যে যে কি হবে বোঝা যাচ্ছে না।

কুণ্ডুমশাই তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে এতক্ষণ বসে ছিলেন। সন্তোষবাবুর কথা শুনে একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, খবরটা কি টেলিগ্রামে আপনাকে কেউ দিয়ে গেছে?

সন্তোষবাবু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, টেলিগ্রামে কেন দেবে, খাস্ মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের খবর মশাই। গভর্ণমেন্ট খুব ভাবিত হয়ে পড়েছে।

কুণ্ডুমশাই সে কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। তাই দেখে সন্তোষবাবু চটে বলে উঠলেন, আচ্ছা মশাই, হাসছেন হাসুন, ব্যবসাদার মানুষ তাই আপনার সবেতে অবিশ্বাস, কিন্তু বুঝবেন ঠেলা- যখন দোরে এসে নাগারা খোঁচা, তখন গাঁ গাঁ করে চেঁচাতে থাকবেন ঐ নেয়াপাতি ভুঁড়ি নিয়ে আর গদীতে বসতে হবে না, পিটিয়ে অর্ধেক করে দিয়ে যাবে।

কুণ্ডুমশাই প্রত্যুত্তরে ঠাট্টা করে তখুনি বলে উঠলেন, যাক্ আপনি আছেন যখন তখন আমার আর ভয় কি? মিলিটারি নিয়ে এসে আমার যেটুকু থাকবে সেটুকুকে একটু তদারকী করে বাঁচিয়ে দেবেন। আর কারুর ওপর তো নির্ভর করতে পারবো না, আপনার ভরসাতেই থাকবো।

কথাটা শুনে কেষ্ট আর ভূপাল হেসে উঠলো। আর যায় কোথা, সন্তোষবাবু ক্ষেপে, যাবার সময় শুধু 'আচ্ছা' বলে বেরিয়ে গেলেন। গোবর্ধন চায়ের পেয়ালা নিয়ে ছুটে এসে বললে, ও দাদা, চ-টা খেয়ে যান, এর মধ্যে যাচ্ছেন কোথায়?

ততক্ষণে সন্তোষবাবু রাস্তার অর্ধেক চলে গেছেন। দূর থেকে হাত নেড়ে জানিয়ে দিলেন যে, ও জিনিস খাবার ইচ্ছা তাঁর নেই।

তারপর আর দিন পনেরো তিনি আড্ডায় আসেন নি। সম্ভবতঃ নাগারা না-আসতে তিনি মনে মনে খুবই দাগা পেয়েছিলেন।

কিন্তু একবার যিনি আড্ডাধারী হয়েছেন, তিনিই জানেন যে আড্ডার মোহ ছাড়া কী কঠিন! সন্তোষবাবুও বাড়ীতে বসে থাকতে পারলেন না বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন। তিনি আসতেন অনেক দূর থেকে, কিন্তু আষাঢ়ের এই বর্ষার সন্ধ্যায় আড্ডা ছেড়ে বাড়ীতে পড়ে থাকা মানে নির্বাসনের সামিল, তাই চৌরঙ্গীর কাছাকাছি জায়গা থেকে বাগবাজারের দূরত্বটা বেশি ঠেকলো না, তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

সন্তোষবাবুকে আসতে দেখে কুঞ্জমশাই সেদিন একটু অধিক আপ্যায়ন সুরু করলেন, বললেন, বসুন বসুন সন্তোষবাবু, নতুন কি খবর আছে বলে ফেলুন।

নাগাদের প্রসঙ্গ পাছে উঠে পড়ে সেই জন্যেই বোধ হয় সন্তোষবাবু একেবারে ভিন্ন লাইনের কথা পেড়ে বসলেন। চোখ দুটি বড় করে বললেন, মশাই, আজ একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনে এলুম। আমাদের পাশের বাড়ীতে একটি বৌ হঠাৎ মালকোচা মেরে তার শ্বশুর, দেওর আর স্বামী তিন তিনটে ষণ্ডাকে ঘুষি মেরে শুইয়ে দিয়েছে! হৈ হৈ কাণ্ড! ঘোমটা দেওয়া বাড়ীর বৌ তার গায়ে হঠাৎ অসুরের শক্তি কি করে এলো রে বাবা! পাড়া-প্রতিবেশী সবাই ছুটে এলো, আমাদের বাড়ীর ছেলেগুলোও গিয়েছিলো, তারা এসে বললে, বাবাঃ তার কাছে এগোয় কার সাধ্যি, অনবরত হিন্দী বলছে আর তাল-ঠুকে সকলকে চ্যালেঞ্জ করছে, আও হামারা সাথ কোন লড়ে গা আও, একদম জানসে খতম্ কর দেগা! তাই শুনে ডিগ্‌ডিগেগুলো সবাই পালিয়েছে, এখন সাতটা জোয়ান এসে তাকে কোনমতে দড়ি বেঁধে রেখেছে বটে, কিন্তু চীৎকারে লোকের কান ঝালাপালা হবার উপক্রম।

গোবর্ধন টিয়াপাখীর মত নাকটি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল।

খবর শুনে তার নাক খেঁদা হয়ে যাবার জোগাড়। সে হাঁ করে বলে উঠলো, বলেন কি ?

কুণ্ডুমশাই, ভূপাল ঘোষাল, দেবেন উকিল—সবাই খবরটা শুনে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন। সন্তোষবাবু বলে চললেন, এখন পুলিস, ডাক্তার সব এসেছে, কেউ কিছু করতে পারছে না।

ভূপাল ঘোষাল বললে, বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে হঠাৎ। পাগলদের গায়ে বায়ুর প্রকোপে খুব জোর হয় শুনেছি।

সন্তোষবাবু বিরক্ত স্বরে বলে উঠলেন, দূর তোর পাগল—একটা বৌ পাগল হলে বাড়ীর লোক সামলাতে পারতো না ?

কুণ্ডুমশাই হেসে বলে উঠলেন, একটা স্ক্রু আলগা থাকলে সামলানো মুস্কিল, তার ওপর যদি আবার বৌয়ের মাথা খারাপ হয় তাহলে তো সাতগুষ্টির কেউ সামলাতে পারে না।

সন্তোষবাবু প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন, আরে মশাই পাগল নয়, পাগল নয়, ভূতে ধরেছে। শোনা গেল বাড়ীর পাশে একটা পোড়ো বাড়ীর উঠোন আছে, সেইখানে নাকি কুস্তির আখড়া ছিল। বৌটা জানতো না, দুপুর বেলায় সেখানে ঘর ঝাঁট দিয়ে জঞ্জাল ফেলেছিল, তার পরই এই ব্যাপার। কোন্ বেটা পালোয়ান ভূত কাঁধের ওপর চেপে বসেছে।

ভূপাল বলে উঠলো, যত সব বোগাস ব্যাপার! ভূতে ধরেছে না ছাই—হিষ্টিরিয়া-টিষ্টিরিয়া হবে।

সন্তোষবাবু কথাটায় আহত হয়ে বলে উঠলেন, আমি জানি, আমি বললেই সেটা বোগাস ব্যাপার বলে আপনারা উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু এ আর অপরের মুখ থেকে উড়ো খবর শুনে আসা নয়, খাস্ আমার বাড়ীর স্বচক্ষে দেখে আসা খবর, একে বোগাস্ বলেন তো আমি আর কি বলবো ? বিশ্বাস না হয়, আমার সঙ্গে গিয়ে দেখবেন চলুন, মেয়েছেলে কি চোখ পাকিয়ে, এক একটা রদ্দায় সবাইকে কাত করে ফেলছে।

কুতুমশাই হঠাৎ সন্তোষবাবুকে সমর্থন করে বলে উঠলেন, না আজকের ঘটনাটা অবিশ্বাস করার মতো নয় ভূপাল—এ রকম হতে পারে। ভূতের ভর হলে অতি প্যাংলা লোকও থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিতে পারে। বৌটাকে হয়তো ভূতেই ধরেছে!

ভূপাল তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে উঠলো—দূর ভূত ফুত সব বাজে। ভূত যদি থাকেও তা হলে সে কখনও মানুষের অনিষ্ট করতে পারে না—কারণ তোমার আমার মত দেহ ধারণের ক্ষমতা ভগবান তাকে দেন নি।

সন্তোষবাবু একটু উঁচুস্বরে বললেন, দেহ ধারণ না করেও তারা অন্য দেহের ভেতর ঢুকতে পারে না বলছেন?

ভূপাল নির্বিকারে বললে, আমার তাই ধারণা। ভূত মানেই মনের ভুল। চিরকালের সহজাত সংস্কার থেকে মানুষের মনে ভয়ের উৎপত্তি হয়, তাই থেকে মানুষের মনে নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। লোকে সেইটেকেই ভূতে ধরেছে-টরেছে বলে। আসলে ওটা মনের একটা বিকৃত অবস্থা।

গোবর্ধন এতক্ষণ কোন কথা কয়নি—সে কিন্তু এবার বলে উঠলো না ভাই ভূপাল, মনের অবস্থার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, কারণ আমি কয়েকটা ঘটনা জানি যা নিছক ভূতের ব্যাপার।

ভূপাল চায়ের একটা পেয়ালায় খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে বলে উঠলো, ও আমিও অনেক জানি—বলি নিজে কখনও ভূত দেখেছ?

—না তা দেখিনি, তবে অতি বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনেছি, তাঁরা নিজেরা দেখে এসে বলেছেন।

ভূপাল বললে, থাম, ঐ কথাই সবাই বলে, কেউ নিজের চোখে কিছুই দেখেনি, শুধু শুনেই এসেছে।

এর পর কুতুমশাই নিজের এক ভৌতিক দর্শনের গল্প করলেন। কবরেজ মশাইও একটি ছাড়লেন, কিন্তু অবিশ্বাসী ভূপাল গোঁয়ার গল্পগুলো মন দিয়ে শুনলেও মুখ টিপে টিপে যে ভাবে হাসছে

লাগলো, তাতে বেশ বোঝা গেল যে কারুর গল্পই ঠিকমত বিশ্বাস করছে না। কিন্তু ভূতের গল্প সুরু হলে আর থামে না, তার ওপর বাদলার দিন সন্ধ্যেবেলায় সুরু হলে তার জের অনেকক্ষণ টেনে নিয়ে যেতে শ্রোতা ও বক্তার বেশ ভালই লাগে। গল্প যখন জমে উঠেছে ঠিক এই সময়ে দীনেশবাবু বলে আমাদের এক পুরোনো বন্ধু সেখানে প্রবেশ করলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন একজন কোট প্যাণ্ট পরিহিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক, অতি সৌম্যমূর্তি ও লম্বাচওড়া মানুষটি।

পরিচয়ে জানা গেল ভদ্রলোক দীনেশবাবুর খুবই পরিচিত একজন ডাক্তার, দক্ষিণ কলকাতায় থাকেন, এইদিকে কোন বৈষয়িক কাজে এসেছিলেন হঠাৎ দীনেশবাবু আমাদের আড্ডাটাকে দেখাবার জন্যে তাঁকে জোর করে টেনে এনেছেন।

দীনেশবাবু আলাপ করিয়ে দিতেই সকলে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলে। গোবর্ধন একটা চেয়ার টেনে এনে তাঁকে বসিয়ে চা দিলে দীনেশবাবুও তক্তপোষের একধারে আসন গ্রহণ করলেন।

যে প্রসঙ্গ চলছিল সেটা আগন্তুকের সামনে চালানো ঠিক সংগত হবে কি হবে না ভাবতে ভাবতে সবাই চুপ করে গেলেন। কিন্তু দীনেশবাবুই একটা সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, কি, সবাই চুপচাপ হয়ে গেলেন কেন—আমি ডাক্তার মুখার্জিকে নিয়ে এলুম আমাদের বাগবাজারের আড্ডা দেখাতে—আর সেই আড্ডাধারীরাই চুপ হয়ে গেল।

গোবর্ধন সহাস্য বদনে বলে উঠলো, না এই আজেবাজে ভূতের গল্প হচ্ছিল, আপনারা আসতে—

গোবর্ধনকে কথা শেষ না করতে দিয়েই দীনেশবাবু বলে উঠলেন আরে, এ তো খুব ভাল বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, থামলে কেন চালাও।

সেই সময় ভূপাল হঠাৎ বলে বসলো, না, না ও-সব কি

আজেবাজে কথা, ঐ নিয়ে শুধু সময় নষ্ট করে লাভ নেই, তার চেয়ে পলিটিক্স আলোচনা ঢের ভাল। সময় না কাটালেই লোক ভূতের গল্প করে বুঝছেন না ?

দীনেশবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ভূপাল, তুমি ভূত বিশ্বাস কর না মোটেই ?

ভূপাল সহাস্যে বললে, বিলকুল—না।

দীনেশবাবু ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে একবার চেয়ে বলে উঠলেন—এ বলে কি মশাই। আপনার সেই কাহিনী শুনলে তো এরা থ হয়ে যাবে।

ডাক্তার মুখার্জি ও-প্রসঙ্গ চাপা দেবার অভিপ্রায়ে বলে উঠলেন, না, না ও বিশ্বাস না-করাই ভাল, কেন আবার ও-সব আলোচনা ? অন্য বিষয়ই চলুক না।

দীনেশবাবু বললেন, না মশাই, এরা ভূত বিশ্বাস করে না এ তো মেনে নিতে পারা যায় না। আপনি অন্ততঃ তা স্বীকার করবেন না নিশ্চয় ?

ডাক্তার মুখার্জি একটু চিন্তিত ভাবে বলে উঠলেন, দেখুন, ভূত সত্যি আছে কি নেই ঠিক বুঝি না। বিজ্ঞান ও যুক্তি বলে ও-সব চোখের ভ্রম, কিন্তু আবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখি উল্টা—এক রহস্য। হয় তো ভুলই হবে—কে জানে, ও সত্যি একটা মিস্ট্রি। যাক্ ও প্রসঙ্গ থাক।

ডাঃ মুখার্জির কথা বলার ধরনে সকলেই বুঝতে পারলে একটা কি ব্যাপার তিনি চেপে যেতে চাইছেন। তাছাড়া দীনেশবাবু ঘরে ঢুকেই বলেছিলেন যে, সে ব্যাপার শুনলে 'থ' হয়ে যাবে, সে কথা শোনা অবধি সবারই কৌতূহল বেড়ে উঠেছিল খুব।

কুণ্ডুমশাই, সন্তোষবাবু, গোবর্ধন মায় ভূপাল যে বাদ পর্যন্ত যখন ডাক্তারবাবুকে সেই কাহিনী বলার জন্যে পেড়াপীড়ি সুরু করে দিলে, তখন ডাঃ মুখার্জি বাধ্য হয়ে সেই কাহিনী বলতে

আরম্ভ করলেন। ডাঃ মুখার্জি বললেন, দেখুন, ভূত আমি কোনদিনই বিশ্বাস করতুম না, আজও যে পুরোপুরি করি তাও নয়, তবে আমার জীবনে এমন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, যার হদিস আমি আজও পাইনি এবং যার জন্যে আমার জীবনের মহামূল্য কয়েকটা বছর খেসারত দিতে হয়েছিল।

সকলে উদগ্র আগ্রহে ডাঃ মুখার্জির মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কাহিনী শুনতে লাগলেন। সমস্ত ঘরটা বেশ থমথমে ভাব। ওদিকে ঘরের বাইরেও চেপে বৃষ্টি আসাতে পরিবেশটা আরো জমাটী হয়ে উঠল। ডাঃ মুখার্জি বলতে লাগলেন—

বছর পনরো কুড়ি আগে মেডিকেল কলেজ থেকে আমি-পাস করে বেরিয়েছিলুম এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই ডাক্তার হিসেবে সুনামও অর্জন করেছিলুম, তাই রোগীর সমাবেশ আমার কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায় থেকেই বেশ ভালো ভাবে সুরু হল। দিবারাত্রি নানান ধরনের রোগী নানা ব্যাধি নিয়ে আমার কাছে আসতো এবং আমি তাদের যথাসাধ্য রোগমুক্তির জন্যে চেষ্টা করতুম।

বোধ হয় নিরাময় সংখ্যা বেশী হওয়াতেই সকাল সন্ধ্যে নানাস্থান থেকে আমার ডাক আসতো। অনেক সময় বাধ্য হয়ে বলে দিতে হত যে যাবার সময় হবে না, আপনারা অন্য কোন চিকিৎসককে ডাকুন। তাতে লোকে ক্ষুন্ন হত ঠিকই, কিন্তু উপায় ছিল না।

সকলে বলে উঠল, বটেই তো!

ডাক্তারবাবু আবার বলতে সুরু করলেন, আমার বাড়ী আর ডিসপেনসারি ছিল ভবানীপুরে—বিকেল বেলায় রোগী দেখে রাত আটটার মধ্যেই সেখানে ফিরে আসতুম, তারপর ঘণ্টাখানেক ঐখানে রুগী দেখে নটা সাড়ে নটায় ওপরে চলে যেতুম আর নামতুম না। এই ছিল সাধারণতঃ প্রাত্যহিক নিয়ম—খুব জরুরী কেস থাকলে অবশ্য দেরী হয়ে যেত বা রাত্তিরেও বেরুতে হত, কিন্তু সে কালেভদ্রে।

একদিন এমনি বর্ষা, তবে সারাদিনই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, ডাক্তারখানায় রোগীর সংখ্যাও বেশী নয়, সাড়ে আটটার মধ্যেই কাজ চুকে গেল—ডিসপেনসারি থেকে কম্পাউণ্ডারকে সকাল সকাল ছুটি দিয়ে বলে দিলুম, যাও, আজ আর এখন কেউ আসবে না মনে হচ্ছে।

কম্পাউণ্ডার চলে গেল—সেদিনের খবরের কাগজটা একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওপরে উঠে যাব ভেবে আমি কাগজটা পড়ছি, এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ডিসপেনসারির বাইরেতে দাঁড়িয়ে আমায় ডেকে বললে, ডাক্তারবাবু একটু দয়া করে যদি আমাদের বাড়ী আসেন বড ভাল হয়—আমার এক আত্মীয় মর-মর, কোন ডাক্তারকে পাচ্ছি না, একবার চলুন।

বাইরে যেখানে লোকটি দাঁড়িয়েছিল সেখানটায় আলো তত স্পষ্ট ছিল না, লোকটিকে বললুম, ভেতরে এসে বসুন, কি ব্যাপারটা আগে শুনি, তারপর যাওয়ার কথা হবে' খন।

লোকটি অনুনয় করে বললে, তার একটা পা খোঁড়া, বেশী উঁচু নীচু করলে কষ্ট হয়, তাই তাকে মাপ করতে হবে—নেহাত বিপদে পড়েই সে আমার কাছে ছুটে এসেছে। আমার কি মনে হল, ড্রাইভারকে ডেকে গ্যারাজ থেকে গাড়ী বের করতে বললুম। লোকটি বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলো।

গাড়ী এসে দাঁড়াতেই—লোকটি সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলো। আমি চাকরকে ডিস্‌পেনসারি বন্ধ করতে বলে গাড়ীর পেছনে গিয়ে বসলুম। গাড়ী স্টার্ট দিলে জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় যেতে হবে?

লোকটি বললে, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড। গাড়ী সেই দিকেই এগিয়ে চললো। যেতে যেতে পাশ থেকে লোকটির মুখ দেখে আমি শিউরে উঠলুম। এ কি বিশ্রী চেহারা—মানুষের এ রকম চেহারা হতে পারে এ আমার ধারণার বাইরে ছিল! তাই তো,

এই বদর্য লোকটার কথা শুনে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে, গাড়ীটাকে ঘোরাতে বলবো নাকি, ইত্যাদি নানা কথা আমার মনে হতে লাগলো, আবার সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলও হল, দেখা যাক্ না কি হয়।

সন্তোষবাবু এই সময়ে বলে উঠলেন-ওঃ, আপনার সাহস আছে মশাই, রাত্তিরে একটা অপরিচিত লোকের সঙ্গে এই ভাবে যাওয়া খুব বাহাদুরির কথা!

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, দেখুন, আমরা ডাক্তার মানুষ—মানুষ বিপদে পড়েছে শুনলে মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। যদি সময়মত গেলে একটা প্রাণ বেঁচে যায়, এই ভাবনাটাই তখন বেশী হয়। তাছাড়া বরাবরই আমার সাহস ছিল খুব। গভীর রাত পর্যন্ত কতদিন একা কলেজে মড়া নিয়ে কাটাকুটি করেছি কোন ভয় হয়নি—রাত্রে কত অন্ধকার ঘরে মুমূর্ষু রোগীকে দেখতে গেছি, চোখের সামনে কত মৃত্যু হয়েছে, তবু ভয় পাইনি কোনদিন। তবে অন্ধকারের মত ডাক কোনদিনই আসেনি বিশেষ একেবারে একটা অপরিচিত জায়গা থেকে, আর এই রকম রাতে।

গোবর্ধন চোখ বড় বড় করে বলে উঠলো, তার ওপর আবার ঐ বিকট মূর্তির সঙ্গে যেতে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, হ্যাঁ, তা যা বলেছেন—তবে আমার মনের জোরটা ছিল খুব, সেইজন্যে ওকেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনলুম না। চুপচাপ বসে রইলুম গাড়ীতে।

তখন বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে এত বাড়ী ছিল না—অধিকাংশ জায়গায় ছিল ডোবা আর জঙ্গল—দূরে দূরে বড় বড় লোকের এক-একটা বাড়ী—তাও রাস্তার ওপরে নয়, সামনে অনেকখানি ছাড়া-জায়গার পর। রাস্তার আলো এত দূরে দূরে যে হেডলাইট জ্বালিয়ে ছাড়া গাড়ী নিয়ে এগোনো মুস্কিল।

জনহীন অন্ধকার পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে একটা বাগানের সামনে লোকটা গাড়ী রাখতে ব'লে নামলো। আমিও তার পিছু পিছু

চলতে লাগলুম। বললুম, "এখানে আলো-টালো নেই দেখছি।" লোকটি শুধু অস্ফুট স্বরে জবাব দিলে, 'হুঁ!'

আমার কিন্তু তখন মনটা বেশ দমে গেছে। ভাবলুম তাই তো, লোকটার সঙ্গে রাত্রিবেলায় এসে বোধ হয় ভাল করলুম না—কি জানি ওর মনে কি আছে? গুণ্ডা, ডাকাতও হতে পারে—অবশ্য দু'একজন আক্রমণ করলে সামলাতে পারবো, কিন্তু অজানা জায়গায় রাতের অন্ধকারে যদি বেশি লোক আসে তাহলে? পকেট হাতড়ে দেখলাম একটা ছুরি আছে আর আছে টর্চ। তাড়াতাড়ি দুটো জিনিসই দুহাতে বাগিয়ে ধরে টর্চটা জ্বেলে ফেললুম, কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনি যে তার ব্যাটারির শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে তখন—অতি মিটমিট্ করে আলো বেরুতে লাগলো তা থেকে—তাই জ্বালিয়ে লোকটির অনুসরণ করলুম।

বাগানের শেষ প্রান্তে একটি জীর্ণ প্রকাণ্ড বাড়ী, কিন্তু সমস্ত চুপচাপ—একটা আলোও জ্বলছে না কোথাও। তখন আমার সত্যি কেমন গাটা ছম্‌ছম্ করতে লাগলো—যাক্, দেখি কতদূর কি হয় বলে সেই লোকটাকে অনুসরণ করতে করতে একটা প্রকাণ্ড ভাঙা সিঁড়ির সামনে এসে পড়লুম।

নির্বাক সঙ্গীটি অন্ধকারেই তরতর্ করে ওপরে দোতলায় উঠে গেল, আমি টর্চের ক্ষীণ আলোয় ধীরে ধীরে পা ফেলে ওপরে উঠে গিয়ে একটা বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। বারান্দার মধ্যিখানে একটা হলঘরের দরজা—মনে হল সেই প্রকাণ্ড হলটার শেষ দিকে মিট্‌মিট্ করে একটা পিদ্দিম জ্বলছে, আর তারই পাশেতে একজন কে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছে। যাই হ'ক সেই রুগী কি না—কে জানে!

আবার মনে হোল খুন টুন হয়নি তো? শেষকালে আমাকে ফ্যাসাদে 'ফেলবার' জন্যে হয়'তো কোন ষড়যন্ত্র ক'রে নিয়ে এসেছে—

এ ত মহা বিপদে পড়লুম! কি করি তখন, ভেবে পাচ্ছি না—বর্ষার ঝিম্ ঝিম্ শব্দ ছাড়া মানুষের কণ্ঠের একটি আওয়াজও কোথাও নেই—আর লোকটি যে দোতলায় উঠে কোথায় গেল তারও কোনও হদিস্ পেলুম না। তখন আমার শরীরে কুল্ কুল্ করে ঘাম দেখা দিয়েছে—কিন্তু তবু জোর করে মনে সাহস আনবার চেষ্টা করছি, আর ডাকছি, ও মশাই কোথায় গেলেন? ও মশাই···?

কোন সাড়া নেই কারুর। ঠিক এই সময় আবার টর্চের আলোটুকুও নিভে গেল। আমি তখন বুঝতে পারছি না যে এটা স্বপ্ন দেখছি না, বিংশ শতাব্দীতে কলকাতার এক প্রান্তে একটি বাড়ীতে অসহায় নির্বান্ধব অবস্থায় একমাত্র একটি জীবিত মানুষ আমি দাঁড়িয়ে আছি!

সমস্ত শরীর তখন ঠক্ ঠক্ কাঁপছে। কেবল মনে হচ্ছে চতুর্দিক থেকে যেন অশরীরী মানুষরা চাপা স্বরে ফিস্ ফিস কথা কইতে কইতে চলে যাচ্ছে। আবার তারপরেই মনে হল—দূর এসব মনের ভুল, নিজের মনের ভয়ের ছায়া—আসলে কোন দুষ্টু লোকের পাল্লায় পড়েছি আমি, তবু একবার ডাক দিই। ডাক দিলুম, কিন্তু সে লোকটা কোন সাড়া দিলে না। আমার গলার আওয়াজ শুনে হলঘরের মধ্যে সেই কম্বল ঢাকা লোকটি শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, "ডাক্তারবাবু এসেছেন, আসুন এখানে, আমায় একটু দেখে যান তো।"

মানুষের কণ্ঠের সেই ক্ষীণ আওয়াজ পেয়ে আমি যে কী স্বস্তি পেলুম তা বলতে পারি না। সমস্ত ভয় আমার নিমেষে দূর হয়ে গেল। মনে হোল ঐ অবস্থায় রুগীই আমার আজকের দিনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

দ্রুতপদে আমি হলঘরের প্রদীপের কাছে এগিয়ে গিয়ে রুগীর সামনে দাঁড়িয়ে দেখলুম লোকটি আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে

আছে, এর ভেতর থেকে কি করে কথা বললে তাও তো বুঝছি না। কাছে কোন বসবার টুল বা চেয়ার ছিল না, উবু হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে আপনার, বলুন তো?

কম্বলের ভেতর থেকে একটু বিকৃতি স্বরে আওয়াজ এল, কি হয়েছে জানি না—একবার নাড়ীটা দেখুন তো, বলেই সে একটি শীর্ণ হাত কম্বলের পাশটা থেকে বাড়িয়ে দিলে।

আমি তখনও বিশেষ লক্ষ্য করি নি যে যে-হাতটি ধরতে যাচ্ছি সেটি কী!

কিন্তু হাত ধরেই আমি চমকে উঠে পিদ্দিমের আলোয় দেখলুম, এ কার হাত? এ যে কঙ্কাল—শুধু চর্মহীন সাদা সাদা হাড়ের আঙুল আর কব্জি আমার দিকে তুলে ধরেছে।

ব্যস্! —সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে আমি সেইখানে পড়ে গেলুম। তার পরের ঘটনাগুলি কিছুই জানিনা, সবই অপরের মুখ থেকে শোনা।

কাহিনী শুনে সবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হোল। কিন্তু তারপর কি হোল? সবারই ঐ এক প্রশ্ন।

ডাক্তারবাবু বললেন, তারপর আমি তো সেইখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি, ওদিকে আমার ড্রাইভার শিউশরণ আমাকে এক ঘণ্টার মধ্যেও আসতে না-দেখে খুব চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাই তো এ রকম তো কখনও হয় না। ডাক্তারবাবু অন্ধকারে এই বাগানের মধ্যে তাহলে কোথায় গেলেন!

এই ভাবতে ভাবতে অবশেষে সে পাশের একটি বড় বাড়ীতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে। সে বাড়ীর লোকেরা বললে, তোমার মনিব পাশের ঐ ভাঙা বাড়ীতে যেতেই পারেন না, ও বাড়ী বহুদিন ধরে তালা-দেওয়া পড়ে আছে—বাড়ীতে দুটো খুন হয়, তাই ওর ভাড়াও জোটেনি, অতএব ডাক্তারবাবু ওখানে যাননি অপর কোথাও গেছেন, তুমি বিলকুল ভুল দেখেছ। ও হানাবাড়ীতে ডাক্তারবাবু যাবেন কেন?

শিউশরণ হলফ করে বললে, ডাক্তারবাবু ঐখানেই গেছেন। আমার গাড়ী ঐ বাগানের গেটে রয়েছে, আপনারা দেখবেন চলুন। সকলে তার কাকুতি-মিনতি শুনে দশ বার জন চাকর দরোয়ান নিয়ে দুতিনটে বড টর্চ জ্বালিয়ে সেইখানে গেল। গিয়ে দেখলে সত্যিই তো বাড়ীতে তালা দেওয়া নেই, দরজা খোলা পড়ে রয়েছে। তখন তারা একটু অবাক হয়েই সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে গেল।

হলঘরে ঢুকেই তারা দেখলে আসবাবহীন শূন্য কক্ষে আমি একা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি। এরপর আমায় ধরাধরি করে সকলে বাড়ী নিয়ে আসে। শুনেছি তিন চার দিন আমার কোন জ্ঞানই ছিল না।

তারপর ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলেও প্রায়ই আমি অজ্ঞান হয়ে যেতুম। তারপর কিছুদিন পরে ভাল হয়ে উঠলেও আমার স্মৃতিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। বাইরে থেকে সুস্থ দেখালেও মনে মনে কি রকম অস্বস্তি বোধ করতুম, কিন্তু কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ থাকতুম।

এখানকার চিকিৎসকরা দেখে ফতোয়া দিলেন যে, মেলাঙ্কোলিয়া বা বিষাদ-রোগে ভুগছি আমি— কাজকর্ম আবার সুরু করলেই ধীরে ধীরে ভাল হয়ে যাব। সকলে আমায় ডাক্তারখানায় বসবার জন্যে জেদ্ করতে লাগলো, কিন্তু আমার সেখানে বসবার আর ইচ্ছে হল না। বাড়ীতে আমার এক ভাইপো তখন সবে ডাক্তারি পাশ করেছে—সে বললে, কাকা চল আমাতে তোমাতে রুগী দেখবো। তার কথায় বাধ্য হয়ে ডাক্তারখানায় আমি সকাল বেলায় বসে রুগী দেখতে লাগলাম, কিন্তু কোন প্রেসক্রিপশান লিখতুম না।

একদিন সে কোথায় বেরিয়ে গেছে, তখন দুজন রুগী বুকের অসুখের চিকিৎসা করতে আমার কাছে এল। আমি পরীক্ষা করে তাদের দুজনকে প্রথমে একটা মিকশ্চার খাবার জন্যে ব্যবস্থা-পত্র

লিখে দিয়ে বললুম, কম্পাউণ্ডারকে এই প্রেস্‌ক্রিপশান দেখান, দিয়ে দেবে।

রুগীরা প্রেস্‌ক্রিপশান নিয়ে কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে এল, বললে একটু পরে ওষুধ নিয়ে যাবে। তারপর আর কয়েকজন রুগীকে দেখে ব্যবস্থা-পত্র লিখে দিলুম। খানিকক্ষণ পরে কম্পাউণ্ডার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমায় পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললে, ডাক্তারবাবু আপনি এ কি করেছেন! প্রত্যেকটি খাবার ওষুধের সঙ্গে যে সব ওষুধ মিশিয়ে দিতে বলেছেন সেগুলি তো প্রত্যেকটি সাংঘাতিক বিষ! এ কি ক'রে দেওয়া যায়?

তখন আমি আরও ভয় পেয়ে গেলুম—কি যে করবো বুঝতে পারলুম না। কম্পাউণ্ডার তখন আমার ভাইপোর ফিরে না—আসা পর্যন্ত রুগীদের ওষুধ দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দিলে। তারা তখনকার মত বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এর পর থেকে আমায় আর ডিস্‌পেন্সারীতে বসতে দেওয়া বোধ হয় কারুরই সংগত মনে হল না।

আমার ভিয়েনায় পাঠিয়ে দেবার জন্যে বাড়ীর সকলে মতলব করলে এবং ভাইপো কোন এক বিখ্যাত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আমাকে সেখানে নিজে গিয়ে রেখে দিয়ে এল।

তিন বছর ধরে সেখানকার একজন সুবিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারের পর্যবেক্ষণে ও চিকিৎসাধীনে আমি রইলুম। তিনি শেষের এক বছর আমাকে নিয়ে রুগী দেখতে বেরোতেন ও প্রেসক্রিপশান লিখতে বলতেন। ঠিক ঠিক লিখলে তিনি খুব উৎসাহ দিতেন আমায়। তারপর তিনি আমাকে প্রকৃত রোগমুক্ত করে ছেড়ে দিলেন—আশ্চর্য! স্মৃতিশক্তিও আমার ধীরে ধীরে ফিরে এল।

আবার চিকিৎসা ব্যবসা সুরু করলুম—আজও করছি। তবে রাত্রে পরিচিত লোক এসে ডাকলেও আমি আর সহজে যাই না—যদিও বা যেতে হয় তখন সঙ্গে লোকনিই।

সকলে হাঁ করে ডাক্তারবাবুর এই অলৌকিক কাহিনী যেন গিলছিল। ডাক্তারবাবু থামতে ভূপাল অনুসন্ধিৎসু হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, এটা কি সম্পূর্ণ ভৌতিক ব্যাপার বলে আপনি মনে করেন?

ডাক্তারবাবু বললেন—কি যে এ ব্যাপার তা আজও বুঝতে পারিনি মশাই, তবে এ ব্যাপার নিতান্তই সত্যি আর আমার জীবনে ঘটেছে তারও প্রমাণ আপনারা আমার বাড়ীর লোকের কাছ থেকে শুনতে পারেন—শিউশরণ ড্রাইভারও রয়েছে, সেও অনেকটা বলতে পারে।···এ ভৌতিক কিনা জানি না তবে অলৌকিক!

দীনেশবাবু এই সময় বলে উঠলেন—যাক ভাই, এ নিয়ে আর তোমরা বেশী মাথা ঘামিও না, শেষকালে তোমাদেরও হয় তো ভিয়েনায় যেতে হতে পারে।

সকলে হেসে উঠলো। বাইরে তখন বৃষ্টি ধরে গেছে।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

জন্ম ১৯০৪। বিশেষ সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী। কলকাতা আকাশবাণীর সঙ্গে সুদীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন। অভিনয়ে-আবৃত্তিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। স্বনামেও বিরূপাক্ষ ছদ্মনামে বহু রসরচনা বা রঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত। বুদ্ধিদীপ্ত মননের সঙ্গে রুচিশীলও আস্বাদ্য রসের মিশ্রণ তাঁর শিল্পী-প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র করেছে। কথকতার ভঙ্গীতে বৈঠকী মজলিস সৃষ্টি তাঁর প্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিক। তিনি কয়েকটি ভৌতিক কাহিনীরও স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্ট ভৌতিক কাহিনীর মধ্যে বৈঠকী মেজাজের তৃপ্তি ও পূর্ণতার বিরল স্বাতন্ত্র্য আছে। উত্তর কলিকাতা নিবাসী প্রধান লেখক, আজও সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নানা কর্মকাণ্ডে সদালিপ্ত।



শিবরাম চক্রবর্তী

দিব্যি একটা খালি বাড়া পেয়ে গেলাম আলিপুরে! হার্ট ট্রাবলের জন্য ডাক্তার বলে দিল হাওয়া বদলাতে, বলে দিল—'কলকাতা ছেড়ে ঘুরে এসো গে কোথাও—দিন কতক বাঁচতে চাও যদি। তবে যদি না বাঁচতে চাও সে কথা আলাদা।'

বাঁচতে কে না চায়? কাজেই ছাড়তে হলো কলকাতা। চলে এলাম আলিপুরে।

হ্যাঁ হাওয়া বদলাতে চাও তো আলিপুর, ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাওয়া বদল হচ্ছে সেখানে। এমনকি মিনিটে মিনিটেও বলা যায়। আর তার রেকর্ড থেকে যাচ্ছে রীতিমত, আবহাওয়া আপিসটা সেখানেই কিনা!

উঠেছি এসে এখানে—আজ সকালেই। বিনি আর আমি। আমার উপর হাওয়া বদলের দায়, আর বিনির দায় খাওয়া বদলের। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সে আমাকে খাওয়াবে—পুষ্টিকর আর তুষ্টিকর যতো রকমের খাবার আছে। খাওয়াবাব ভার তার ওপর, সে ভার বইবে ও। আর খাদ্যের ভার যা কিছু আছে সব বোঝা সইতে হবে আমায়—হয়তো একটু কষ্ট করেই এই রকমের বোঝাপড়া।

তা কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলেনা—এখানে অবিশ্যি কেষ্টকে না পাবার জন্যেই এই কষ্ট করা! কেষ্ট প্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টির জন্যেই না এই খাদ্য বৃষ্টি? তা হোক্, যতই কষ্টদায়ক হোক—কেষ্ট আর খাদ্যের মধ্যে বাছ বিচার করতে হলে খাদ্যকেই আমি বেছে নেব অম্লান বদনে, এমনকি, শ্রীমতি বিনির রান্না হলেও।

এক ঘণ্টাও হয়নি আমার। ইতিমধ্যে আসরে খাদ্য এসে হাজির। এক বাটি দুধ আর একখানা খাম বিনি আমার টেবিলে এনে রাখলে।

—তোমার চিঠি দাদা—দুধটা খেয়ে ফেল দেখি।

আমি আগে চিঠিখানা দেখি, এখনো তো কাউকে এখানকার ঠিকানা জানাইনি। আসতে না আসতেই তবে চিঠি আসে কি করে? কিন্তু না সত্যিই। এই ঠিকানারই চিঠি বটে। এইতো লেখাই রয়েছে লেফাফার উপরেই ১০নং আলিপুর টেরেস। কিন্তু এর মধ্যেই আলিপুরের আমাদের ট্রেস পেলো কি ক'রে আমাদের শত্রু মিত্ররা? খাম খুলতে খুলতে কেমন একটা চকচকে আওয়াজ পেলাম। খামটা চকচকে বটে, কিন্তু তা বলে যতই চাকচিক্য থাক, তার থেকে চক চক শব্দ কেউ আশা করে না। তা বরদাস্তও করা যায় না কখনোই। খাম-টামের অতো অহঙ্কার থাকা ভালো নয়।

'শ্রীযুক্ত নতুন প্রতিবেশী সমীপেষু—'

যুতসই ভণিতা দেখেই চট করে চিঠির শেষে চোখ বুলোতে গেলাম—কোন্ মহাত্মনের লেখা দেখা যাক। না, নাম ধাম নেই কারো। বিলকুল একখানা চিঠি।

প্রতিবেশীর প্রতি বেশী রকম ভালোবাসা থাকে না সকলের, থাকবার কথাও নয় তা মানি, কিন্তু তা বলে, সে আসতে না আসতেই তার প্রতি এইরূপ বেনামা ছুঁড়ে মারা, এই বা কিরকমের ভদ্রতা? অ্যাঁ?

…শ্রীযুক্ত নতুন প্রতিবেশী সমীপেষু, সবিনয় নিবেদন মহাশয়, আপনি আমাদের নতুন প্রতিবেশী…

জানি মহাশয়, জানি—কিন্তু দুঃসংবাদ অমন বার বার বেশী বেশী করে মনে করিয়ে দেবার মানে কি বলুন তো? আসতে না আসতেই চান কি যে এখান থেকেই আমরা উঠে যাই?

চিঠিখানা রেখে দুধ খেতে যাই। দেখি বাটি ফাঁক। অজান্তে কখন খেয়ে বসে আছি। যাক বাঁচা গেল। দুধের মত একটা অখাদ্য যে অন্য জনে খেতে পেরেছে সেটা আমার সৌভাগ্যই।

কিন্তু যার বোন আছে, বিনির মত বোন আছে তার সৌভাগ্য বলে কিছু নেই। তার ইচ্ছে বনবাস। আরেক বাটি দুধ হাতে সে হাজির, আবার সাথে এক প্লেট হালুয়া!

—আরে এই তো খেলাম রে, আবার এখুনিই? আমি আপত্তি করি। এই ঘন ঘন পথ্যি করলে কি মানুষ বাঁচে? বিশেষ হার্ট যাদের খুব উইক? তাতে ট্রাবলস সারে যদিও তার, শেষটায় হয়তো পেটের ট্রাবলেই সে মারা যায়।

—কিন্তু ডাক্তার বলেছে না ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াতে?

—তোর এর মধ্যেই এক ঘণ্টা হয়ে গেল।

তাক লাগে আমার। আলিপুরে আবহাওয়া মিনিটে মিনিটে বদলায় বলে শুনেছি বটে। কিন্তু তা বলে ঘণ্টারা কিছু আবহাওয়ার মতই বদলাতে পারে না! তাদের বদলাতে পাকা ষাট মিনিট লাগে, যেমন লাগতো কলকাতায়। অবশ্যি সময়তত্ত্বে আমি বিশেষজ্ঞ নই ঘড়ি দর্শনেও পোক্ত নই তেমন, তা ঠিক, কিন্তু তাহলেও আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির যদ্দূর ধারণা এক একজামিনেশনের হল ছাড়া আর কোথাও পনের মিনিটে ঘণ্টা কাবার কখনো হয় না।

তবে কিনা, এখানেও তো আমি একটা পরীক্ষার সম্মুখীন। জীবন-মরণই পরীক্ষা। আর সেই জন্যেই যদি—। সেজন্যেই

কিনা বিনির কাছে আমি জানতে চাই। বিনির জবাবে যা পাওয়া গেল, তা হচ্ছে এই—ডাক্তারের উপদেশ যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়, তাহলে দিনে রাতে চব্বিশবার খাওয়াতে হয় আমায়।- কিন্তু দুঃখের বিষয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার ঘণ্টাই নাকি আমি নাক ডাকাই। আর নাক থেকে হলে—'নাক থেকে নয় ঘুম থেকে'—আমি আবার ভুল শুধরে দিই—যাগ সেই নাকামো থেকে তুলে আমাকে কিছু গেলানোর মত দুঃসাধ্য কাজ আর দুটি নেই আর তা নাকি ওর কম্মো না। তা ছাড়া রাত বিরেতে সেও নাকি একটু ঘুমোতে চায়। ঘুম পেলেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। সে—ও আর আমার মত অতোটা না হলেও, ঘুমোতে একটু ভালোই বাসে তার ঘুমোনোর সময়ে আমাকে তুলেই বা কে আর খাওয়ায় বা কে? তাকে তোলে খাওয়ানোর জন্যেই মানে, তাকে নয় আমাকে খাওয়ানোর জন্যেই।

এই সব ভেবে চিন্তে সে ঠিক করেছে যতোক্ষণ আমি জেগে থাকি তার মধ্যেই উঠে প'ড়ে যেমন করে হোক বার চব্বিশেক আমায় খাইয়ে দেবে। এবং সেই মহাচেষ্টাতেই এই...

'খাওয়াও'। হাল ছেড়ে দিয়ে আমি বলি—'খাইয়ে যাও' পড়েছি মোঘলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। দুধের বাটিট রেখে হালুয়ার প্লেটটা হাতে নিই। চামচেয় করে মুখে তুলে এক একটু করে চাখি। চাখতে চাখতে আবার শুনি সেই চকচকানে ধ্বনি আমার খারাপ লাগে এবার। এই কালো ভুতের মতন হালুয়া কোনোই চাকচিক্য নেই এর কোন খানেই মুখে তুলতে না তুলতেই এও যদি চকচকে আওয়াজ ছাড়ে তো গা জ্বালা না ক'রে পারে না। এমন বিচ্ছিরি হালুয়ার মুখে এমন চোকা চোকা বুলি —বড্ডোই বাড়াবাড়ি, নিতান্তই আদিখ্যেতা।

কিন্তু না, প্লেটে নয় দুধের বাটিতেই সেইচক্কার টেবিলের ওপরে শুধু সেই বাটিটা তার সীমানায় কেউ নেই। এক সীমান্তে

কেবল আমি। আর সেই বাটির সম্মুখেই অদ্ভুত উক্ত আওয়াজ চক্‌চক্‌ করে যেন দুগ্ধ পান করছে। হকচকানো ব্যাপার। বেশ করে রগড়ে খালি চোখে তাকালাম ভাল করে—টেবিলে শুধু সেই দুধের বাটিটা, কেউ নেই কিছু নেই তার কাছাকাছি—খালি সেই বাটিটা। দেখতে না দেখতে বাটিটা খালি হয়ে গেল।

অবাক কাণ্ড। বুক জ্বর জ্বর করতে লাগল। হার্ট ট্রাবল বাড়তে লাগলো নিজের থেকেই। অ্যাঁ এ আবার কি গো, এক চকরবরতির সামনে এ আবার কোন চকরবর্তী? কোন চক্রান্ত কর্তা? তখনই মনে পড়লো ব্যাপারটা খুব অশ্রুতপূর্ব না একটু আগেই এমনি চক্‌চক্‌কার যেন আরেক বার শুনেছি। আগের বাটিটাও তাহলে...এমনি নিজগুণেই? তবে কি আমি নিজে ফাঁক করিনি সেটাকে?

বিনি! বিনি! বিনি—। আমার আর্তনাদ ফোটে। আমার চীংকারে সে ছুটে আসে—কি হয়েছে, কি হয়েছে দাদা?

কী আবার হবে ঐ ছাখ। আমি দেখাই। অদৃশ্য কিন্তু অশ্রুত মনকে দেখাতে যাই। দেখাতে গিয়ে অন্য দৃশ্য দেয় এবার। ঘরের কোণে কতকগুলি অগ্নি শলাকা ছুটাছুটি করছে দেখতে পাই।

ওমা একি...। বিনি গালে হাত দেয়। সে অবাক। আর আমি? আমি ত হতবাক তার আগেই খানিক বাদে ওর কথার জবাব দিতে গিয়ে নিজের গোঙানি আমার কানে আসে।

ভূতুড়ে বাড়ি নাকি দাদা!

—কে জানে দিদি। বলতে গেছি একথাটাই। কিন্তু সমস্ত বাক্যটা প্লুতস্বর হয়ে বেরিয়ে আসে এক কথায় গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ ...আমি বলতে থাকি। আপ্লুত হয়ে।

তোমার গোঁয়ার তুমি থামাও তো। বলে বিনি এক জালা ঠাণ্ডা জল এনে আমার মাথার উপর ঢেলে ছায়। এই সব কাণ্ডেই ভড়কে গিয়েই কিনা কে জানে! জলন্ত ফলকগুলি ঘরময় ছুটো-

পাটি লাগিয়ে দেয়। ততক্ষণে আমার সম্বিৎ ফিরে এসেছে।—

—বোল বলতে কি বহ্নি বলতে আমাদের বাড়িতে তুই-ই ছিলি এক মাত্র। এক মাত্রই বল আর এক মাত্রায় বল···আমি বলি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এ বাড়ীতে তোর প্রতিদ্বন্দ্বিনী আছে অনেক আছে। মানে এটা ভুতুড়ে বাড়ী নয়। ঐ বহ্নি-শিখারা ভূত নয় কখনোই। পেত্নী।

—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পেত্নী বলা হচ্ছে আমায়? বটে? বুঝতে পারছি এখনও তোমার জ্ঞান সঞ্চার হয়নি ঠিক মতন। দাঁড়াও বলে সে আরেক বালতি জল আনতে যায়—ভাল করে আমার চৈতন্য সম্পাদনের মতলবেই।

যাবার মুখেই অযাচিত কার ল্যাজে যেন পা পড়ে যায় ওর আর সে (বিনি নয়। সেই অদৃশ্য লাঙ্গুলধারী) ম্যাও-ও বলে চেঁচিয়ে ওঠে। মাগো বলে একলাফে সে চার পা পিছিয়ে আসে।

আর চতুর্থ বারে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে।

জীবটি অদৃশ্য হলে কী হবে তার আওয়াজ বেশ সুশ্রাব্য—সুখশ্রাব্যই। আর বিনির পায়ে তার আঁচড়ানি একবারেই অদৃশ্য নয়। সুদৃশ্যই বলতে হয়। তারপর আইডিন লাগাবার পর সেই পায়ের বাহার যা খোলে। দেখবার মতোই।

—বেড়ালের ভূত। —বিনি বলে।

—উঁহু। ভূতুড়ে বেড়াল। আমি তার ভ্রম সংশোধন করি মাগো বেড়াল মরে ভূত হয় জানতুম না সাত জন্মে আঁচড়িত আইডিন-চর্চিত শ্রীচরণে সে হাত বুলোয়। —আবার ম'রে ভূত হবার পরেও এমন বেঁচে জলজ্যান্ত থাকে তা কে জানতো।

বেড়ালের ভূত মানুষের কোন ক্ষতি করে না। করতে পারে না। বরং ভেবে দেখলে—আমি ভেবে দেখি মানুষের উপকারেই লাগে। মনে কর তুই যেমন ঘণ্টায় চার বার করে আমায় দুধ গেলাবার জন্য কোমর বেঁধেছিস, তাতে ঐ ভূতুড়ে বেড়ালটা এখানে না

থাকলে আমার কি দশা হতো? আমি কি বাঁচতাম? ওর সাহায্য না পেলে কি—

—তোমার আদরের বেড়াল নিয়ে তুমি থাকো। আমার বোনার কাজ ফেলে এসেছি - বলে আমার আদুরে বিনি ব্যাজার মুখে চলে যায়।

এবার আমি চিঠিখানা নিয়ে পড়ি—

মহাশয়, আপনি আমাদের নতুন প্রতিবেশী। ঐ দশ নম্বর বাড়ীর রহস্য হয়ত আপনার জানা নাই। সেই জন্যই আপনাকে সমস্ত জানাবার প্রয়োজনবোধ করছি।

হ্যাঁ খুলেই বলি সব—যে বাড়ীতে আপনারা এসে উঠেছেন, বছর দুই আগে আমরাই সেখানে থাকতাম। কিন্তু যে কারণে ঐ বাড়ী—অমন চমৎকার বাড়ী—আমাদের ছাড়তে হোল সেই কথাই বলছি।

মাঝের যে ঘরটায় এখন আপনি এসে আছেন ওইটায় আমার শোবার ঘর আর তাঁর ল্যাবরেটারী। আমার কাকা একজন পাস করা বৈজ্ঞানিক! নাম করলেই টের পাবেন বলে এর বেশী আর জানালাম না। ঐ লাবরেটারীতে বসে তিনি নানা রকমের গবেষণা করতেন। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতো তার ঐখানেই। এমনি করতে করতে হঠাৎ একদিন তিনি অদৃশ্য হওয়ার উপায় আবিষ্কার করে বসলেন। পরীক্ষায় লাগানোর কাজে কতগুলো বিলাতী ইঁদুর তিনি আনিয়েছিলেন।

ইঁদুরগুলো সাহেবদেরই মতো শাদা! সেই শ্বেতকায়দের নিয়েই তাঁর যতো পরীক্ষা চলতো। সেদিনের কথা এখনো আমার স্মরণে আছে। "হাঁকা হাঁকি করে তিনি ডাকতে লাগলেন সবাইকে! সবাই আমরা ছুটে গেলাম—তার গবেষণা ঘরে। তিনি বল্লেন—ত্যাখ। কি হয়েছে ত্যাখ।"

সবাই আমরা চোখ প্যাঁট প্যাঁট করে তাকালাম। না, দেখবার কিছু নেই কোথাও—কিছু নেই।

দেখছিস না খাঁচাটা? চেয়ে ছাখ্ ভালো করে। বলে তার সাহেবী ইঁদুরের খাঁচাটা দেখালেন। দেখলাম, যে খাঁচাটায় তার ইঁদুর সাহেবরা থাকত সেটা বিলকুল ফাকা, কোথায় গেল ইদুর গুলো? জিগ্যেস করলাম আমরা।

—আছেরে। ওইখানেই আছে। ওর মধ্যেই রয়েছে।—গাবের হাসি হাসলেন কাকা—অদৃশ্য হয়ে রয়েছে সবাই।

আমার কাকা ভারি চালাক লোক। অদৃশ্য হয়ে যাবার পর পাছে ভগবানের মতোই তাদের অস্তিত্বে কেউ অবিশ্বাস করে সেই জন্যে আগের থেকেই তাদের গায়ে জ্বলজ্বলে কোন জিনিস লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলুম সত্যিই তো। কতক গুলো উজ্জ্বল আলোকবিন্দু খাঁচার ভিতর ঝলমল করছে। জাজ্বল্য মান একপাল তিড়িং তিড়িং।

সবাই আমরা খাঁচার চারধার ঘিরে দাঁড়ালাম। আমাদের দেখে সেই আলোর কণাগুলি এমন লাফঝাফ লাগালো যে বলবার নয়। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে একজন আমাদের খাঁচার দরজা খুলে দিলো একবার—কী মজা হয় দেখবার জন্যে, তারপর আর দেখতে হলো না। দেখতে না দেখতে জ্বলন্ত ফোঁটাগুলি বেরিয়ে পড়লো খাঁচা থেকে—ছিটকে পড়লো, ছড়িয়ে পড়লো। ছিটকে পড়লো চারধারে— ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল ঘরময়।

কাকা তখনি আমাদের তাঁর ঘর থেকে বার করে দিয়ে খিল এটে দিলেন। তিনি খুব চটে গিয়েছিলেন আমাদের এই কাণ্ডে —এই অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে, তা বলাই বাহুল্য। তারপর কি হলো শুনুন তার দিনকতক বাদে। যখন সেই অদৃশ্য ইঁদুরের কথা আমরা ভুলে গেছি। কাকার আবিষ্কার কাহিনী আর আমাদের মনে নেই, খেতে বসেছি আমরা সবাই গোল ঘরটায়। কাকীমা

পরিবেশন করছেন। এমন সময়ে কাকীমার আদরের মেনি বেড়ালটা বেড়িয়ে ফিরলো বাহির থেকে। এসে জমলো আমাদের পাতের গোড়ায়। বসে খালি সে মুখ মুছতে লাগলো নিজের। মুখের ভাব ভারী হাসি খুশী। কোথা থেকে তিনি যে বেশ কিছু সাঁটিয়ে এসেছেন তা বুঝতে পারা শক্ত নয়।

তারপর কি বলবো মশাই—বসেছিলো বেড়ালটা আমাদের সবার চোখের সামনেই। চোখের ওপরেই সেটা কেমন ছায়ার মত ঘোলাটে হয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই ছায়া মূর্তি ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল একবারে। দেবতারা যেমন অন্তর্হিত হন ঠিক সেই মতন।

আমরা খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম।

কাকাবাবু খেয়ে দেয়ে ঝিমুচ্ছিলেন তাঁর বেতের চেয়ারে। আমরা ছুটে গিয়ে ঘটনাটা তাঁকে জানালাম—তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে। কিন্তু বিশদ করে সব বোঝাবার আগেই তিনি লাফিয়ে উঠেছেন, তার সযত্ন সমুজ্জ্বল লাঙুলের কতোখানি কোন অদৃশ্য জীবের তাড়নায় তাঁর কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো আচমকা। তিনি তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ালেন একলাফে। কাকীমার বেজায় আদরের ছিল বেড়ালটা, তার অন্তর্ধানে তার প্রাণে কিরকম ব্যথা লেগেছিল অনুমান করতে পারবেন। নামজাদা বিজ্ঞানীর বৌ হলে কী হবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যাকে বলে তা তার আদপেই ছিল না। বেড়ালের তিরোধানে মর্মাহত হয়ে কাকাবাবুকেই তার জন্য দায়ী করে তার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না বলেই কাকীমার বুদ্ধি ছিল একটু বেশী। একদিন তিনি করলেন কি একটা বড় জামবাটিতে দুধ ভর্তি করে রেখে দিলেন ঘরের মেঝেয় আর আমাদের সবাইকে বলে দিলেন ম্যাও ম্যাও করে বেশ মৌজ করে গলা সাধতে।

আমরা সাধ্যমত সুর করছি। আমাদের সাধাসাধিতেই কিনা বলা যায় না। দেখলেই বাটির দুধ কমে আসছে—কমতে সুরু করেছে ক্রমেই। আমাদের সুরধুনি নামতেই না, বেড়ালটা তার অদৃশ্য গোঁফ ডুবিয়েছে দুধ পাথারে। দুধের সেই কমতির মুখে, কাকীমা করলেন কি—সুকৌশলে তার পুষিকে পাকড়ে ফেললেন। তাকে ধরে না তার গলায় একটি লাল রঙের রুমাল বেঁধে দিলেন কায়দা করে।

তারপর থেকেই যতো অদ্ভুত কাণ্ড আরম্ভ হোল আমাদের বাড়ি নিত্য নতুন মজা। কোথাও কিছু নেই। বাড়ীময় একটা লাল রুমাল ঘুর ঘুর করছে—লাফিয়ে ঝাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারধারে। কখনো বা দেখা যেত কতগুলি অগ্নিবিন্দু হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে আর তাদের পিছু পিছু তাড়া করে চলেছে উদ্যত এক লাল ঝাণ্ডা। যাক দেখতে দেখতে সব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেল।

তারপর এলো আরেক উৎপাত—তার কিছুদিন পরেই। মনে হোল অগ্নিপুচ্ছদের সংখ্যা ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে—এদিকে পুষির বংশবৃদ্ধিরও খবর পেলাম আমরা প্রচুর কচিগলায় মিশানো মিহি আওয়াজেই তা জানা গেল। চারধার থেকেই অদৃশ্য কণ্ঠের অবিশ্রান্ত মিউমিউ শুনে আর অফুরন্ত আলোর ঝিলমিল দেখে সবাই আমরা কেমন মিইয়ে গেলাম—এমন কি আমাদের বৈজ্ঞানিক কাকাবাবুও। কুরুবংশ আর পাণ্ডুবংশ—দুই পক্ষেই বাড়তে লাগল মা-ষষ্ঠীর আশীর্বাদে। আর সেই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে বাস করা আমাদের নিতান্তই কঠিন হয়ে উঠল। আমরা পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য হলাম তারপর।

সেই থেকে ও বাড়ী খালিই পড়ে ছিলো অ্যাদ্দিন। এখন আপনারা এসেছেন। যাই হোক আপনারা যেন ঘাবড়াবেন না যদি আপনার আনাচে কানাচে অগ্নিশিখাদের নড়ে চড়ে বেড়াতে দেখেন, যদি কখনো বা হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখতে পান বা

কোন অলক্ষিত নখরের লক্ষ্য হন জানবেন সেটা বিজ্ঞানের জয়স্তম্ভ। আমাদের কাকাবাবুর দান। তার সৃষ্টির আনন্দ—বৈজ্ঞানিক খুশি। আর কাকীমার পুষির বংশ বিস্তার। তার জন্য ভয় পাবেন না যেন। অদ্ভুত হলেও ভূত নয় ওসব। বেড়ালের ভূতটুত না—শুধু সেই একটি বেড়ালই বেড়ে বেড়ে এখন প্রভূত হয়েছে। এইমাত্র। প্রীতি নমস্কার নিন,

ইতি আপনাদেরই এক অদূর প্রতিবেশী।

পুনশ্চ মাছ—আর দুধের পাত্র সব সময়েই ঢাকা দিয়ে রাখতে যেন ভুলবেন না।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বিনির ঘরে যাই। এ বাড়ীর ওখানকার বাড়াবাড়ির সব রস সমস্ত রহস্য আবিষ্কার করতে চাই তার কাছে। গিয়ে দেখি বিনি দেবী বেতের চেয়ারে বসে বেতসের মতই কাঁপছেন—তার দুচোখ ভয়ে বিস্ফারিত। আর তার আধ-বোনা ব্লাউজখানা পড়ে আছে এক ধারে একান্ত অবহেলায়। এবং তার উলের গুলতি নিয়ে—

গুলতি নিয়ে সাত দিক থেকে সাতটি অদৃশ্য খেলোয়ার ফুটবল খেলতে লেগেছে দেখলাম। তারপর আর রহস্য বিস্তার করেও কোন ফল হোল না। বিজ্ঞানের মহিমা ফলাও করেও নয়—বিনি সেইদিনই সেইদণ্ডেই—আমাকে নিয়ে চলে এলো সেখান থেকে। চলে এলাম আমাদের পুরানো বাড়ীতে—আমার পুরাতন হাট ট্রাংকে। সে বললে শুধু একটা কথায় বললে—হ্যাঁ মানি এটা বিজ্ঞানের যুগ। কিন্তু তা বিজ্ঞানের সব দান আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে, এমন কি তা অ্যাটম বোমা হলেও একথা আমি মানতে রাজি নই।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ভালো, খুবই ভালো, কিন্তু তার কাছাকাছি বাস করা কোনো মতেই ভালো নয়।

শিবরাম চক্রবর্তী

জন্ম ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। বাংলা কথাসাহিত্যে পঞ্চাশোর্দ্ধ বছরের ইতিহাস শিবরাম চক্রবর্তীর অবাধ বিচরণ। কিশোর সাহিত্যে তার অবদান এখন কিংবদন্তীর মতো। বাংলা ভাষার পাঠক তাঁর বই পড়েন নি, এমন ঘটনা বিরল। জীবনে তিনি কত গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার সঠিক হিসাব পাওয়াও মুস্কিল। শিবরামের রচনায় সহজাত সরসতা এবং শব্দের অতুলনীয় অনুপ্রাস রীতিমত বিস্ময়কর। তাঁর আত্ম-জীবনীমূলক রচনা 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা' বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সংযোজন। কিশোর-কিশোরীদের মনস্তত্ত্বে লিখিত অজস্র রচনায় ভৌতিক পরিবেশ এবং অনুষঙ্গ বারবার তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচনা যে কোনো বয়সের পাঠকের হৃদয়ে সুদীর্ঘকালের সঞ্চয় হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই।

শিবরামের 'ভুতুড়ে ও অদ্ভুতুড়ে' গ্রন্থের অন্যতম গল্প "দশ নম্বর বাড়ীর রহস্য" এক নূতন আস্বাদ নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। লেখকের পাত্রপাত্রী সংবাদ, ভূত ও অদ্ভূত, মস্কো বনাম পণ্ডিচারী, মেয়েদের মন ইত্যাদি গ্রন্থ হাসির অমনিবাস হিসাবে পরিচিত। শিবরামবাবুর পৈত্রিক নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলায় তবে আজন্ম কলিকাতা নিবাসী চক্রবর্তী মশাই ব্যক্তিগত জীবনে অকৃতদার, হাস্যরসিক ও আলাপচারী মানুষ হিসাবে সর্বজন প্রিয়।



প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনেক দিন থেকেই সাধ, অকূল বিশাল কোনো নদীর উপর পানসি ক'রে কয়েকটা দিনরাত্রি খেয়াল মতো স্রোতে ভাসিয়ে কাটিয়ে দব। অনেক দিন থেকে—মানে 'ছিন্নপত্র' পড়া অবধি। সেই যে কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া আলগা ছবি ছেলেবেলায় চোখের উপর ভেসে উঠেছিল, চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মতো বিছিয়ে থাকা বালুচর, মাঝ রাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে বুনোহাঁসের পাখার শব্দ—সে আর মন থেকে কোনো কিছুতেই মুছে যায় নি। সে-সব মধুর নামগুলোও ভুলি নি। শিলাইদহ তো পৃথিবীর কোন জায়গা বলে মনে হয় না আমার এখনো। সে যেন কোন রূপকথার ভৌগোলিক নাম। আমার ছিন্নপত্রের 'পদ্মায়' তো বেলি ব্রাদার্সের পাটের স্টিমার যায় না, সে-পদ্মা সাত সমুদ্দুর তেরোনদীর একটি—রুপো-গলানো, তার জলে ঢেউ তুলে মধুকরের সপ্তডিঙাকে বড় জোর আমার মন ছেড়ে দিতে পারে দূর-সিংহলে বাণিজ্যে যেতে।

ছেলেবেলায় সে সাধ হঠাৎ এবার পূরণ হয়ে গেল। একেবারে পুরোপুরি পূরণ হয়ে গেল, তা বলতে পারিনা, কারণ নদীটা পদ্মা নয় —ধলেশ্বরী। তাতে কিন্তু এমন কিছুই এসে যায় না। সব নদীই আশ্চর্য্য নদী, এপার থেকে ওপার ঝাপসা দেখলেই হোল, ফুলে উঠলেই হলো হাওয়ায় দূরের নৌকোর পাল, আর রাতের অন্ধকারে চঞ্চল জলের স্রোতে ভেসে গেলেই হলো তারার ছায়া।

বরং আসল পদ্মায় ঠিক শিলাইদহ নামটি ধরে খোঁজ করতে গেলেই খারাপ হতো। মনের ছবির সঙ্গে চোখের ছবির কেবল লাগতো কাটা-কাটি—মারা-মারি, আমার স্বপ্ন যেত ভেঙে, আর স্মৃতিও জমতো না মধুর ক'রে। আর আমার ধলেশ্বরীর বা অভাব কিসের। সেও ছোট খাট রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে বর্ষার প্লাবনে ভাঙ্গন ধরায় লোকালয়ের কূলে। তার বুকে চর জাগে স্বপ্নের মত', চখা-চখির ডাকে তার দুকূল কেঁদে ওঠে অন্ধকার রাত্রে।

মাঝারি সাইজের একটি পান্‌সি ভাড়া করে নিলাম। মাঝি মাল্লা, চাকর বাকর নিয়ে সবশুদ্ধ আমরা ছ'জন মাত্র।

এত লোকেরও বুঝি দরকার ছিল না। বিনা তাড়াহুড়োয় ধীরে সুস্থে যেমন খুশি, ভেসে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ, বড় বড় গঞ্জে কি লোকালয়ে ভীড় করা ঘাটে নয়, শূন্য-নির্জন তীরে তীরে। শুধু পাখীর ঝাঁক-বসা চড়ার ধারে ধারে। তার জন্যে একা চরণ মাঝিই যথেষ্ট। অধিকাংশ সময়েই তো আর সবারই ছুটি,একা চরণ বসে থাকে হালে কাঠের মূর্তির মতো। শুধু যখন মেঘনার মোহনায় গিয়ে পড়বার উপক্রম হলো তখন স্রোতের উজান ঠেলে যেতে দাঁড়ে হাত দিতে হয় অন্য মাঝিদের।

'ছিন্নপত্রে'র স্বপ্নের কুয়াশা মনের মধ্যে না থাকলে পান্‌সির জীবন বেশ পানসে হয়ে উঠতে পারতো। গরমিল তো কম নয়। 'ছিন্ন পত্রে'র পদ্মায় কচুরি পানার কুৎসিত জঙ্গল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তা ছাড়া রামসেবকের রান্না থেকে চরণ মাঝির চেহারা পর্যন্ত-খুঁত ধরবার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু আমি ছিলাম ও সবের প্রায় ওপরে।

প্রায় ওপরে, এই জন্যে বলছি যে, চরণ মাঝির চেহারাটা সব সময়ে ঠিক স্বাভাবিক ভাবে বরদাস্ত করতে পারতাম না। এক-এক সময়ে নিজের অজান্তেই বুঝি শিউরে উঠেছি। যখন মাঝ রাত্রে আর সবাই গড়িয়ে পড়েছে পান্‌সির খোলে, আর মেঘঢাকা চাঁদের আলোয় ধলেশ্বরী

থম থম করছে,তখন মিশরের মমির মতো শুধু চরণ বসে আছে নিস্পন্দ ভাবে হালে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ মনে হয়েছে,আবার সেখানেই ফিরে যাই। সেখান থেকে তবু অন্য মাঝিদের নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। তাতেও যেন অনেকখানি ভরসা।

সত্যি, জ্যান্ত মানুষের এমন অদ্ভুত মরা চেহারা হতে পারে, এ আমি আগে কখনো জানতাম না। রঙ তার কালো বলে নয়, কালো তো সব মাঝিই, কিন্তু তার চামড়ায় যেন অপার্থিব বিবর্ণতা। যেন অনেক দিন মাটির তলায় সে চাপা পড়ে ছিল। এই সবে মাত্র যেন উঠে এসেছে শ্যাওলাধরা ভিজে-মাটি মুছে গা থেকে।

লোকটার ধরন-ধারণও অদ্ভুত। কথা সে খুব কমই কয়, অত্যন্ত ভারি হাঁড়ির মতো গলায় শুধু একটু-আধটু 'হাঁ না' ছাড়া আর কিছু বলতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। অন্য মাঝিদের সাথে তার মেলা-মেশাও নেই তবুও সবাই যেন একটু সভয়ে তাকে সমীহ ক'রে দূরে রেখে চলে, সে কেবল তার মরা-চামড়া সত্ত্বেও দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার জন্যে।

সেদিনও মেঘে-ঢাকা ভাঙা-চাঁদের মরা-জ্যোৎস্নায় চারিদিক ছম্ছম্ করছে।

সন্ধ্যে থেকেই মাঝিদের মধ্যে একটু ফিস ফিস শু ছিল ম। রাত একটু হতেই তার কারণটা বোঝা গেল।

একজন মাঝি সাহস ক'রে এগিয়ে এসে, কান মাথা চুলকে,আমতা আমতা ক'রে জানালে যে, আমি যদি তাদের ছুটি দিই, তাহলেই তারা একটু ভালো 'যাত্রা' শুনে আসে।

'যাত্রা'কোথায় হচ্ছে, হেসে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম খানিক আগে যে গঞ্জ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেইখানেই নাকি ভারি নামজাদা এক দল এসেছে। এমন 'যাত্রা'শোনবার ভাগ্য নাকি এ-তল্লাটে সহজে মিলবে না। আমার মুখের ভাবে ভরসা পেয়ে সে আমাকেও সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব ক'রে ফেলে এবার।

হেসে বললাম-না মাঝির-পো, আমার অত শখ নেই, তবে তোমরা শুনে আসতে পার, ইচ্ছে হয়েছে যখন, কিন্তু গঞ্জের ঘাটে তো আমি থাকতে পারব না।

মাঝি তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে জানালে যে, আমায় সে-কষ্ট তারা দেবে না। এখান থেকে কতটুকু আর পথ, তারা পাড় দিয়ে হেঁটেই যাবে। যাত্রা ভাঙলেই ফিরে আসবে ভোর বেলায়, কিন্তু আমার ভয় করবে না তো?

হেসে বললাম—তা যদি একটু করে মন্দ কি!

মাঝি সাহস দিয়ে জানালে—এখান ভয়ের অবশ্য কিছুই নেই। জলঝড়ের সময় নয়, নৌকো নোঙর-বাঁধা থাকবে নিরাপদ জায়গায়।

হঠাৎ কেন যে জিজ্ঞাসা করলাম জানি না— চরণ মাঝি যাচ্ছে তো তোমাদের সঙ্গে?

মাঝির মুখে 'যাচ্ছে বই কি কর্তা' শুনে কেমন যেন আশ্চর্য বোধ করলাম বলেই একটু লজ্জিত হলাম।

মাঝিরা সব চলে যেতেই একবারে পান্সির কামরার ছাদে উঠে গিয়ে বসেছিলাম। এমন অপরূপ নির্জনতা ভোগ করার সৌভাগ্য কখনো তো হয় নি। মাঝিরা সবাই চলে গেছে, হিন্দুস্থানী ঠাকুর রাম সেবকও পর্যন্ত সঙ্গে গেছে হুজুকে পড়ে। দূরে কোথাও একটা ছুটো নৌকার আলো পর্যন্ত নেই, বিশাল ধলেশ্বরীর বুকে আমি একা—এ-কথা ভাবতেও কেমন যেন পুলকের রোমাঞ্চ হয়।

ঠিক পুলকের রোমাঞ্চ কিন্তু পরে সেটা রইল না।

রাত্রির নির্জনতায় ধ্যান করতে করতে কখন বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দেখি, চারি দিকের দৃশ্য বেশ বদলে গেছে, ভাঙা চাঁদ পশ্চিমের দিগন্তে ঢলে পড়ে কেমন যেন ফ্যাকাশে হলদে হয়ে উঠেছে। সেই ফ্যাকাশে হলদে চাঁদের আলোয় কূলহীন ধলেশ্বরীর রুগ্ন মলিন চেহারাটা ভারি অস্বস্তিকর লাগল। একটা নাম-না-জানা পাখি

দূর-আকাশে কিবকম আর্তনাদের মতো ডাকছেড়ে উড়ে গেল। শিউরে উঠলাম একটু।

বুঝলাম এতক্ষণ এই খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমানো উচিত হয়নি। অনেকক্ষণ হিম খেয়ে শরীরটা কেমন যেন ম্যাজমেজে হয়ে উঠেছে, মনটাও সেই সঙ্গে।

ওপর থেকে নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ থমকে গেলাম। এদিকে এতবড় একটা বিশাল পোড়ো বাড়ি ছিল নাকি! বাড়ি না বলে তাকে প্রাসাদই অবশ্য বলা উচিত। ফাটলধরা বিশাল দেওয়ালগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েও এখনো যেন আকাশ আড়াল ক'রে আছে। বুঝলাম এতক্ষণে জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় এই পোড়ো-প্রাসাদ কুয়াশায় মিশেছিল, চাঁদ এখন তার পিছনে গিয়ে পড়তেই অন্ধকারের দৈত্যের মতো জেগে উঠেছে। এই পোড়ো-প্রাসাদ সম্বন্ধে কাল মাঝিদের কাছে খোঁজ নিতে হবে ভেবে আবার নামতে গিয়েও থামতে হলো।

পেছনে কি একটা ঝন্ ঝন্ করে শব্দ হলো যেন। সত্যি বলছি, এবার ফিরে চেয়ে গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। নিজেকে একেবারে একা বলে জানবার পর হঠাৎ পেছন ফিরে আর একটি লোককে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলে গায়ে কাঁটা দেওয়া অস্বাভাবিক বোধ হয় না।

একি চরণ। প্রায় ধরা গলায় বললাম—তুমি কখন ফিরলে। যাত্রা দেখলে না?

সে শেকল-সমেত নোঙরটা তুলে পান্‌সির ওপর রেখে গম্ভীর স্বরে বললে—না!

কিন্তু নোঙর তুললে কেন?—অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তার এভাবে একলা ফিরে আসাটা আমার ভালো লাগছিল না।

সে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে—দেখেছেন!

দেখিনি, কিন্তু এইবার দেখলুম। সেদিন রাত্রি শেষে যে অদ্ভুত

অসাধারণ সবঘটনা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে এসেছে আমার জীবনে, তখন তা তেমন ভালো ক'রে বোধহয় বুঝি নি।

পাড়ের ওপর জলের একেবারে কিনারায় একটি দীর্ঘ নারী-মূর্তি ব্যাকুলভাবে আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে।

কে ও? জানো নাকি! প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলাম বিস্ময়ে—উত্তেজনায়। হাল ঘুরিয়ে নৌকো সেই পাড়ের কাছে ভিড়াতে চরণ শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

পাড়ে ভিড়তে না ভিড়তে মহিলাটি যেন পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে এসে পান্‌সিতে উঠলেন। আমার কাছে এসে তারপর ভীত—ব্যাকুলস্বরে বললেন—আমায় বাঁচান! আমায় বাঁচান। দোহাই আপনার!

সে-অবস্থায় যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে বললাম—আমার যতদূর সাধ্য, চেষ্টা করব, কিন্তু কি ব্যাপার, আমার একটু জানা দরকার। আপনি আমার সঙ্গে কামরায় চলুন।

আঁচল ঢাকা দিয়ে কি যেন একটা ভারি জিনিস তিনি বয়ে এনেছিলেন। কামরায় চৌকাঠের কাছে সেইটের ভারে একটু হোঁচট খেতে ভদ্রতা ক'রে বললাম—ওটা বড্ড ভারি বোধহয়। আমার হাতে দিতে পারেন।

তিনি এ-কথায় এমন আঁত্‌কে উঠে পিছু হটে দাঁড়াবেন জানলে নিশ্চয়ই ও-কথা বলতাম না। তাই একটু বিমূঢ়ভাবেই নিজের কামরায় ঢুকে লণ্ঠনটা আর একটু উজ্জ্বল ক'রে দিলাম।

নিজের ব্যবহারে তিনিও বোধহয় একটু লজ্জিত হয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে আঁচলের আড়াল থেকে একটা অদ্ভুত-আকারের বাক্স বের ক'রে আমার সামনে রেখে তিনি বললেন—আমায় মাপ করবেন। আপনাকে অবিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি, কিন্তু ভয়ে ভয়ে এমনি হয়ে গেছি!

মহিলাটিকে কামরার আলোয় এতক্ষণে ভালো ক'রে দেখলাম।

চেহারায় তার স্পষ্ট বড় ঘরের ছাপ, কিন্তু কথাবার্তা ধরণ-ধারণ যেমন তার অদ্ভুত, তেমনি তাঁর পোশাক। যাই হোক, তখন সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয় তাঁর। কি আছে ওতে ?

তিনি কথা না বলে শুধু বাক্সের ভেতর কুণ্ডলী পাকান এক-রাশ সাপের চোখ যেন জ্বলে উঠল। চমকে গেলাম। সাপ নয়—হীরা মুক্তোর জড়োনো গয়না। তেমন গয়না আমি তো কখনো দেখি নি।

মহিলাটি মুঠো ক'রে কয়েকটা গয়না বাক্স থেকে তুলে কামরার মেঝেয় ছড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে সরে বসলাম। সেগুলো যেন জড় বস্তু নয়, ক্রূর সরীসৃপ।

দরজায় খুট ক'রে একটু শব্দ হতে মুখ তুলে দেখি—চরণ, কখন সেখানে নিঃশব্দে ছায়ার মতো এসে দাঁড়িয়েছে। তার কোটরে ঢোকা চোখেও যেন সাপের মতো হিংস্র লোভের ঝিলিক!

পলক ফেলতে না ফেলতেই সে সরে গেল। ভয় পেয়ে একটু বিরক্তির স্বরে বললাম—তুলে ফেলুন এসব বাক্সে। এসব সাংঘাতিক জিনিস নিয়ে আপনি কি বলে এই রাতে একা বেরিয়েছেন।

আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়েগয়নাগুলি বাক্সে তুলতে তুলতে তিনি বললেন—বেরুব না ? ওরা যে এসব ছিনিয়ে নিতে চায়।

ওরা কারা!

আমার শ্বশুর বাড়ির জ্ঞাতিরা। আমার স্বামী বিদেশে। ওদের এখন এই গয়নাগুলোর ওপর অসীম লোভ। ওরা সব করতে পারে এগুলোর জন্যে—খুন করতে পারে। কিন্তু আমি দেব না, কিছুতেই দেব না। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাই আমি পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু আপনি যাবেন কোথায় ?

যাব বাপের বাড়ি। ওরা আমায় দিন রাত আগলে রাখে, যেতে দেয় না। দোহাই আপনার! দু'ক্রোশ মাত্র গেলে আমার বাপের বাড়ি আমায় সেখানে পৌঁছে দিন।

আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ব্যবস্থা করছি- বলে আমি কামরা থেকে চরণকে আদেশ দেওয়ার জন্যে বেরোলাম।

কিন্তু আশ্চর্য্য। চরণ যেন আগে থাকতেই সব জানে। সে হালে বসে আছে। নৌকা চলেছে।

বললাম—ক্রোশ-দুয়েক বাদে নৌকা থামিয়ে খবর নিও।

নিশ্চল ভাবে বসে কি যেন একটা অস্পষ্ট জবাব দিলে। অত্যন্ত বিশ্রী একটা অস্বস্তি নিয়ে আবার আমি কামরায় ঢুকে বসলাম—আমি বাইরে যাচ্ছি, আপনি এ কামরার ভেতব দরজা দিয়ে দিন।

তিনি ব্যাকুলভাবে বললেন—না না, সে আরো ভয় করবে। আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।

উত্তরে কিছু বলবার আগেই টলে গিয়ে চমকে উঠলাম। একি। নৌকো হঠাৎ ঘুরে গেল কেন? চরণ মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে নাকি। পানসি নিজের খেয়ালে ঘুবছে!

টাল সামলে উঠেই বুঝলাম, আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। ডুবে যাওয়া চাঁদের শেষ ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, ঠিক যমদূতেব মতো চরণ এসে কামবার দবজায় দাঁড়িয়েছে। কি হিংস্র লোভ তাব অমানুষিক চোখে ও মুখে। বুকেব রক্ত হিম হয়ে যায় সেদিকে তাকালে

অপরিচিতা মহিলা আতঙ্কে চিৎকার ক'বে বাক্সটি সজোরে বুকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে বেরিয়ে এলেন বুঝি আমার কাছে সাহায্যেব আশায়। কিন্তু বৃথা। আমি বাধা দিতে যেতেই সবল হাতের একটি মুষ্টিতে মাথা ঘুরে সজোরে পড়ে গেলাম কাঠের মেঝের ওপর। মাথায় চোট খেয়ে তখন আমার কিরকম একটা আচ্ছন্ন—অভিভূত অবস্থা। চোখের সামনে যা ঘটছে, তা দেখতে পেলেও আমার যেন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, গলায় স্বর পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

মহিলা প্রাণপণে তাঁর মহামূল্য বাক্সটি রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে সে-দৈত্যের সঙ্গে তিনি পারবেন কি ক'রে।

ধীরে ধীরে বাক্সটি কায়দা ক'রে নিয়ে চরণ তাঁকে নৌকোর ধারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তিনি টলছেন একেবারে জলের কিনারায়। দারুণ হতাশায় শেষ শক্তি সংহত ক'রে তিনি প্রচণ্ড একটা টান দিয়ে বাক্স শুদ্ধ জলে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুশমনও।

এতক্ষণে একসঙ্গে গলার স্বর আর দেহের সাড়া পেয়ে আমি চিৎকার ক'রে ছুটে গেলাম পান্‌সির ধারে। মহামূল্য বোঝায় ভারি সেই বাক্সের টানে দু'জনেই তলিয়ে যাচ্ছে নদীর অতলে—কেউ তবু ছাড়বে না তার দখল।

সাঁতার জানি না, মহিলাটির সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েও কিছু করতে পারব না। আমি আবার চিৎকার ক'রে উঠলাম। যদি কোথাও কেউ থাকে, তার সাহায্যের আশায়।

চাঁদ ডুবে গিয়ে ভোরের প্রথম নীলচে আলোয় তখন নদীর কুয়াশা তরল হয়ে যাচ্ছে। কটা ইলিশ মাছের ডিঙি বুঝি কাছেই ছিল। চিৎকার শুনে তারা কাছে এসে ভিড়ল। ব্যাকুলভাবে এক নিশ্বাসে তাদের যথা সম্ভব সমস্ত ঘটনা জানিয়ে যেখানে তাদের দু'জনে ডুবেছে, সে জায়গাটা দেখলাম।

তারা প্রথমে গম্ভীর হয়ে শুনে হেসে উঠল। হেসে জানাল যে, এ-রকম আজগুবি ব্যাপার হতেই পারে না। যত ভারি জিনিসই হোক একেবারে গায়ে বাঁধা না থাকলে কাউকে একটানে ডুবিয়ে নিতে পারে না। তাও দু'-দু'টো লোককে। হাতে ধরে কাড়াকাড়ি করতে করতে ডুবলে দু'জন না হোক, একজন তো ভেসে উঠতোই। আর তা ছাড়া দু'ক্রোশ কেন এদিক-ওদিক বিশ ক্রোশের ভেতর প্রাসাদের মতো কোন পোড়ো বাড়িই নদীর ধারে নেই। দামী গয়নার বাক্স সমেত ও রকম মেয়েলোক আসবে কোথা থেকে।

আমি রেগে উঠে বললাম—তবে কি আমি মিথ্যে বলছি?

বৃদ্ধগোছের একটি মাঝি একটা ডিঙির এক কোণে বসে এতক্ষণ নীরবে তামাক খেতে খেতে আমার কথা শুনছিল। তারা কিছু বলবার

আগেই সে এগিয়ে এসে শান্তস্বরে বললে—না বাবু, আপনি মিথ্যে বলেন নি, আমি জানি আপনি জঙ্গল-বাড়ির বৌরাণীকে দেখেছেন।

তার সমর্থনে একটু ভরসা পেয়ে বললাম—জঙ্গল-বাড়ির বৌরাণা! তুমি জান তাহলে। কোথায় জঙ্গল-বাড়ি বলো তো?

খানিক চুপ ক'রে থেকে নিচে জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হঠাৎ বললে—ওইখানে বাবু। আজ পঞ্চাশ বছর হলো জঙ্গল বাড়িকে নদী টেনে নিয়েছে। তবে বৌরাণী তাঁর জ্বালা ভোলেন নি। এখনো মাঝে মাঝে কারো পান্‌সিতে এসে ওঠেন।

জেলেরাই আমার পান্‌সি তারপর তীরে পৌছে দেয় মাঝি-মাল্লারা যাত্রা থেকে ফিরে ব্যাকুল হয়ে তখন আমায় খুঁজছে। তাদের কাছে জানলাম, চরণ মাঝি তাদের সঙ্গেই ছিল সারারাত যাত্রার আসরে।

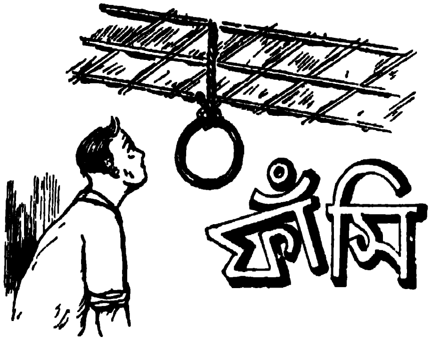
বুঝলাম, সব না হয় স্বপ্ন; কিন্তু আমার পান্‌সির নোঙর কে তুললে?

পান্‌সির ভাড়া চুকিয়ে পরের দিনই কলকাতায় ফিরেছি। কাজ নেই আমার আর পান্‌সি-বিহারে। আমি 'ছিন্নপত্র'ই পড়ব।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কল্লোল যুগের সাহিত্যিকের মধ্যে প্রেমেন্দ্রমিত্র অন্যতম। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রেমেন্দ্র মিত্র বেনারসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা ও ঢাকায় পড়াশুনা করেন ও যৌবনেই সাহিত্যানুশীলনে লিপ্ত হন। তবে সাহিত্যসেবার সাথে সাথে জীবন যাত্রা নির্বাহের প্রয়োজনে তাঁকে নানা বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। কালিকলম, রংমশাল, নবশক্তি, কবিতা ও বঙ্গবাণী ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদনার কাজেও দীর্ঘকাল নানা ভাবে নিযুক্ত থেকেছেন। যৌবনে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় প্রবাসী নামক পত্রিকায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র মূলত কবি। তার "সাগর থেকে ফেরা" কবিতা গ্রন্থ অ্যাকাডেমি

পুরস্কারে ভূষিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র আধুনিক কবিতার পথিকৃৎদের অন্যতম। তাঁর কবিতায় নতুন যুগের নবচেতনার প্রকাশ স্বভাবতই আমাদের আকৃষ্ট করে। প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্প ও উপন্যাস রচনাতেও সমানভাবে পারদর্শী। তার গল্পগুলি তাকে বাংলা সাহিত্যে আজ এক অনন্য স্থান দান করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষা, পরিবেশনা, রচনা-শৈলী ও বাস্তবানুগ ঘটনা সংস্থাপন রীতি তাঁর রহস্যগল্পগুলিকে এক অভিনবত্ব দান করেছে। আশা নিরাশায় দ্বন্দ্বে তাঁর রচনা জীবন-রহস্যের বিচিত্রার বহুমুখীন তাৎপর্যে ভরপুর। তাঁর "জঙ্গল বাড়ীর বৌরাণী" গল্পটি কেবল ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেনি। এই পরিবেশের পরিপূরক ভাষা ও ঘটনাপ্রবাহ গল্পটিকে অনন্যতা দান করেছে। গল্পটি এই সংকলনে লেখকের "স্বনির্বাচনের" মহিমায় ভূষিত হয়ে প্রকাশিত হল।



ফাঁসি

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ এক পলকের ধৈর্যচ্যুতির ফলে বিলুক সাংঘাতিক এক কাণ্ড করে বসল। নইলে খামোকো মাথা গরম করার লোক সে নয়। অকারণ ঝামেলা বাধায় না, হাঙ্গামাতেও জড়ায় না তার যা কিছু কাজ সবই চুপিসারে। নেশা আর পেশা দুটোই যেখানে বে-আইনী, সেখানে অন্য মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হয়। নিজেকে বাঁচানোর জন্যই গোপনতা। নানা ফন্দি ফিকিরে বিলকু টাকা কামায় কিন্তু এ যাবৎ তাকে ফ্যাসাদে পড়তে হয়নি। সেদিন কিন্তু কি যে হয়ে গেল, মাথার মধ্যে দপ্‌ করে যেন আগুন জ্বলে উঠল। ব্যাপারটা এই রকম—

বিলকুর একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী হল বাদ্‌লা। গত পাঁচ সাত বছর তার সঙ্গে ঘুরছে, কাজের সাথী হিসাবে। মাঝে মাঝে বিলকু তাকে ডাকে—'পার্টনার'। দুজনের যা রোজগার, হপ্তা শেষে তার হিসেব করে দুজনে ভাগাভাগি করে নেয়। তারপর যে যার শেয়ার নিয়ে কি করে—জমায় না ওড়ায়—তা নিয়ে কেউ কাউকে প্রশ্ন করে না। বাদ্‌লা কিছু বেহিসাবী, নেশা ভাঙ করে মাঝে-মাঝে। তাই নেশার মুখে কেউ টাকা-পয়সা চাইলে দিয়ে দেয়। আর নিজের যখন ঘাটতি পড়ে, তখন বিলকু আছে। বকুনি দিলেও বিলকুর মুঠো বন্ধ থাকে না।

কিন্তু বিলকু কাঁচা ছেলে নয়, সে আখের বোঝে। ন্যায্য খরচপত্র করে যা বাঁচে—আর সেটা নেহাৎ কম নয়—তা জমিয়ে রাখে। কোথায়—কেউ জানে না। বাদ্‌লা তাকে খোঁচায়, "তুই মাঝে মাঝে কোথায় ডুব মারিস, বল তো? সারাদিন উধাও, ফিরিস অনেক রাত্তিরে। গেল শনিবার তো বাসাতেই এলি না, জমাট বাজারটা একদম ফালতু বানিয়ে দিলি। যাঃ—"

বিলকু মুচকি হেসে বলে, "সব খবর তোর দরকার কি? একলা ভালো না লাগে তো একটা মেয়ে জোগাড় করে আলাদা বাসায় চলে যা—"

বাদলা মুখটা সুচলো করে বলে, "অনেক দিন হল ওসব বখেড়া মিটিয়ে দিয়েছি। বড় ঝামেলা! তা, তোর কিছু হল না কি ও-লাইনে?"

বিলকু বলে, "ভাগ্! এবার বদ্দা খাবি।"

বাদ্‌লা অবিশ্যি জানে না কিন্তু বিলকুর একটি জুটেছে—এমনি, হঠাৎ। পথে দেখে মেয়েটাকে কেমন যেন মনে ধরে গেল। দেখাশুনো থেকে জানাশুনো, বিলকু একদিন পিছু-পিছু তার ঘরে গিয়ে উঠল। তার বাস থেকে আধ মাইলটাক দূরে মালতীর ডেরা। ওরি মধ্যে ছিমছাম ঘরখানা, বস্তির এক প্রান্তে। পাশে একফালি পোড়ো জমি। পরিবেশটা তেমন নোংরা নয়। মালতীর তৈরী একটু চা খেল পরিষ্কার কাপে, একটা সাজা পানও।

ইদানীং মালতীর ওপর কিছুটা বিশ্বাস হয়েছে বিলকুর। মাঝে মাঝে তার ঘরে আসে, কিছুক্ষণ থাকে। তারপর নিজের ধান্ধায় বেরোয়। মালতীকে তার পছন্দ দুটো কারণে- সে কথা বলে কম আর তার ঘরে উটকো মানুষ আসে না। ছেলেপুলেও নেই। অসময়ে এসেও দেখেছে, মালতী একলা ঘরে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

চলছিল এইভাবে দু'তিন বছর। সেবার বিলকুর হাতে বেশ কিছু জিনিস জমে উঠল। অর্ধেক পাচার হল ভালো দামে পুরনো খদ্দেরদের

কাছে। বাকি যা রইল আর নগদ টাকাকড়ি—সব জড়ো করে একটা মাঝারি মাপের কাঠের বাক্সতে ভরে মালতীর ঘরে শোবার চৌকির নীচে রেখে এল। এতদিনে তার আস্থা জন্মেছে মালতীর জিম্মাদারিতে। সে বলে বেড়াবে না, তঞ্চকতাও করবে না। করেও নি। চার পাঁচ মাস গেল, মালতী একদিনও জিগ্যেস করল না, বাক্সয় কি আছে? যেমন তালাচাবি লাগানো আছে, তেমনি থাকে।

সেদিন ছিল রবিবার। অনেক বেলায় মালতীর কাছে গিয়ে দেখে, ঘরে সুবল। সুবল মালতীর সম্পর্কে পিসতুতো ভাই। মাঝে মাঝে মালতীর খোঁজ নিয়ে যায়, সম্বন্ধটা বজায় রেখেছে। অনেকদিন পরে আসতে মালতী সুবলকে খেয়ে যেতে অনুরোধ করল। বাইরের দাওয়ায় রান্না সেরে মালতী যখন ঘরে ঢুকল, দেখল সুবল চৌকির নীচে থেকে বাক্সটা টেনে এনে কৌশলে তালাচাবি খুলে ফেলেছে। বাক্সর ডালাটা উঁচু আর সুবল উবু হয়ে বসে জিনিসপত্তরগুলো দেখছে। মালতী পিছন থেকে এই কাণ্ড দেখে অবাক্। তারপর সোজা এসে সুবলকে ঠেলা মেরে বলল, 'কি হচ্ছে এ সব! পরের বাক্স-তালা ভাঙতে তোমার বাধল না? তোমার কি রকম প্রবৃত্তি···ছিঃ ছিঃ'।

সুবল হি-হি করে হাসতে লাগল, একটুও লজ্জা সরম না করে বলল,"অনেক টাকার মাল দেখছি যে রে···ঠিক করে বল্ তো কার··· তোর নিজের নয় নিশ্চয়ই।"

'হ্যাঁ, একজন গচ্ছিত রেখে গেছে, কিন্তু তুমি কি বল··· ?'

বাক্স থেকে কয়েকটা জিনিস তুলে দেখিয়ে সুবল বলতে লাগল, 'এ সবই সরানো মাল...বহু টাকার সামগ্রী। তা মানুষ পাকড়েছিস ভালো। হুঁশিয়ার হয়ে চললে তোর কপাল ফিরে যাবে। তা গচ্ছিত রেখে চলে গেছে, না আসছে—যাচ্ছে'—বলে সুবল চোয়ারেরমতন বিশ্রীভাবে হেসে উঠল।

ঘরের দরজাটা অল্প ভেজানো ছিল। একটু যেন আওয়াজ হল। মালতী পিছন ফিরতেই দেখে ঘরের মধ্যে বিলকু। তার মুখে চোখে

আগুন, হিংস্র দৃষ্টি। একটু একটু করে এগিয়ে এসেছে, হয়তো তাদের কথাবার্তা শুনেছে। বিলকু চাপা গম্ভীর গলায় বলল—'আচ্ছা, আগে ওকে··' তারপর কথা শেষ না করেই ধাঁ করে সুবলের ঘাড়ে ছুরি চালাল। তারপর এলোপাতাড়ি শরীরের অনেক জায়গায়...

মালতী ছুটে এসে বিলকুর হাতটা জোরে চেপে ধরল, বলল—'এ কি করছ! ও যে খুন হয়ে গেল ·!' সত্যিই তাই। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, সে রক্ত গা বেয়ে মেঝেয় গড়িয়ে যাচ্ছে।

হাত থেকে ছুরিটা ফেলে দিয়ে আবার তুলে নিল। একটা ছেঁড়া কাপড়ে সেটা মুছে ফেলে সব সুদ্ধ পকেটে ভরল। মালতীকে বলল, 'আমি সব শুনেছি তাই তোমাকে ছেড়ে দিলুম। পুলিস এলে সত্যি কথা বোলো। মালপত্র সরিও না, বিপদ আরও বাড়বে'···তারপর বাক্স থেকে কয়েকটা জিনিষ ও এক তাড়া নোট বার করে পেট কাপড়ে বাঁধল আর গরাদ-ভাঙ্গা জানালা দিয়ে গলে' চটপট মাঠে নেমে পড়ল। পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখল, সুবল নেতিয়ে পড়েছে।

সে দিনের বীভৎস ঘটনার পরে বিলকু এক বার তার বাসায় এল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। বাদলার জন্য অপেক্ষা না করে, কয়েকটা জিনিষ ভেবে চিন্তে সঙ্গে নিল। তারপর আবছা আলো-আঁধারী গলির পথে পা বাড়ালো।

ওদিকে থানা-পুলিস, বস্তির কামরায় কি কাণ্ড-কারখানা চলছে, সে কথা ভাববার তার সময় নেই, ইচ্ছাও হল না। তাকে এখন থেকে এক করে সম্পূর্ণ গা-ঢাকা দিতে হবে, চেহারাটা পাল্টাতে হবে, সেইসব চিন্তাতেই বিলকু মশগুল রইল। শেষ পর্যন্ত অগ্র-পশ্চাৎ অনেক ভেবে কলকাতা ছাড়াই মনস্থ করল।

শুধু একটা দুশ্চিন্তা, বিভীষিকা জেগে রইল—ধরা পড়লে চরম শাস্তি, ফাঁসি অনিবার্য। ছুরিটা তুলে এনে একটা কাদা-ভরা ডোবায় ফেলে দিয়েছে সত্যি। কিন্তু আর সব চিহ্ন সূত্র? মেয়েমানুষ মালতী আর কত রেখে-ঢেকে বলবে, পুলিসের জেরায় কাত হয়ে যাবে নির্ঘাত।

বিলকু জানত না—মানুষের গায়ে এত রক্ত আছে কার! একটা পেন্সিল-কাটা ছুরির ঘায়ে সে রক্ত এত গড়িয়ে পড়ে। সে তো খুন করতে চায় নি। বে-পরোয়া বে-ইজ্জত লোকটাকে সায়েস্তা করতে চেয়েছিল। মালতীর মানা ও ধমক না মেনে যেরকম অসভ্যের মতো বিশ্রীভাবে দাঁত বার করে হেসে হেসে কথা বলছিল, তাইতেই তো বিলকুর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। এমন নিমকহারাম ইতর লোক মালতীর ঘরে এসে—উঃ এর পরে আর কিছু সে ভাবতে পারে নি। আপনা থেকেই তার পা এগিয়েছিল, হাত উঠেছিল।

প্রায় মাস দুই কেটে গেল। বিলকুর মুখ এমন চাপ-দাড়ি আর ঘন গোঁফে ভরে গেছে। প্যাণ্ট পাজামা ছেড়ে এখন পরনে খাটো ধুতি আর হাত-কাটা ফতুয়া। চেহারাও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। কিন্তু মনে ভয় ভয় সর্বদাই। ঘুম আসে না, ঘুমুলেও স্বস্তি নেই। থেকে থেকে সেই এক দৃশ্য। দুঃস্বপ্নে চমকে উঠে, ঘুম ছেড়ে যায়। এতদিন নানারকম ছোট-খাটো কাজে, কখনও ক্ষেতে দিনমজুরী করে দিন কাটছিল। জোজনং যত্র তত্র, রাতের আশ্রয়ও একটা জুটিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু একটানা সে কোথাও থাকত না, মানে থাকতে পারত না। কে যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

একদিন মফঃস্বলের একটা আধা-শহরের বাজার-রাস্তায় বিলকুর মনে হল কে যেন এক জন তাকে নজর করে করে দেখছে। বিলকু প্রথমটা গায়ে মাখে নি, পরে আড়-নজরে দেখল লোকটা এদিক ও-দিক মুখ ফিরিয়ে তার দিকেই যেন ঘুরে ফিরে তাকাচ্ছে। বিলকু চট করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা দোকানে ঢুকে পড়ল। বাজারের মোড়ে একজন পুলিস-প্রহরী দাঁড়িয়েছিল। লোকটা তার সঙ্গে কি কথা বলছে দেখে বিলকু আর দোকানে দাঁড়ালো না। সাঁ করে বেড়িয়ে এসে উলটো পথ ধরল, ঘুরে এসে রেল-ইয়ার্ডে টেলিগ্রাফের তার ডিঙিয়ে একটা পরিত্যক্ত ওয়াগনে গিয়ে ঢুকল।

ঐ পড়ে-থাকা মালগাড়িটায় সন্ধ্যা কাটল গুবরে, পোকা, মশা

মাছিদের নিয়ে। তারপর রাতের দিকে একটা ট্রেন স্টেশনে এসে থামতে বিলকু গুটি গুটি বেরিয়ে এসে একটা যাত্রী-ঠাসা কামরায় উঠে পড়ল। ঘণ্টাখানেক বাদে ট্রেন আর একটা স্টেশনে যখন থামল, বিলকু তখন গাড়ি থেকে টুপ করে উলটো দিকে নেমে পড়ল। রেল-লাইন ধরে গুমটি পর্যন্ত হেঁটে কতকগুলো মরচে পড়া অকেজো লাইন পার হয়ে সোজা মাঠ দিয়ে চলতে শুরু করল।

পথের যেন আর শেষ নেই। রাত তখন অনেক, অবশেষে দূর থেকে একটা আধ-পাকা উঁচু বড় ঘর চোখে পড়ল। আকাশে একটা অস্পষ্ট আলোর আভাস, তাইতেই আঁকা-বাঁকা মেঠো পথ দিয়ে সে ঐ বড় ঘরটার কাছে এসে এদিক ওদিক চেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ঘরের ছাদটা মস্ত উঁচু, প্রায় দেড় তলা সমান। আড়া-আড়ি কয়েকটা কালো কালো কড়ি কাঠ, তার ওপরে ঢালু টিনের ছাউনি। দুই দেয়ালের অনেক উঁচুতে একটা করে পল্‌কা কাঠের জানলা। আলকাতরা-মাখানো পাল্লাগুলো ঝুলে পড়েছে। তারই ফাঁক দিয়ে বাইরের অস্পষ্ট আকাশ যেন দেখা যায়।

কিছুক্ষণ পরে একটা জোর হাওয়া বইল, সঙ্গে ঠাণ্ডা ঝল্‌কা। একটু বাদেই ঝড় উঠল, প্রথমে বাজ পড়ার কয়েকটা বুকে ধাক্কা ও কান-ফাটানো আওয়াজ। তারপর হঠাৎ থমথমে হয়ে গেল। আর একটু পরেই নামল মুষলধারে বৃষ্টি। বিলকু নিঃশাস ফেলে বাঁচল। এই দারুণ দুর্যোগে, লোকালয় থেকে এত দূরে, অজানা জায়গায় মাঝ মাঠে একটা পোড়া জীর্ণ দালান-ঘরে কে তার পিছু ধাওয়া করবে এখন! রাতটা নিশ্চিন্তে ঘুমানো যেতে পারে।

ঘরের মেঝেতে কয়েকটা পুরানো চটের থলে আর কিছু এলোমেলো খড়ের আঁটি পড়ে রয়েছে, দেখল বিলকু। বোধ হয়, এক সময়ে এই গুদাম ঘরটায় ধান-পাট মজুদ থাকত। ওজন করে বিলি করা হত। ঘরের ঐরকমই একটা জটিল গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। গোটা কয়েক থলে

পেতে বিলকু তার ওপর খড় বিছিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ল এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক ক্ষণ পরে কি একটা শব্দে বিলকুর ঘুম ছেড়ে গেল। ক্লান্ত শরীরে তখন উঠতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু হঠাৎ ওপর দিকে চোখ পড়ায় ঘুমের জড়তা কেটে গেল, ধড়মড় করে উঠে বসল বিলকু। হাঁ করে তাকিয়ে দেখল, ওপরে কাঠের বীম থেকে একটা লোহার বড় রিং ঝুলছে। মানে, ঝুলতে ঝুলতে একটু একটু করে নামছে। আর ঐ উঁচু ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়ে দমকা হাওয়ায় লম্বা দড়িটা মাঝে মাঝে দুলছে। বিলকু প্রথমে ভাবল, এটা গোলাঘর ওজন করবার জন্য বড় নিক্তি-কাঁটা ঝোলাবার ওটা রিং।

রিংটা মানুষ ভোর উঁচুতে এসে স্থির হল তারপর······তারপর হঠাৎ দড়ি-সুদ্ধ রিংটা খুব আস্তে আস্তে তার দিকে সাপের মত বেঁকে গলাটা বাড়িয়ে এগুতে লাগল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিলকু উঠে দাঁড়াল রিং-এর কাছে। তার চেতনা নেই, ইচ্ছাশক্তি নেই। সে যেন একটা নিস্প্রাণ হালকা দেহ মাত্র। এগিয়ে এসে বিলকু এক হাতে রিংটা ধরল। ধীরে ধীরে রিংটা ওপর উঠতে লাগল। মাটি ছেড়ে পা দুটো শূন্যে উঠল। বিলকু যেন সার্কাসের পাকা খেলোয়াড় বনে, গেছে। আশ্চর্য! এক হাতে রিংটা ধরে সে নিজেকেই যেন পেশীর জোরে ওঠাচ্ছে

কড়ি কাঠের নীচে কাছাকাছি এসে দড়িটা থামল। আর সেই মুহূর্তে বাইরের বিদ্যুৎ-ঝিলিকে বিলকু দেখল ভয়াবহ দৃশ্য। মাথা চোখ কিছুতে ঠাহর হচ্ছে না, শুধু দুটো ভাঁটার মতো আগুনের গুলি অন্ধকারে জ্বলছে। মুখের অবয়ব বোঝা যায় না, চেনা যাচ্ছেনা। শুধু যন্ত্রণায় কাতর বীভৎস একটা শক্ত চোয়াল।

হঠাৎ দুটো কনকনে ঠাণ্ডা হাত দড়িটা পাকিয়ে নিয়ে টুপ করে তার গলায় পরিয়ে দিল। এক মুহূর্তে বিলকুর নজরে পড়ল, হাত ও কাঁধের সন্ধি স্থলে একটা কালো বাঁটের ছুরি গেঁথা। আক্রোশভরা

গলায় দাঁত-চাপা ফিসফিসে আওয়াজে যেন বলছে, ঝুলে পড় ঝুলে পড়!

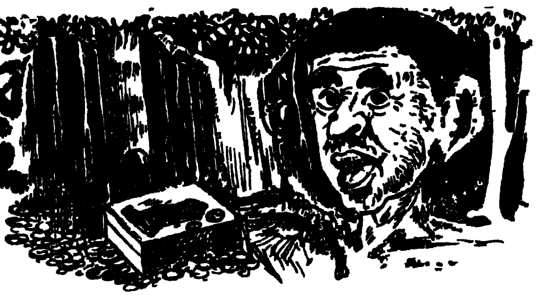
ঝট্‌কা মারতেই বিলকুর হাতের মুঠি খসে গেল,—নাকি দড়িটা বিলকু ছেড়েই দিল নিজে। তার কি মনে হল—কাজ নেই আর এই তাড়া-খাওয়া পালিয়ে বেড়ানোয়? এবার ক্লান্ত নিশ্চিন্ত সমর্পণ। হাত-পা ছুঁড়ে শূন্যে সাঁতার কাটল না······বিলকু ঝুলেই পড়ল।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তিনি ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ দীর্ঘকাল ইতিহাসের খ্যাত নামা অধ্যাপক হিসাবে সুপরিচিত।

বিমলাপ্রসাদ একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা। অধ্যাপনায় তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব দীর্ঘকাল আগেই ঘটেছে। বিভিন্ন ধরনের রচনায় তাঁর সমান পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাস—গল্প এবং নানা বিষয়ের রম্য রচনায় তিনি সিদ্ধ-হস্ত। ভৌতিক কাহিনী সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্যের বিশেষ নজীর তাঁর সম্পাদিত বাংলা ভৌতিক গল্পের সংকলন 'অন্তভুবন'। সম্ভবতঃ এর পূর্বে বাংলা ভৌতিক গল্পের এত সুবিন্যস্ত গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নি। ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর সাহিত্য-গ্রন্থের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

চেতলার বাক্স



লীলা মজুমদার

চেতলা, কালীঘাট, আদিগঙ্গা ইত্যাদি যতই পবিত্র স্থান হোক না কেন, ও সব জায়গা মোটে ভাল না। আর লোকের মুখে মুখে কী সব অদ্ভুত গল্পই যে শোনা যায়, তার লেখা-জোখা নেই, তাছাড়া মশা-মাছি তো আছেই। চিল্‌তে চিল্‌তে সব গলি. তাতে মান্ধাতার আমলে তৈরী ঝুরঝুরে সব বাড়ি। তায় আবার সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির উঠোন দেখা যায়। একফালি উঠোনের মধ্যে এই বড় বড় সব গাছ,—তালগাছ, আমগাছ, বটগাছ, তাদের ডালপালা বেয়ে, ঝুরি ধরে ঝুলে যে কোন বাড়ি থেকে যে কোন বাড়িতে চলে যাওয়া যায়। বিপদ বুঝলে একটা হাঁক দিলেই হল। সবাই সাত পুরুষ ধরে সবার চেনা। পুরনো সব ঝগড়াও আছে, তার কারণ নিজেরাই ভুলে গেছে, তবু এখনো কথাবার্ত্তা বন্ধ। মুখ দেখা আর কী করে বন্ধ করে, নড়বড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই, সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির রান্নাঘরের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়, কার বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই চোর ছ্যাঁচর খুনে জানতে পারবে। একটা টিকটিকি লুকোবার কোথাও জায়গা নেই, দুষ্কৃতকারীদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। কার ঘরে চুরি করার মতো কী আছে এবং কোথায় আছে তাও সবাই জানে। নেইও অবিশ্যি কারো কিছু। সেদিক দিয়ে জায়গাটাকে চোরেদের গোবি মরুভূমিও বলা যায়।

আমার বন্ধু বটুর বড়কাকা ওখানকার থানার মেজ দারোগা

তাছাড়া ওদের সাত পুরুষের বাড়িও ওখানে। নাকি বাড়ি হবার সময় ক্লাইব জন্মায় নি। বটু জায়গাটার নাম দিয়েছে মিসার হতাশা। শুনে বড়কাকা খুবই মুষড়ে পড়েছেন, দুষ্কৃতকারীরাই যদি একটু সুযোগ না পেল, তাহলে ওর হেড অপিসে উন্নতি হয় কী করে? অবশ্যি ও সব সাধারণ জিনিসের চাইতেও অন্য এবং আরও ভয়ের জিনিস আছে, ঐ তিনটে পাড়সুদ্ধ সবাই সন্ধে হতে যার ভয়ে জুজু। অধিকাংশই ওপর হাতে একগোছা শঙ্কট তারিণী মাদুলি বেঁধে নিরাপত্তা রক্ষা করেন। কারণ পুলিসে আর কী-ই বা করতে পারে?

বটুদের উঠোনের আম পাকলে বটু আমাকে তিন দিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছিল। ঐ তিনদিনে আমি যতগুলো সত্যিকার ভূতের গল্প শুনলাম, সারা জীবন ধরে অত শুনিনি। সবাই সবার পাশের বাড়িতে অশরীরিদের দেখে।

কী বড় বড় সবুজ রঙের চিংড়ি মাছ নিয়ে একটা লোক বিক্রি করতে এল। চিল-কোঠায় পুজো করতে বসে তাকে দেখেই বটুর ছোট ঠাকুমা চ্যাঁচাতে লাগলেন, "না বাছা, এস্থানে ও মাছ কেউ খাবে না। তুমি অন্য জায়গায় দেখ।"

বটুতো চটে কাঁই, কী ভালো ভালো চিংড়ি মাছ। ছোট ঠকুমা নেমে এসে বললেন, "বাস্, মাছ দেখেছিস তো অমনি হয়ে গেল। আরে ওকি সত্যিকার মাছ? অতবড় চিংড়ি কখনো চার টাকায় দেয় কেউ? আবার বলছে পরে নেবে।"

বটু বলল, "আহা, বল‥ যে বিক্রি না হলে পচে যাবে" কাষ্ঠ হেসে ছোট ঠাকুমা বললেন, "তুইও যেমন। তাছাড়া ওগুলো, মাছও নয়, ঐ জেলের পো-ও মানুষ নয়, সব ইয়ে।" এই বলে ছোট ঠাকুমা জল খেতে বসলেন।

বটুও বলল, "তা সত্যিও হতে পারে, মুখটা কেমন মিচ্‌কে মতো দেখলি না?"

আমি বললাম, "যাঃ। ভূতের হাঁটু উল্টোদিকে থাকে আর ওদের ছায়া পড়ে না।"

ছোট ঠাকুমা শুনতে পেয়ে ডেকে বললেন, "ইদিকে এখনো রোদ আসেনি বাবা, ছায়া দেখবে কী করে? সে যাই হোক, আদি গঙ্গার বটগাছের তলায় যেন কখনো যাস্‌নি। জায়গাটা ভালো নয়"

গিজগিজে সব বাড়ি, বটগাছ তলায় যেতে হলে সারকাস করতে হয়। অথচ সেখানে নাকি কারা কাপড় কাচে, ঝগড়া করে, মাছ ধরে।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে, সামনের দোতলায় লটঘটে বারান্দায় দুজনে গল্প করছি। ছপ্‌ করে কী একটা পায়ের কাছে পড়ল। আর সে কী সুগন্ধ ভুরভুর করতে লাগল। তুলে দেখি কলাপাতায় মোড়া বড় বড় চিংড়ি মাছ ভাজা। নীচের দিকে চেয়ে দেখি, সেই মিচ্‌কে লোকটা মিট মিট করে হাসছে। মোটা মোটা কান, নাকে মস্ত আঁচিল। একতলার বৈঠকখানা থেকে বটুর পিসেমশাই ডেকে বললেন, "কে? কে ওখানে?" সঙ্গে সঙ্গে কেউ কোথাও নেই। খেয়ে ফেললাম দুজনে মিলে সব কটা চিংড়ি মাছ। যদি ওগুলো চিংড়ি মাছ নাও হয়, তবু খেতে বেজায় ভালো।

ভিতর দিকের উঠানে আম গাছের গায়ে লাগা বুড়ো তালগাছ। ছোট—ঠাকুমা সাদা রেকাবি করে খোয়া ক্ষীর, চিঁড়ের মোয়া আর বড় বড় মনাক্কা নিয়ে, তালগাছের কোটরে রেখে, ভক্তি ভবে গলায় কাপড় জড়িয়ে প্রণাম করলেন। ছোট ঠাকুমা চলে যেতেই বটু বলল, "ব্রহ্মদত্যিকে তোয়াজ করা হচ্ছে। তালগাছে সে বাস করে।"

আরও কী বলতে যাচ্ছিল বটু, ছোট ঠাকুমা পিছন থেকে বললেন' "অমন অছেদ্দা করিস্‌নে বাছা। উনি আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই। চটিয়ে দিলে সব্বোনাশ করবেন, খুশী রাখলে আমাদের জন্য না পারেন এমন জিনিস নেই। ঐ বিদ্যে বুদ্ধি নিয়ে বছরে

বছরে পাস করে যাচ্ছিস্, সেটা কী করে সম্ভব সে কথা কখনো ভেবেছিস ? "হুঃ।" এই বলে ছোট-ঠাকুমা গীতা পড়তে ঘরে গেলেন। যাবার সময় আরো বলে গেলেন, "তোরা বিশ্বাস না করতে পারিস্, কিন্তু রোজ উনি এই জিনিস গ্রহণ করেন, আব তার বদলে একটি পয়সা আশীর্বাদী"—

আর বলা হল না' কারণ সেই সময় বড়কাকা বাড়ি এলেন।

বড় কাকা খুব চটে ছিলেন। চা আর চিঁড়ের মোয়া খেতে খেতে বললেন, "এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে। বাজারের লোকদের নালিশের জ্বালায় আর টেঁকা যাচ্ছে না। গোলাবাড়িতে রাতে তদন্তে যেতে হবে।" তাই শুনে বড়কাকী এমনি চমকে গেলেন যে, হাতের দুধের হাতা থেকে অনেকখানি দুধ মাটিতে পড়ে গেল। চোখ গোল গোল করে ফ্যাকাশে মুখে বললেন, "কিন্তু, কিন্তু—"

বড়কাকা কাষ্ঠ হাসলেন, "কিছু কিন্তু কিন্তু নয়। এর ওপর আমাব প্রমোশন নির্ভর করছে। কোনো ভয় নেই, ছটা ষণ্ডা লোক সঙ্গে থাকবে। হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।"

বটার কাছে শুনলাম যে, বাড়িটাতে একশো বছর কেউ থাকে না। বড়ই দুর্নাম। নাকি ওটা চোরাচালানকারীদের গুহ্য অড্ডা। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ আছে, বুড়ীগঙ্গায় তার মুখ। অনেকে দেখেছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে সোনাদানা বে আইন জিনিস বস্তা বস্তা পাচার করা খুব শক্ত নয়। বাজাবে নাকি ওদেব চর ঘুরে বেড়ায়, কখনো জেলে সেজে, কখনো পুরুত ঠাকুব সেজে ; এটা ওটা কিনতে চায়, চা খেতে চায়, অচল পুরনো পয়সা দিয়ে দাম দিতে চায়। তা লোকে শুনবে কেন ? দিয়েছে নালিশ করে। বড়কাকা বলেছিলেন, "লোকটাকে ধরা যায় না। ফুস্‌ফাস করে এখান দিয়ে ওখনে গলে পালায়। কোনো দোকানদারের সঙ্গে যড়ও থাকতে পারে। শুনেছি চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়, কীরকম—মিচকে মতো, মোট মোটা কান, নাকের ডগায় আঁচিল।"

শুনে আঁতকে উঠেছিলাম, বটা কনুইয়ের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিয়েছিল। আটটা বাজতেই মহা ঘটা করে আটজন সশস্ত্র লোকজন নিয়ে বড়কাকা তদন্তে চলে গেলেন। ছোট ঠাকুমা তাঁর গলায় হলুদে সুতো দিয়ে একটা বেলপাতা ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, ব্যস্ আর ভয় নেই। সেখানে গিয়ে কেউ কিছু দিলে খাস্‌নে যেন। দুগ্‌গা দুগ্‌গা"। বড়কাকা চলে গেলে বললেন 'কামান দেগে হাওয়া ধরা। হুঁ!"

আমরা ছাদে গিয়ে বুড়ী গঙ্গায় জোয়ার আসা দেখতে লাগলাম বটু বলল, "ঐ গোলাবাড়ীটা আমার ঠাকুরদার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই পেয়েছিল। ব্যাটা মহা লক্ষ্মীছাড়া ছিল, লেখাপড়া শেখেনি, কাজকর্ম করত না, খালি মাছ ধরার বাই ছিল আর চীনে ব্যবসাদারদের কাছ থেকে চায়ের নেশা ধরেছিল। দুদিনে বাড়ীর সব ঝাড়বাতি, আসবাব পত্র, রূপোর বাসন, বেচেবুচে সাফ করে দিল ওর বুড়ী মা নাকি খুচরা পয়সা কড়ি এমনি লুকিয়ে রেখে চোখ বুজে-ছিলেন যে, ব্যাটা সে সব খুঁজেই পায়নি। এখনো নাকি খুঁজে বেড়ায়। তাই ও বাড়িতে কেউ রাত কাটায় না। সেইখানে গেছে বড়কাকা তদন্ত করতে। খুচরো টাকাকড়ির বাক্সটা পেলে মন্দ হয় না। আমরাই তো ওর ওয়ারিশ। সে ব্যাটাতো বিয়েই করেনি। নাকি বিশ্রী দেখতে ছিল, সুঁট্‌কো, কালো বড় বড় কান, চাকর চাকর চেহারা। গেঞ্জি গায়ে ঘাটে বসে অষ্টপ্রহর বুড়ী গঙ্গায় মাছ ধরত— কে? কে ওখানে?"

খচমচ করে তালগাছ থেকে আমগাছ, আমগাছ থেকে নড়বড়ে বারান্দা কাঁপিয়ে মিচ্‌কে লোকটা হাসি হাসি মুখ করে উঠে এসে নাকের ফুটো ফুলিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, চা চা' গন্ধ পাচ্চি মনে হচ্ছে।"

সত্যিই ছিল চা। দোকানের কেত্‌লিতে একটু চা আর একটা মটির ভাঁড় বটু লুকিয়ে এনেছিল সামনের দোকান থেকে। নীচে

নামাতেও হয়নি, ওদের ছোকরা তেঁতুলগাছে চড়ে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, রোজকার মতো।

চা পেয়ে লোকটা আহ্লাদে আটখানা, মিচ্‌কে মুখ যেন সাত ভাঁজ হয়ে গেল। বললাম, "পেঁয়াজি খাবে নাকি ?,'

জিব কেটে বলল, অ্যাঁ, ছি ছি ও নাম করবেন না। আমার বরাদ্দ রোজগার মতো খেয়েই এসেছি, চিঁড়ের .মোয়া, খোয়া ক্ষীর মেওয়া—"

বটা আর আমি এ ওর দিকে তাকালাম, কিছু বললাম না। থাক না বেচারী।

মিচ্‌কে লোকটি বলল, "বড়কর্তা আমাদের ওখানে এমন হাঁকডাক লাগিয়েছেন যে, টিকতে না পেরে ওনার এখানে গা ঢাকা দিতে এসেছি। দেখ দাদা, তালগাছের মুড়োয় তোমাদের জন্য একটা জব্যি রেখে গেলাম। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। সেখানে মা অমৃতি বানায়।

বটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "কেন চলে যাবে। এখানে বুঝি খেতে পাও না।"

ফিক করে হেসে মিচ্‌কে লোকটা বলল, "তুবেলা নৈবিদ্যি পাই আবাব কষ্ট কিসের ? ঐ এল বলে আমি উঠি।" বলেই হাওয়া।

· নীচে বড়কাকাদের রাগ রাগ গলার হাঁক-ডাক শোনা গেল। নিশ্চয় কিছু দুষ্কৃতকারীটারি ধরতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে আদ্যি-কালের তালগাছটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল। পোকা ধরা. পুরানো গুঁড়ি ভেঙ্গেচুরে একাকার। তার মধ্যে দেখা গেল বেশ বড় একটা কাঠের হাতবাক্স, পুরানো টাকা কড়িতে তার অর্দ্ধেক ভর্ত্তি। আর চাঁচা পোঁছা নৈবেদ্যের রেকাবিটা, তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বড় কাকার রাগ ঠাণ্ডা।

পরদিন বড়কাকা বললেন, "অশ্চর্য্যের বিষয়, সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা খোপে ঐ বাক্স রাখার স্পষ্ট দাগ দেখলাম। সেই বুড়ী ঠাকুরুণ তাহলে"

বাউণ্ডুলে ছেলের হাত থেকে ওটাকে বাঁচাবার জন্য এখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এটাও তো তাঁদেরই বাড়ি।

ছোট ঠাকুমা শূন্যে নমস্কার করে বললেন, “কত বাঁচিয়ে ছিলেন সে তো .বোঝাই যাচ্ছে! ও বটা, নিজে পড়িস দাদু, সে তো গেল।” ফোঁত ফোঁত করে একটু কেঁদেও নিলেন। বড়কাকা তো অবাক!

লীলা মজুমদার

জন্ম ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে।

বাংলা সাহিত্যে লেখিকার সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বর্তমান সময়ে যে সব লেখিকা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন সহজেই, লীলা মজুমদার তাঁদের অন্যতমা। তার সাহিত্য রচনায় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ভ্রমণ-কথা, উপন্যাস-গল্প এবং অনুবাদে তার উপস্থিতি অত্যন্ত উজ্জ্বল। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বংশগত ঐতিহ্যের ধারা এই লেখিকার মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন। তাঁর বহু রচনাই পাঠকের চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। শিশুদের জন্যও তাঁর কলম সমভাবে গতিশীল। তিনি বিখ্যাত ‘সন্দেশ’ পত্রিকার অন্যতম উদ্যোক্তা। কর্মজীবনে তিনি বহু স্থানেই অধ্যাপনা করেছেন। শান্তিনিকেতনেও কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। ভাষায় গাম্ভীর্য এবং প্রসাদগুণ তাঁর সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। ভৌতিক আখ্যান রচনায়ও তাঁর কুশলতা অনস্বীকার্য।



গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বুড়ো মাঝিটাকে তাড়া লাগানো বৃথা জেনেই অনিমেষ বহুক্ষণ আগেই চুপ করেছিল। তার ফলে মাঝি আর আরোহী দুজনেই হাল ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে। মাঝির বকাটাই রোগ—এমনি কি ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল ঐটেই পেশা, ওর বৌ কতদিন মরেছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে কী ভুল করেছে, জামাই কেন মেয়েকে নেয় না—ছোট জামাইটা জুয়ারী, ছেলেটা নেশা করতে পেলে আর কিছু চায় না—খুব ছেলে বয়সে একবার ও কলকাতায় গিয়েছিল কিন্তু হট্টগোলে মাথা ঠিক থাকে না বলে পালিয়ে আসতে পথ পায়নি—আবার একবার যাবে মা কালীকে দর্শন করতে, ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করবার ফাঁকে ফাঁকে শুধু মাত্র দম নেবার প্রয়োজনে যখন থামে তখনই শুধু দাঁড় বাইবার কথা মনে পড়ে ওর। সুতরাং শহরে যাবার বাস যে পাবে না তা অনিমেষ আগেই ভেবেছিল, কিন্তু এমন অবস্থায় যে পড়বে কল্পনা করেনি। বাস্‌তো নেই-ই, আশে পাশে কোথাও মানব-বসতির চিহ্নও যেন চোখে পড়ে না।

নৌকা এসে যেখানে ভেড়ে সেখানে বাঁশের মাচা মত একটা আছে, জাহাজঘাটা হলে অনায়াসে অনায়াসে জেটি বলা যেত, সেই মাচাতে নেমে অসহায় ভাবে অনিমেষ একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। নীচের ময়ূরাক্ষীর কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। তার স্রোতের গতি থাকলেও তবু একটা প্রাণ-স্পন্দন বোঝা যেত—এত

মন্থর তার স্রোত, এত নিস্তরঙ্গ যে মনে হচ্ছে সমস্ত জলটা যেন জমাট বেঁধে স্তব্ধ হয়ে গেছে—আর তার সেই অতল কালো বুকে কত কী রহস্যময় জীব স্পন্দনহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসছে—

ওপারে ভগীরথপুর গ্রাম, বেশ সম্পন্ন গ্রাম তা সে জানে, বহু লোকের বাস, অনেক পাকা বাড়ী ইস্কুল ডাকঘর আছে কিন্তু এখান থেকে তার কি কিছুই দেখা যায় না। ঘাট থেকে উঠে যে রাস্তাটা গ্রামের দিকে গিয়েছে তার সাদা বালির আভাস নিবিড় বনের অন্ধকারে মিশে গেছে একটুখানি গিয়েই। দু'দিকে বড় বড় গাছ—কী গাছ তা বোঝা যায় না কিন্তু তারই অসংখ্য পাখা-পল্লব সমস্ত গ্রামটাকে যেন চোখের আড়াল করে রেখেছে। একটা আলোব রেখা পর্যন্ত চোখে পড়ে না।

ও পারে যদি হয় ত এপারের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এ পাবে যেদিন সে এসেছিল সেদিন দিনের বেলা কোনও গ্রাম ওর চোখে পড়েনি। বাসটা এসে একেবারে এই ঘাটের ধারে দাঁড়ায়, যাত্রীরা সবাই ভগীরথপুর চলে যায়। সেদিন অন্তত এমন কেউ ছিল না যে ওপারে কোথাও যাবে। সেদিন ও দুদিকে আম গাছের ঘন বন কাটিয়ে এসেছিল—বেশ মনে আছে। হয়ত ছিল কোথাও ঘরবাড়ী কিন্তু তা ওর চোখে পড়েনি।

পারাপারের জন্য একটা খেয়া নৌকা আছে, চওড়া ভেলার মত প্রকাণ্ড বপু কিন্তু শেষ বাস চলে যাবার পর আর ওপার থেকে কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই জেনে সে ইজারাদারও বহুক্ষণ বাড়ি চলে গেছে নৌকাটা ওপারে বেঁধে রেখে।

"বাবু ভাড়াটা ?"—তাড়া লাগায় মাঝি।

বিহ্বলতা কাটে কিন্তু যেন আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে অনিমেষ।

"ভাড়াটা কিরে! এই অন্ধকার রাত্রিতে আমি এখানে কোথায় থাকব। তুই তো একঘন্টার রাস্তা সাতঘন্টায় এসে আমাকে এই

বিপেদে ফেললি। এখন নিদেন ওপারে পৌঁছে দে। দেখি কোথাও একটু আশ্রয় পাই কি না, এপারে এই জঙ্গলে শেষে কি বাঘের পেটে প্রাণ দেবো, চল ওপারে নিয়ে চল—

"উটি লারলম্ আজ্ঞা।"

"সেকি, কেনরে? কী হয়েছে?"

তার উত্তরে মাঝি যা বললে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, ওপারে অন্য নৌকা গেলে খেয়ার ইজারাদার বড্ড বকাবকি করে, পুলিশে ধরিয়ে দেয়। সুতরাং ওপারে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অনিমেষ তাকে অনেক করে বোঝালো; ওপারে তোকে ধরবার জন্য ইজারাদার যদি বসে থকেত ত অনিমেষ তাকেই ডাকত; শুধু ইজারাদার কেন জনমানবের চিহ্ন থাকলেও সে মাঝিকে এ অনুরোধ করত না। কোন মতে নামিয়ে দিয়ে সে চলে যাক—তাতে যদি কেউ তাকে ধরে ত অনিমেষ তার দায়ী ইত্যাদি সব কথার উত্তরে তার সেই একই উত্তর—"উটি লারলম্ আজ্ঞা?"

অনিমেষ তখন রাগ করে বললে, তবে তুইও থাক আমি তোর নৌকোতেই রাত কাটাই।"

আজ্ঞা, উটিও লারলম্!" শুধু তাই নয়, দাঁড়ের একটা ধাক্কা দিয়ে নৌকাটা খানিক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

"টাকাটি ছুঁড়ে দ্যান্ কেনে—বাড়ী চলে যাই!"

"তবে টাকাও পাবি না যা।,, রাগ করে বলে অনিমেষ, কিন্তু যখন দেখে বুড়োটা সত্যি সত্যি একটা নিশ্বাস ফেলে ঘর-মুখো হচ্ছে তখন সে একখানা একটাকার নোট দলা পাকিয়ে ছুঁড়েই দেয়।

"যা বেটা যা পথে ডুবে মরিসত ঠিক হয়!" মনে মনে বলে অনিমেষ।

ব্যাস। এরপর সব পরিষ্কার। ওপারে ঘন বনের নিবিড় তমিস্রা সামনে অতল শান্ত জলে তারই রহস্য আছে জমাট বেঁধে—আর এপারে তার চার পাশ ঘিরেও দৈত্যের মতো কতকগুলি গাছপালা

ভয়াবহ অন্ধকার বিস্তার করে সমস্ত সভ্যতার চিহ্ন এমন কি আকাশকেও যেন আড়াল করে রেখেছে। বাস্ এসে দাঁড়ায় এবং ঘোরে যেখানটায় সেখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে বটে কিন্তু সে যেন আরও ভয়ঙ্কর

স্যুটকেসটা মাথার উপরে পেতে সেখানেই জেকে বসল অনিমেষ। বাঘ ভাল্লুক যদি সত্যিই আসে ত জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে—এখানেই খানিকটা তবু নিরাপদ।

খর খর ঝটপট শব্দ করে কী একটা পাখী উড়ে বসলো মাথার ওপরে ভয় পেয়ে চমকে উঠলো অনিমেষ। কাছেই কোথায় শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কী একটা সরীসৃপ চলে গেল বোধ হয়। সামান্য শব্দ তবু বেশ স্পষ্ট। জলের মধ্যে হঠাৎ একটা মাছ ডিগবাজী খায়। ঐটুকু আওয়াজ কিন্তু অনিমেষের মনে হল যেন বন্দুকের শব্দ হল কোথায়।

বিশ্রী লাগছে। নক্ষত্রের আলোতে যতদূর দৃষ্টি চলে বহুক্ষণ ধরে ধরে হাত ঘড়িটা দেখলে মাত্র রাত ন-টা। কলকাতায় সবে সন্ধ্যা। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। এখনও দীর্ঘ সময় তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। কখন ভোর হবে, তারপর কখন ইজারাদারের ঘুম ভাঙবে তবে সে একটু লোকালয়ের মুখ দেখতে পাবে। বাস্ একটা আসে এখানে সকাল আটটা নাগাদ—সন্ধ্যাতে যেটা এসেছে সেটা কাছাকাছি কোন গ্রামে থাকে, সাতটা নাগাদ এখানে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রায় বারো ঘণ্টা এখনও।

আচ্ছা হাঁটলে কেমন হয়? বাসের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে থাকলে কি আর একটা গ্রাম পাওয়া যায় না। কাছাকাছির মধ্যে?

কিন্তু যদি তাকে আশ্রয় দিতে কেউ না চায়? ডাকাত বলে মনে করে? তাছাড়া দু'দিকে যে ঘন বন, যদি বাঘ আসে? মুর্শিদাবাদ জেলায় এ সব অঞ্চলে প্রায়ই বাঘ বেরোয়।

দরকার নেই। দশ এগারো ঘণ্টা সময়—একরকম করে কেটেই যাবে।

"মশাই শুনছেন? বাস্ মিস করেছেন বুঝি? কোথাও আশ্রয় পান নি?"

অস্ফুট একটা শব্দ করে চমকে ওঠে অনিমেষ, বরং আঁৎকে ওঠে বলাই ঠিক। কখন নিঃশব্দে কে পেছনে এসেই দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত, যেন একটা কথা শেষ হবার আগেই আর একটা শুরু হয়েছে—এই ভাবে পর পর তিনটি প্রশ্ন করে আগন্তুকটিও চুপ করে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে।

অবশেষে মরিয়া হয়েই অনিমেষ ফিরে তাকায়।

রোগা কালো গোছের একটা মানুষ খুব বেঁটে নয়—তাই বলে ঢ্যাঙ্গাও বলা চলে না। উস্কো খুস্কো এক মাথা চুল ও ঘন দাড়ি গোঁফ। ঘন দাড়ি কিন্তু আবক্ষ বিস্তৃত নয়। মধ্যে মধ্যে কামানো বা ছাঁটা হয়—এমনি দাড়ি, খোঁচা খোঁচা। একখানা খাটো আধ ময়লা কাপড় পরনে—কোঁচার খুট গায়ে জড়ানো। মোটা ভুরুর আড়ালে কোটরগত চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিঃশব্দে শুধু মাত্র চাউনির দ্বারাই যেন অনিমেষের সমস্ত ইতিহাস পূর্বাপর আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছিল।

"বলছিলুম যে আপনি বোধ হয় কোথাও আশ্রয় পাচ্ছেন না—না? তা হ'লে বরং চলুন না হয় আমার কুটিরেই—কোন মতে রাতটা কাটিয়ে দেবেন।"

হায়রে! আগুল্‌ফ লম্বিত—কুন্তলা বনমালা শোভিতা কপাল-কুণ্ডলারই শুধু উপন্যাসেই দেখা দেয়!

যাক্ গে, নবকুমারের অদৃষ্ট তার নয় তা ত বোঝাই যাচ্ছে। তাই বলে কি ওর চেয়ে ভদ্র চেহারার কেউ জুটতে নেই! এ লোকটাকে দেখেই পাগল বলে মনে হয়—শেষ পর্য্যন্ত এর আশ্রয়ে গিয়ে কি আর বিপদে পড়বে!

"কী বলেন? যাবেন নাকি?"

"আ আপনি এখানে—মানে—" আমতা আমতা করে অনিমেষ।

'আমার এখানেই একটা ঘর আছে, এই যে।' লোকটা আঙ্গুল তুলে দেখায়।

সত্যিই ত, এই ত, বলতে গেলে তার সামনেই পাড়ের ওপর একখানা খড়ের ঘর—ও অঞ্চল যেমন হয় তেমনি। আশ্চর্য্য, এতক্ষণ তার চোখে কি হয়েছিল ?

লোকটি বোধ হয় তার মনের ভাব বুঝেই হেসে বললে, "ঘরে আলো ছিল না কিনা, তাই অন্ধকারে টের পাননি। আমিও বাড়ী ছিলুম না, নদীর ধার দিয়ে একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম। অন্ধকারে একা একা বেড়াতে আমার বেশ লাগে।"

"এখানে বাঘের ভয় নেই ?"

"আছে বৈকি তবে আমার অত ভয় নেই।····মরবার ভয় করি না। কবে লাভই বা কি বলুন, মরতে ত একদিন হবেই।"

না, লোকটাকে ঠিক পাগল বলে ত মনে হয় না!

"চলুন চলুন, ঘরে বসেই কথাবার্ত্তা হবে এখন।" লোকটা তাড়া লাগায়!

"চলুন" বলে স্যুটকেসটা তুলে নেয় অনিমেষ।

একখানা নয়—দুখানা পাশাপাশি ছোট ঘর, সামনে একফালি দাওয়া। ভেতর দিকে আরও কি আছে তা ওর নজরে পড়ল না। বেশ ঝকঝকে করে নিকানো, পরিচ্ছন্ন দাওয়া। লোকটি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে "দাঁড়ান আলো জ্বালি" বলে ওকে দাওয়াতেই দাঁড় করিয়ে রেখে দোর খুলে ভেতরে ঢুকলো। তালা চাবির বালাই নেই, দোর শুধু ভেজানোই ছিল, ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে আশ্চর্য্যরকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটা আলো জ্বেলে লোকটি বললে "আসুন—ভেতরে আসুন।"

ঘরে আসবাবপত্র বেশী ছিল না। একটি তক্তোপোষের ওপর একটা মাদুর বিছানো,—শয্যা বলতে এই, একটা বালিশ পর্যন্ত নেই।

একপাশে একটা দড়ি টাঙানো তাতে খান দুই কাপড়, তার মধ্যে একটা লাল—মেঝেতে জলের মেটে কলসী, একটা ঘটি এবং পিতলের পিলসুজে একটা মাটির প্রদীপ। এছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

"বসুন, বসুন। ঐ চৌকিটের ওপরেই বসুন।" তারপর খানিকটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নিজের দুই হাত ঘষে কেমন একরকমের বিচিত্র হাসি হেসে বললে, "ভাল বিছানা আমার নেই! ঐ স্যুটকেসটা মাথায় দিয়েই শুতে হবে।…আর খাবারও ত কিছু দিতে পারব না। আমার ঘরে কিছুই নেই। আপনি মদ খান?"

যেন একটা আকস্মিক উগ্রতা দেখা দেয় ওর প্রশ্ন করবার ভঙ্গীতে।

"না—না। রক্ষে করুন। কিছু ব্যস্ত হবেন না আমার জন্যে। আশ্রয় পেয়েছি এই ঢের।"

"ঐ আশ্রয়টুকুই যা। বাঘ ভাল্লুকের হাত থেকে ত বাঁচলেন অন্ততঃ!—তা আশ্রয় ভালোই। ঘরখানা মন্দ নয়, কী বলেন?"

বলতে বলতে হেসে ওঠে সে। সাদা ঝকঝকে দাঁত কালো দাড়ির ফাঁকে চক্‌চক্ করে।

অনিমেষের যেন ভালো লাগে না ওর ভাবভঙ্গী। আবারও সেই সন্দেহটা মনে জাগে—পাগলের পাল্লায় এসে পড়ল নাকি?

"আপনি এখানে কি করেন?"

"আপতত কিছুই না। আচ্ছা বসুন, আমি আসি, মুখ হাত ধোবেন নাকি?"

ধুতে পারলে ভালোই হ'ত কিন্তু অনিমেষের তখন নড়তে ইচ্ছে করছে না, সে বললে—"না—দরকার নেই।"

লোকটি বেরিয়ে গেল, অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে বসেই রইল। ভালো বোধ হচ্ছে না ওর। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কী করে

লোকটা এখানে, এমন একাই বা থাকে কেন ? ঘরে কোনরকম কিছু খাবার নেই ত ও নিজে খায় কি? চোর ডাকাত নয় তো? লোকজনকে ভুলিয়ে এনে শেষে—

ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন—ব্যাগে ওর খানকতক কাপড়-জামা ছাড়া আর কিছুই নেই। পকেটেও মাত্র টাকা ছয়েক আছে, কিন্তু একটু পরেই সমস্ত দেহ হিম হয়ে ওর মনে পড়ে····এই সব উদ্দেশ্যে যারা নিয়ে আসে ভুলিয়ে টাকা না পেলে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। তা-ছাড়া মেরে ফেলে ত দেখবে কী আছে। ওদের দেশে একবার খুব ডাকাতের উপদ্রব হয়েছিল, তারা একটি লোককে খুন করার পর পেয়েছিল মাত্র একটি আধলা।

কখন গৃহস্বামী আবার নিঃশব্দে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অনিমেষ টেরও পায় নি, যদিও খোলা দরজার দিকে চেয়েই বসেছিল সে, আশ্চর্য্য !

লোকটি বললে, "এখনই শুয়ে পড়বেন নাকি? যদি ঘুম পেয়ে থাকে ত স্বতন্ত্র কথা। নইলে একটু বসি, কতদিন লোকের সঙ্গে কথা কইতে পাইনি। বলেন ত দুটো কথা কয়ে বাঁচি।—এখানে লোকজন ত নেই, আসেও না কেউ—"

অনিমেষ আবারও পূর্ব প্রশ্নের জের টানলে, "তা এমন জায়গায় আপনি থাকেনই বা কেন?"

সেই হাসি গৃহস্বামীর মুখে, তেমনি নিঃশব্দ হাসি, দাড়ির ফাঁকে শুভ্র দন্তের সেই বিজলী প্রকাশ।

"ভয় নেই, আমি চোর-ডাকাতও নই, পাগলও নই, ঘরে কিছু নেই মানে আমার কিছুর দরকার নেই, থাকারও দরকার হয় না আমার। কেন জানেন?"

তারপর—যেন কতকটা অসংলগ্ন ভাবেই বলে ওঠে, "আমি সাধক। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।"

"সন্ন্যাসী?" অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চায় অনিমেষ।

অপ্রতিভ হয়ে লোকটি বলে, "না—সন্ন্যাসী মানে ঠিক অভিষিক্ত সন্ন্যাসী নই—তবে সাধক বটে।"

উবু হয়ে ঘরের মেঝেতেই বসল লোকটা, কিছুক্ষণ মৌনভাবে থেকে বললে, "তাহলে আপনাকে বলেই ফেলি সেটা। কাউকে কখনও বলিনি, বলবার সুযোগও পাইনি বিশেষ। এই অঞ্চলেরই লোক আমি। বুঝলেন? ছেলে-বেলা থেকেই নানা বইতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের অদ্ভুত সব ক্ষমতার কথা পড়ে ঐ দিকে মনটা ঝোঁকে। মনে হ'ত আমিও ঐসব সাধনা ক'রে সিদ্ধ হবো, তারপর প্রাণ ভরে পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য্য ভোগ করব—আর আমায় পায় কে।"

"হায়রে, তখন কি জানতুম যে ভোগের উদ্দেশ্যে সাধনা করতে এলে সিদ্ধি তো দূরের কথা সমস্তই খোয়াতে হয় একে একে।"

এই পর্যন্ত বলে লোকটি চুপ করল। এতক্ষণে অনিমেষও অনেকটা সহজ হয়েছে। লোকটির ভাবভঙ্গী আর কথাবার্ত্তায় সত্য কথা বলছে বলে মনে হয়। দুশ্চিন্তা অনেকখানি কমে গেল ওর।

"বাড়ী আমার এ অঞ্চলে নয়। বাড়ী সেই পাঁচফুপির কাছে, এখানে কেন এলুম? বলছি দাঁড়ান। বলেছি আপনাকে ছেলেবেলা থেকেই ঐ দিকে ঝোঁক গিয়েছিল, ইস্কুলের পড়া হ'ল না, তার বদলে যত সব ঐ ধরনের বই পড়তে লাগলুম। পড়তে পড়তে বিশ্বাসটা খুব পাকা হয়ে গেল। কিন্তু গুরু কৈ? দু একটা সন্ন্যাসী যা হাতের কাছে পেলুম দেখলুম সব বাজে—কেউ কিছু জানে না। অথচ পথ দেখাবে এমন লোক না পেলে এগোব কি করে? মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠল। খাবার চিন্তা ছিল না। মাথার উপর বাবা, বড় ভাই ছিল—জমিজমা তারাই দেখাশুনো করত। অবশ্য আমিও বকুনি খেয়েছি ঢের, কাজকর্ম কিচ্ছু করি না বলে, কিন্তু সে সব গায়ে মাখিনি।

"তবে যত দিন যেতে লাগল মনটা ততই ব্যাকুল হয়ে উঠল।

শেষ মেশ আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের সময়ে বাড়ী থেকে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বেশ বুঝেছিলুম ঘরে বসে আর কিছু হবে না।...এ-তীর্থ ও-তীর্থ ক'রে অনেক দেশেই ঘুরলুম। ভালো চাকরি বা ভালো বিয়ে করার অনেক সুযোগও পেয়েছিলুম, সংসার মশাই মায়ার ফাঁদ পেতে রেখে দেয় সারা জগতে—যাই হোক সেদিকে মন ছিল না বলে কেউ বাঁধতে পারলে না, এমনি ভাবে যখন ক্রমশ হতাশ হয়ে উঠেছি তখন একদিন—বাড়ী ফেরার পথে বলতে গেলে বাড়ীর কাছে এসে হঠাৎ একজনকে পেয়ে গেলুম। বক্রেশ্বরের শ্মশানে এক সাধু থাকেন শুনেছি, উলঙ্গ হয়ে থাকেন শ্মশানে শুয়ে, কেউ খেতে দিলে খান নইলে এমনি থাকেন। কাঁচা মাংস, পাতা লতা এমন কি বিষ্ঠা খেতেও তাঁর আপত্তি নেই বোধ হয়—এমন নিস্পৃহ তিনি।

"খোজ করে গেলুম। প্রথম ত দেখাই পাওয়া যায় না। তিন দিন ধন্না দিয়ে পড়ে থাকতে দর্শন পেলুম। বিপুল দেহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাগলের মত ভাবভঙ্গী--কিন্তু পাগল নন্। একদিন আমার চোখের সামনে শিয়ালের দেহ ধরে বনের মধ্যে গিয়ে সেঁধুলেন, কেউ আর খুঁজেই পেলো না। বুঝলুম যে এতদিন ধরে যাকে খুঁজেছিলুম এতদিন পরে তাকে পেয়েছি।"

অনিমেষের মনেও ততক্ষণে গল্প জমে উঠেছে। লোকটি থামতেই সে বললে, "তারপর?"

"লোক ত পেলুম—তাকে ধরি কী করে? কিছুতেই ধরা দেয় না। কিছু বলতে গেলে শ্মশানের পোড়া কাঠ তুলে তেড়ে আসে। একদিন খুব কান্নাকাটি করতে সব শুনলে মন দিয়ে, কিন্তু তারপর যা বকুনিটা দিলে, বললে ভালো চাস তো এসব মতলব ছাড়। সাধনা করবি তুই, ঐ দেড় ছটাক কাঁপা নিয়ে? তোর কাজ নয়—বুঝলি, মরবি একেবারে। তা ছাড়া ভোগ করবার জন্য এসব কাজ যে করতে আসে তার একূল ওকূল দুকূল যায়। রাককৃষ্ণ

পরমহংসের গল্প পড়িসনি ? মাকে বলেছিল মা অষ্ট সিদ্ধিই দে—হৃদে বলছে চাইতে। মা বললেন, কাল সকালে এর উত্তর পাবি। পরের দিন সকালে দোর খুলতেই নজরে পড়ল একটি মেয়েছেলে ঐদিকে ফিরে শৌচ করতে বসেছে—পরমহংস অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এসে ভাগ্নেকে এই মারে ত এই মারে। বুঝলি—এমনি তুচ্ছ শুধু নয় ছোট জিনিষ ওসব। ঘরে ছেলে ঘরে ফিরে যা—বিয়ে থা কর। ভগবানকে ডাক, নয় ত কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিস্। অনেক কাকুতি মিনতি করলুম, বাবার আর দয়া হ'ল না। আমি কিন্তু মশাই হাল ছাড়লুম না।…ঐ খানেই পড়ে রইলুম, বলতে গেলে না খেয়ে দেয়ে আর গোপনে ওর দিকে নজর রাখলুম। যদি আসল প্রক্রিয়ার কিছু হদিশ পাই—বুঝলেন না ? এ'দিন কি আর বৃথাই এ লাইনে ঘুরেছি। আসল মানুষ না পাই, ওদের ভেতরের কথা কিছু কিছু জেনেছি বৈকি ! তারপর হ'ল কি মশাই, আরও দু-একজন সাধক আর ভৈরবী ওখানে এল বাবার সঙ্গে দেখা করতে। গোপনেই এল কিন্তু আমি ত ঐখানেই পড়ে থাকি, আমাকে এড়াবে কি করে ? ওঁদের পর পর কদিন চক্র বসল। তাও দেখলুম—মনে হ'ল আর কি, সব শিখে গেছি…ওখান থেকে রওনা হয়ে আর বাড়ী ফিরলুম না, নির্জ্জন স্থান অথচ শ্মশান, লোকালয় কাছে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়লুম। পথে নলহাটিতে একজন তান্ত্রিকের কাছে দীক্ষাও নিয়ে এলুম।

'ও মশাই, এলুম ত এখানে, কিন্তু সাধনা আর হয় না। প্রথম দিন থেকে বিঘ্ন। উপকরণ জোটে ত দিন পাই না, দিন পাই ত উপকরণ নেই—শেষে অনেক কৌশল ক'রে অনেক নীচে নেমে যদি বা সব যোগাড় করলুম, মঙ্গলবার অমাবস্যার রাত পেয়ে যেমন আসন ক'রে বসেছি—কী বিঘ্ন, ধ্যানে মন দেব কি, কিছুতেই মন স্থির করতে পারি না… এখন এটা বাসের রাস্তা হয়ে শ্মশান এখান থেকে সরে গেছে, আগে এখানটাতেই শ্মশান ছিল, এখন সেখানে

ঘর দেখছেন, এই যেখানে আমরা বসে আছি এইখানেই সেদিন আসন করে বসেছিলুম—'

নিজের অজ্ঞাতেই অনিমেষ যেন একটু সরে বসে। তারপর বলে, 'আচ্ছা বিঘ্ন কি রকমের? ভয় পেলেন? শুনেছি ত এ রকম সাধনায় বসলে প্রথম প্রথম নানা রকমের ভয় দেখায়—কিন্তু সেটা শুধুই পরীক্ষা করার জন্যে। আপনিও ত সে রকম শুনেছিলেন নিশ্চয় তবে ভয় পেলেন কেন?'

হাসলে লোকটা আবারও। কাউকে ছেলেমানুষী করতে দেখলে বিজ্ঞ মানুষরা যেমন হাসে কতকটা তেমনি হাসি। বললে, "জানে ত সবাই কিন্তু শোনা এক জিনিস আর অভিজ্ঞতাটা আর এক। তেমন অভিজ্ঞতা হ'লে বুঝতেন! শুনবেন কেমন? মড়ার বুকের ওপর বসেছি আসন করে, মড়ার খুলিতে ক'রে মদ খাচ্ছি—মনে ভয় ডর কিছুই নেই, এই বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই লোকেরই বুকের মধ্যে হিম হয়ে গেল সে সব শুনে। না, না, তেমন ভয়ানক কিছু নয়, প্রথম শুরু হ'ল শুধু ফিস্ ফিস্ কথার শব্দ, খিল খিল হাসি, চাপা হাসিই। ক্রমে সেইটাই বাড়তে লাগল। মনে হ'ল দশজন, বিশজন, একশজন—হাজার হাজার। আপনার চারপাশে যদি লক্ষ লোকের ফিস্ ফিস্ কথারই শব্দ হতে থাকে ত কেমন মনে হয়? আর তার সঙ্গে চাপা এক ধরনের খিল্ খিল্ হাসি। তবু আমি স্থির হয়ে আসনেই বসে রইলুম—নড়লুম না। যদিও কাজে আর মন দিতে পারলুম না, এটাও ঠিক। তারপর মশাই—স্পষ্ট দেখতে লাগলুম শ্মশানের মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে যেন মড়াগুলো উঠছে। কতকাল থেকে মরেছে সব—কত হাজার বছর ধরে। এক এক জনের বীভৎস চেহারা, রোগে যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। কেউ বা খুন হয়েছিল কেউ বা ঠ্যাঙ্গাড়ের হাতে প্রাণ দিয়েছে, কেউ বা গলায় দড়ির মড়। ঠিক সেই অবস্থায় উঠেছে—তেমনি কন্দকাটা বা হাড়গোড় ভাঙ্গা অবস্থায়। সকলেরই মুখে রাগ, চোখের দৃষ্টিতে

আগুন। তারা সবাই আঙ্গুল তুলে শাসাতে লাগলো, পাপিষ্ঠ তুই এখানে কেন? শ্মশান অপবিত্র করতে এসেছিস্। চলে যা, দূর হয়ে যা। জানিস না এখানে আমরা পাহারা দিচ্ছি? মনে পাপ নিয়ে তুই এসেছিস শ্মশান জাগাতে? চলে যা—তার মধ্যে এক জনের আবার শুধু কঙ্কাল, বোধ হয় তাকে পুঁতে রেখেছিল কোথাও মেরে—তারপর তাকে তুলে পোড়াতে হয়েছে।····সেটাই সব চেয়ে কাছাকাছি এল, মুখে সেই একই শব্দ, দূর হ! দূর হ! ভয় পেলুম খুব তবু জানি একবার ভয় পেলেই গেল—চিরকালের মত। প্রাণ পণে চেঁচিয়ে উঠলুম, যাবো না। উঠবো না আমি। ব্যস্—আর যায় কোথা, সেই কঙ্কালটা আরো এগিয়ে এসে তার সেই অস্থিময় আঙ্গুল কটা দিয়ে আমার গলাটা চেপে ধরলো। ওঃ সে কী চাপ, যেন মোটা লোহার সাঁড়াশী। কত চেষ্টা করলুম মুক্ত হবার, কিন্তু সে বজ্রকঠিন মুষ্টি খোলে কার সাধ্য। দম বন্ধ হয়ে গেল, বুকে সে এক অসহ্য যন্ত্রণা—মনে হ'ল যেন দেহের প্রতিটি শিরা ফেটে যাচ্ছে।···আকুলি বিকুলি করতে লাগলুম এক ফোঁটা হাওয়ার জন্যে—সে হাওয়া চারিদিকেই রয়েছে তবু এক বিন্দু বুকের মধ্যে নিতে পারলুম না, বরং আরো চেপে বসতে লাগলো সেই সাঁড়াশীর মতো আঙ্গুলগুলো।'

'তারপর?' রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করে অনিমেষ। 'তারপর?' আবার সেই হাসি, তারপর আর কি, মুক্তি, সেই থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানেই, কাজ নেই কামাইও নেই। জায়গাটার মায়া ছাড়তে পারছি না। সব চেয়ে কষ্ট হয় কথা কইবার লোক নেই বলেই—'

—'কি—কিন্তু' কথা কইতে গিয়েও একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে অনিমেষের গলা যেন কেঁপে যায়, 'আপনি মুক্তি পেলেন কি করে?'

'তা আমি জানি না। এই সময় দেখলুম যে, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমারই ভূতপূর্ব আশ্রয় অর্থাৎ দেহটার পাশে। যারা

এসেছিল তাদেরও ত কাজ শেষ, তারাও সব যে যার মিলিয়ে গেছে। এক সময় সব কিছুর শাস্তি।'

তবু বুঝতে কয়েক মিনিট দেরি লাগে অনিমেষের, কথা কইতে গিয়েও গলার স্বর বিকৃত হয়ে যায়, 'তার—তার মানে কি? আপনি কি বলতে চান যে আপনি তখন মা-মারা গেলেন? আ-আপনি কি মড়া?'

প্রশ্নের শেষ অংশটা আকস্মিক আর্তনাদের মত চিৎকারে পরিসমাপ্ত হয়, কিন্তু সে প্রশ্ন করছে কাকে? কেউ ত নেই। শুধু সে একা বসে আছে ঘরে, বাকী জিনিষগুলো ঠিক আছে, পিদিমটা তেমনি জ্বলছে। শুধু উঁচু হয়ে বসে যে লোকটা কথা বলছিল সে আর নেই—

কোথা দিয়ে গেল লোকটা, কখন উঠে গেল তার চোখের সামনে দিয়ে?

বার বার এই ব্যাকুল প্রশ্ন ওর মনে উঠতে লাগলো কিন্তু উত্তর দেবে কে! খানিক পরে আসল প্রশ্নটা আবার প্রবল হয়ে উঠলো, তাহলে কি লোকটা যা বলে গেল তাই সত্যি, ও লোকটা মানুষ নয়—অশরীরী, বিদেহী আত্মা! খাবাব কিছু লাগে না ওর—বলেছিল বটে। মরবার ভয় নেই।

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে অনিমেষের কিন্তু সে শিক্ষিত ছেলে, বিজ্ঞান-পড়া ছেলে। এ সব মিথ্যা—কল্পনা, আত্মসম্মোহন বলেই জানে। সে বিশ্বাস করত না এ কথা যে, এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বসে সে ভূত দেখেছে।

আচ্ছা, ছায়া পড়েছিল কি ওর? মনে করবার চেষ্টা করে অনিমেষ।

সত্যিই কি—? না লোকটা তার সঙ্গে তামাসা করছে? আগে যা ভেবেছিল তাই? ডাকাত বা ঠ্যাঙ্গারে জাতীয়—ভয় দেখিয়ে গেল এরপর কাজ হাসিল করা সোজা হবে ভেবে?

মনকে প্রবোধ দেয় সে, এইটে হওয়াই সম্ভব। ভূত হলে আলোয় থাকবে কি করে? ...বদমাইস। আরও বেশী ভয় দেখাবার জন্যে ম্যাজিকওয়ালাদের মত চোখের নিমেষে সরে গেছে।

দোরটা বন্ধ করে দেবে না কি?

দেওয়াই উচিত।

পালাবে?

কোথায় যাবে এই অন্ধকারে। আবও তো ওদের কবলে গিয়ে পড়তে হবে! সে দেখতে পাবে না ওদের, ওরা দেখবে। তার চেয়ে দোর বন্ধ করে বসে থাকা মন্দ নয়—যা হবার হবে, আলো ত থাকবে এখানে। লোকগুলোকে চোখে দেখা যাবে।

অনিমেষ অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায়। হাত পায়ে যেন জোর নেই। কোনমতে উঠে গিয়ে সন্তর্পণে দোরটা বন্ধ করে দিলে। ভাগ্যিস ভিতরে খিল আছে। বেশ মজবুত খিল। দেখে শুনে ভাল করে বন্ধ করে দিলে। যাক নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এ কী?

হঠাৎ আলোটা নিভে গেল যে! মুহূর্তের মধ্যে, কোনরকম নোটিশ না দিয়েই ঘরটা, তার চার পাশ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল। তেল ছিল না? কিন্তু তা হলে ত একটু একটু করে ম্লান হয়ে আসবে।

তবে—ভয়ে ওর গা-টা হিম হয়ে গেল—তবে কি ঘরের মধ্যে কেউ ছিল? এখন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে? সেই লোকটাই কি? হয়ত তক্তোপোশের নীচে ঢুকে গিয়েছিল তখন, সেইখানেই লুকিয়েছিল, তাই সে ওর চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করে নি। নিশ্চয় তাই।

কী সর্বনাশ! এ যে হিতে বিপরীত হ'ল। ওদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে একেবারে ওদের মুঠোর মধ্যেই এসে পড়ল। পকেটে দেশলাই পর্যন্ত নেই। ব্যাগটাই বা কোথায়? চৌকিটা যে ঠিক কোন্ দিকে। তাও মনে পড়ছেনা।

উঃ কী বদমাইস্ লোকটা।

ক্রুদ্ধস্বরে, হয়ত বা একটু ভীত কণ্ঠেই অনিমেষ ব'লে উঠলো, 'কে? কে ওখানে? আলো জ্বালো বলছি শিগগির, নইলে ভালো হবে না, দেখিয়ে দেব মজা। কে? জ্বাললে না?'

নিস্তব্ধ চারিদিক। কোথাও একটা জনপ্রাণী আছে বলে মনে পড়ে না। রহস্যময় সুগম্ভীর স্তব্ধতা।

ঘরে কি জানলা ছিল? তাও ত মনে পড়ছে না ছাই।

জানলা খুলে দিলে তবু একটু নক্ষত্রের আলো আসে!

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেও জান্‌লা কোন্ দিকে মনে পড়ল না। আচ্ছা, একটু এগিয়ে গেলেই ত দেওয়াল, হাৎড়িয়ে দেখতে দোষ কি!

পরক্ষণেই মনে পড়ল, আরে! আচ্ছা বোকা ত সে দোরটাইত রয়েছে, খুলে বেরিয়ে পড়লেই ত হয়। ঘরের অন্ধকারের চেয়ে বরং বাইরের অন্ধকার ভালো, নক্ষত্রের আলো আছে। ব্যাগটা? থাকগে, প্রাণ ত বাঁচুক।

যেদিকে দোর দিয়েছে এইমাত্র, সেই দিকেই হাত বাড়ালো। কৈ সে দরজা? ও ত দরজা সবে বন্ধ ক'রে এ পাশ ফিরেছে আর আলো নিভেছে।

তবে কি ও দিক্‌ভুল করেছে? এদিকে দরজা ছিল না?

'আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে যায় সে। এইটুকু ত ঘর, দেওয়াল পেলে। দেওয়াল হাৎড়ে হাৎড়ে ঘুরলেই দরজা পাবে। শুধু ভয় হচ্ছে, ও লোকটা না এই সুযোগে পেছন থেকে মেরে বসে! কিন্তু উপায়ই বা কি? এদের কবলে যখন এসে পড়েইছে।

মরিয়া হয়েই এগোয় অনিমেষ। এক পা এক পা করে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোয়।....এক দুই....একি, এ যে কুড়ি পা হয়ে গেল। ঘরটা যতদূর আন্দাজ হয় দশ বারো ফুটের বেশী হবে না লম্বায়। নেহাৎই ছোট ঘর। অথচ কুড়ি পা মানে অন্তত পনের ফুট।

আরও দুপা···আর ও দশ—আর ও কুড়ি।

একি সে মাঠে চলেছে না কি ?

কী রকম হ'ল! চল্লিশ পা চলার মত ঘর ত নয়। কোণাকুণি হাঁটছে? তাতেই বা এতদূর হবে কেমন করে? তবু আরও কয়েক পা যায় সে। হয়ত চলতে চলতে কখন গতি বেঁকে গিয়েছে। সোজা হয়ে হাঁটে আরও খানিকটা।

না, তবু দেওয়াল নেই। রহস্যময় অন্ধকার, অনন্ত শূন্যতা বাইরের মুক্ত শূন্যতা নয়, চার দেওয়াল চাপা—তবু তা অনন্ত।

এইবার কপালে ঘাম দেখা দেয় অনিমেষের। এতক্ষণ ডাকাতের ভয়ে যা হয়নি এইবার তা হ'ল, পা দুটো কাঁপতে লাগল সর্ সর্ করে!··· একেবারে যেন ভেঙ্গে এল! অসহায় ভাবে সেইখানেই বসে পড়ল।

এ তার কী হল! কী চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ল সে?

তবে কি সে লোকটা অশরীরী—সত্যি-সত্যিই? সে কি তাহলে কোন প্রেতযোনির মায়াতে এসে পড়েছে?

বিহ্বল হয়ে ভাবে অনিমেষ কি করবে কিন্তু কোন পথ দেখতে পায় না।

ঐ যে কারা আসছে না? হ্যাঁ, ঐ ত কত লোকের পায়ের আওয়াজ। অন্তত আটদশ জনের কম নয়। কিংবা আরও বেশী। এই বাড়ীর কাছেই আসছে, ঐ দাওয়ায় উঠল।

'ও মশাই শুনছেন? ও মশাই—'

গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। টাকরা শুকিয়ে গিয়েছে। গলা কাঠ।

কিন্তু ওরাই যদি সেই ডাকাতের দল হয়, তা হোক্ তবু তো তারা মানুষ। ভয় হয় একটু অনিমেষের। তাহলে অন্তত এটা প্রেতের মায়া নয়। আঃ—বাঁচা গেল!

হ্যাঁ ডাকাতই।

নইলে ওরা অমন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে কেন? বহু লোক যেন পরস্পরের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে। আরও লোক বাড়ছে। আরও পায়ের শব্দ, বহু ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার আওয়াজ—

একি—ওরা কি ঘরে ঢুকেছে না কি? কেমন করে ঢুকলো?

চারিদিকে ওদের যে শব্দগুলো এগিয়ে আসছে। ওর চার পাশে, খুব কাছে। খিল খিল করে চাপা হাসির শব্দ—অনেকে হাসছে তবু শব্দটা খুব জোর নয়।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরফ নেমে যায় দেহের মধ্যে। হাতে পায়ে আর কোন সাড় থাকে না। আতঙ্ক যে এমন জিনিষ তা আগে অনিমেষ কল্পনাও করে নি। মস্তিষ্ক সুদ্ধ যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে আসছে।

চীৎকার করবে? সাধ্য নেই। পালাবে? পথ কৈ? কিন্তু কিছুতো একটা করা উচিত।

লোকগুলো যেন ওকে ঘিরে ধরেছে। তাদের নিঃশ্বাস, দূষিত তীব্র, উষ্ণ নিঃশ্বাস ওর সর্বাঙ্গে…

মনে পড়ে গেল লোকটার বর্ণনা। সেওত এমনি ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনেছিল, এমনি হাসি। তার পর? তার পর? সেই মৃতের পুনরুত্থান, সেই কঙ্কালের অভিযান।

তারও অদৃষ্টে কি তাই হবে? সে তো কোন দোষ করেনি। সে তো সাধনা করতে আসে নি শবের বুকের ওপর চড়ে?

অকস্মাৎ কে একজন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল তারই আশেপাশে কোথাও। তীক্ষ্ণ চড়া গলায় সে হাসি মনে হল যেন তার চার পাশের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে, আবার চারিদিকের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে তারই চারিদিকে। বহুক্ষণ ধরে যেন সেই হাসির শব্দ ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তাকে

ঘিরে। বিশ্রী, তীক্ষ্ণ একটা উপহাসের হাসি—সে হাসির জাল যেন তাকে চারিদিক থেকে বেড়ে ধরেছে, আর নিস্তার নেই।

প্রাণপণ চেষ্টায় চীৎকার করে উঠল একবার অনিমেষ—'হে ভগবান, এ কী করলে!'

সত্যিই তো! ভগবানের কথা ত তার মনে ছিল না। তাঁকে ত সে ডাকে নি।

'হে ভগবান, হে হরি বাঁচাও—হে রামচন্দ্র!' আর কিছু মনে এল না তার। গায়ত্রী মনে আছে কি? হাঁ আছে। পৈতেটা কোথায়?

সুগভীর ক্লান্তি আর অসহ তন্দ্রায় সমস্ত চৈতন্য শিথিল হয়ে আসে ওর।

ঘুম যখন ভাঙল অনিমেষের তখনও সকাল হয়নি কিন্তু ফরসা হয়েছে একটু। খানিকটা সময় লাগল ওর সবটা মনে করতে তারপর ধড়-মড়িয়ে উঠে বসে ভাল করে চেয়ে দেখলে যে সে বাস দাঁড়াবার জায়-গাটায় পড়ে ঘুমিয়েছে কখন—স্যুটকেসটা খানিকটা দূরে, একটা গাছ তলায় পড়ে আছে। সে ঘর? যতদূর যায় কোথায় কোন ঘরের চিহ্নমাত্রও নেই। হয়ত সবটাই ওর স্বপ্ন।

সে উঠে নদীতে গেল মুখ হাত ধুতে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের রচনায় বাংলার ঘর-সংসার এবং লোক জীবনের সহজ সুন্দর রূপ নিখুঁতভাবে বিবৃত। তাঁর অসংখ্য ছোট গল্প এবং উপন্যাসে শরৎচন্দ্র—প্রভাতকুমার—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নরেশ সেনগুপ্তের অনুবর্তন। অব্যবহিত পরে অবশ্য তিনি কাহিনীর বিষয়বস্তু এবং প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে বাধ্য হলেন। দারিদ্র্য, অনটন, অবক্ষয় ইত্যাদির

রেখাচিত্র ধীরে ধীরে তাঁর গল্পেও দেখা যেতে লাগল। তাঁর রচনা মূলতঃ চরিত্রভিত্তিক। ঘটনার পারিপাট্যও তাঁর সাহিত্যের অনিবার্য গুণ। বাঙালীর জীবন-বৈচিত্র্য তাঁর রচনায় বিশ্বাস্য রূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছে। গল্পকথনের সহজ সাবল্য, ভাষার সরসতা তিনি খুব অনায়াসে আয়ত্ত করেছেন। অলৌকিক কাহিনীব ক্ষেত্রেও তাঁর সহজ-বিচরণ লক্ষ্যণীয়। তাঁর কাহিনীর কুশীলব আমাদেব পবিচিত পারিপার্শ্ব থেকে উঠে আসে। তাদের জীবন-যন্ত্রণা বা বিবর্তনের ইতিবৃত্ত একান্তভাবেই তাই প্রতিনিধিমূলক। সেখানেই একজন লেখকের স্বার্থকতা। তিনি সেইসব চরিত্র সহজাত কুশলতায় অত্যন্ত পরিচিতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর অসংখ্য উপন্যাস ও গল্পে গ্রামবাংলার চিরন্তন মানবজীবনের কথা পরিব্যাপ্ত রয়েছে। তাঁর বর্ণনাভঙ্গির সহজতা এবং সরসতা অতুলনীয়। চরিত্র চিত্রণেও তিনি সিদ্ধহস্ত। অলৌকিক কাহিনী রচনায় তাঁর পারদর্শিতা লক্ষ্যণীয়। তিনি জীবনের বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পৌষ ফাল্গুনের পালা' রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত।

ভৌতিক



সুমথনাথ ঘোষ

সে বছর পুজোর সময়। কোথায় বেড়াতে যাবো স্থির করতে না পেরে হঠাৎ রওনা হলুম গোপালপুর। শুনেছিলুম, সমুদ্র উপভোগ করতে হলে ওর চেয়ে ভালো জায়গা নাকি আর দুটি নেই ভারতবর্ষে! চিরদিন একা একা ঘুরে বেড়ানো আমার অভ্যাস এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না।

কিন্তু মুস্কিলে পড়লুম সেখানে পৌঁছে। এতো ছোটো জায়গা যে আগে থাকতে ব্যবস্থা না করে গেলে থাকবার স্থান পাওয়া যায় না—এ কথাটা আমার জানা ছিল না। অন্য সব স্থানে যেমন বেড়াতে গিয়ে নিজেই খুঁজে নিই থাকবার জায়গাটা, এখানেও সেই ভরসাতেই এসেছিলুম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সকাল থেকে আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে যখন বেলা বারোটা বেজে গেলো তখন আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। সকলের মুখেই এক কথা’ এখানে থাকবার জায়গা কোথায় পাবেন, কতো লোক প্রতিদিন এসে ফিরে যাচ্ছে।

বাস্তবিক জায়গাটা খুবই ছোটো। এতোই ছোটো যে, গ্রামও বলা চলে না। চারদিকে নুলিয়াদের বস্তি। তার মধ্যে গুটি চারেক ছোটো বড়ো হোটেল, আর কিছু সংখ্যক পাকা বাড়ি—মোট এই সম্বল। হোটেলগুলো সব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আর অবাঙালিতে ভর্তি। বাকি বাড়িগুলোও সব দু-তিন মাস আগে থেকেই ভাড়া হয়ে যায়। জায়গাটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের খুব

প্রিয়। তাই পথে ঘাটে ওদেরই দেখা যায়। বাঙালী খুব কম চোখে পড়ে।

বিরক্ত হয়ে শেষে স্যুটকেশ ও বিছানা নিয়ে ফিরে এলুম—বাস ধরে বারহামপুর স্টেশনে চলে যাবার জন্যে। বাস আসার তখনো দেরি ছিলো। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক—যেমন রোগা, তেমনি ঢ্যাঙা, তেমনি ধবধবে গায়ের রঙ, পায়জামার ওপরে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে পোষ্ট-অফিস থেকে কতগুলো চিঠি পত্র নিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ সময় কোথায় যাবেন? এখন তো কোন ট্রেন নেই! তাছাড়া বাসও তো সেই তিনটেয়।

মনের রাগ চাপতে না পেরে বলে ফেললুম, একটা আশ্রয় তো পাবো, এভাবে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না নিশ্চয়?

আমার গলার ঝাঁজ শুনেই ভদ্রলোক বোধ হয় আমার মানসিক অবস্থাটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই আমার কাছে আরো একটু সরে এসে বললেন, জায়গা পেলেন না বুঝি থাকবার? এখানকার সবচেয়ে অসুবিধা এইটে। কতো লোক প্রতিদিন স্ত্রী পুত্র-পরিবার নিয়ে এসে যে এইভাবে ফিরে যান!

আমি বললুম, মশাই, অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এরকম জঘন্য স্থান আর দুটি দেখিনি। এতোই যদি স্থানেরঅভাব তাহলে রেল কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক ডাকে কেন গোপালপুরের সমুদ্র উপভোগ করার জন্যে, বুঝতে পারি না!

ভদ্রলোক এবার একটু হেসে আমায় প্রশ্ন করলেন, আপনার নামটি কি জিগ্যেস করতে পারি স্যর?

নাম বলতে তিনি লাফিয়ে উঠলেন, আপনি ঘোষ? আর আমি যে বোস! তাহলে আর ভাবনা কি! কুলীনস্য কুলীনো

গতিঃ। চলুন আমার ওখানে উঠবেন।···বলেই তিনি আমার মতের অপেক্ষা না করেই একটা মুটেকে ডাকলেন।

মুটের পিছনে আমরা দু'জনে গল্প করতে করতে চললুম, আমার বাড়ি কোথায়, কি চাকরি কবি ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা শেষ হতে না হতে দেখি এক বিরাট বাগান বাড়ির ফটকের মধ্যে আমরা ঢুকে পড়েছি। ভদ্রলোক তখন বললেন, কুড়ি বিঘে বাগানের মধ্যে এই বাড়ি। এটা এককালে একজন ধনী সাহেবের ছিলো। উপস্থিত এব মালিক এক মাড়োয়ারি মহাজন। আমার শ্যালক ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের উকিল, সে এটা বিনা পয়সায় আমায় ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

বিরাট সেই বাগানটা পরিক্রমা করে আমরা যখন বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালুম তখন বিস্ময়ে আমি হতবাক! বাড়ি নয় শিল্পীর আঁকা একখানা ছবি! সত্যি কথা বলতে কি ওই ধরনের জংলি পরিবেশের মধ্যে যে এরকম সুন্দর অট্টালিকা থাকতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি!

বাঃ, বলে থমকে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, এখনি হয়েছে কি, আগে এখানকার সব দেখুন তারপর ও কথা বলবেন। সাদা কাঠের তৈরি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই দেখি, তিনি সত্যি বলেছেন! কি অপূর্ব শোভা, সামনে নীল সমুদ্র আকাশের সঙ্গে যেন মিশে রয়েছে। পিছনে গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে দেখা যায় অদূরে পাহাড়ের পর পাহাড়! বাঁ পাশেব উঁচু উঁচু বালির স্তূপ, তার মধ্যে সারি সারি ঝাউ গাছ, আর ডানদিকে বিরাট আমের বাগান।

ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম মণিকা! মিঃ বোস আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি হেসে বললেন, বাবা বাঁচলুম, এতো বড়ো বাড়িতে যেন একা একা হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। তবু তো একজন সঙ্গী পেলুম। কিন্তু ঠাকুরপো, একটি শর্ত্ করতে হবে

তোমায়—আমরা যতোদিন না যেতে বলবো ততদিন তুমি এখান থেকে যাবে না।

বললুম এমন জায়গায় থাকতে পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা, বৌদি!

ভারি হাসিখুশি আমুদে মানুষ এই বৌদি। ওর স্বামী যেমন গম্ভীর। তিনি কিন্তু ঠিক তাঁর বিপরীত। একবেলাব আলাপে তিনি আমায় এমন আপন করে নিলেন যেন কতো কালেব জানা শোনা!

বিকেল হলে বৌদি ও তাঁর স্বামী আমায় নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাগানটা সব দেখিয়ে শেষে একটি ফুল বাগানেব মধ্যে নিয়ে এলেন। সুন্দর শ্বেত পাথরের বাঁধানো চত্বরেব ওপব কয়েকটা শ্বেত পাথরের বেঞ্চি পাতা। আর মাঝখানে একটা বেদীর ওপব শ্বেতপাথরের পুরুষ মূর্তি। তার নীচে লেখা মিঃ জন রাইট। জন্ম ইংরেজী ১৯০৯ সাল ও মৃত্যু ১৯৪৪ সাল। জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ দুটোও পাথরে খোদাই করা।

এক একটা বেঞ্চিতে আমরা এক একজন বসে পড়লুম। অতো বড়ো বাগানটা ঘুরে ঘুরে আমরা সবাই ক্লান্ত ও অবসন্ন। মিঃ বোস আমাকে বললেন, ইনিই ছিলেন এর আসল মালিক। হঠাৎ এঁর মৃত্যু হয় এখানে। তারপর এঁর স্ত্রী নাকি জলের দামে বিক্রি করে দিয়ে বিলেত চলে যান।

মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে হলো, এইখানে বসে বসে একদিন মিঃ রাইট আমাদেরই মতো তাঁর স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে হয়তো কতো গল্প গুজব করেছেন! এমনি আবো কতো কি ভাবতে ভাবতে বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। সহসা আমার ডানদিকের গালের ওপর মনে হলো কে যেন গরম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। চমকে উঠে মুখটা ঘুরিয়ে নিতেই আমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠলো! ঠিক সেই

মুহূর্তে ওরা কি চিন্তা করেছিলেন, জানিনা। ওঁদেরও মুখে কোন কথা ছিলো না। ওঁরা নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। আমি ঘাড়টা ফিরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম ওঁরা দু'জনে যেন হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে একবার পেছনদিকে তাকালেন।

মুহূর্তে সে ভাবটা কেটে গেলো! আমি বললুম, কি হলো?

বৌদি একটু হেসে জবাব দিলেন, সমুদ্রের যা হাওয়া—সব সময় যেন মনে হয় কে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। না ঠাকুরপো?

বললুম, আপনার তো অভ্যেস হয়ে গেছে। নূতন লোকের পক্ষে অসুবিধা!

তাহলে আপনার মনের কথাটা ধরে ফেলেছি। কি বলুন? আবার একচোট হাসলেন বৌদি।

আমি বললুম, ধরেছেন ঠিকই। তবে ওসব ভূত-প্রেত কোনদিনই আমি বিশ্বাস করিনা, ভয় জিনিসটা আসলে মানুষের নিজের সৃষ্টি।

মিঃ বোস যেন আমার কথাটা লুফে নিলেন। তিনি বললেন, আমিও ভাই সব সময় তোমার বৌদিকে এই কথাটি বলি। প্রথমটা এসে বেশ দু-চার দিন ওর গা ছম্ ছম্ করেনি তা নয়।

যাও, বাজে কথা বলতে হবে না! আমি যেন কচি খুকি! তবে এতো বড়ো বিরাট বাড়িটা খাঁ খাঁ করে, কেবল আমরা দু'টি প্রাণী থাকি ওপরে আর নিচের দিকে রাঁধুনি, ঝি, মালী কোথায় থাকে তার ঠিকানা নেই!···বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

তখনো সন্ধ্যার দেরি ছিলো। আমি বললুম, বড়ো সুন্দর এই জায়গাটা। আর একটু বসুন না, বৌদি।

বৌদির কণ্ঠে প্রতিবাদ ওঠে, ভাই এ জায়গায় বড়ো সাপের ভয়। সন্ধ্যে হলেই তাই কেউ বাগানে পা দেয় না। দেখছো না চারিদিকে কেয়াগাছের কি রকম ঝোপ!

আর কোন কথা না বলে আমরা তিন জনেই চলতে শুরু করলুম,

প্রথমে আমি তারপর মিঃ বোস ও সর্বশেষে বৌদি! কয়েক পা এগিয়েছি—এমন সময় বৌদি হঠাৎ আঁৎকে উঠলেন।

কি হলো! কি হলো! বলে আমরা দু'জনে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি বৌদির শাড়ির আঁচলটা কে যেন ধরে কেয়াগাছের আড়াল থেকে টেনে ধরেছে। তাঁকে যেন সেখান থেকে চলে আসতে দিতে চায় না। বৌদির ভয়ার্ত মুখে রক্ত ফিরে এলো। তিনি বললেন, কিছু হয়নি এই হাওয়ার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরলুম। দাও তো ভাই আঁচলটা কাঁটা থেকে ছাড়িয়ে। দেখো, পরোপকার করতে গিয়ে আবার হাতে যেন কাঁটা ফুটিয়ে বসো না।

সত্যি, সমুদ্রের ধারে যে বাস করেনি প্রথম প্রথম তার ভয় লাগে বৈকি! মনে আছে, প্রথম রাত্রে একেবারে ঘুমুতে পারি নি, বাইরে ঝাউগাছ গুলোর মাথায় সমুদ্রের হাওয়া যেন গুমরে আর্তনাদ করে। এই মনে হয় কে যেন ঠেলছে, পরক্ষণেই দেখি কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে! 'কে—কে' বলে চিৎকার করে বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসতেই ও পাশের ঘর থেকে মিঃ বোস সাড়া দেন, ভয় পাবেন না মিঃ ঘোষ। ও লোক নয়—সমুদ্রের হাওয়া—ওর নাম 'ওজোন্' যা মানুষের দেহে বল সঞ্চার করে। বলে হাসতে থাকেন।

বলা বাহুল্য, দু-চার দিনের মধ্যেই শব্দগুলো আমার অভ্যস্ত হয়ে গেলো। কিন্তু বৌদি টেবিলে খেতে বসে আমার সব সময়, সময় খোঁচা দিতেন—এই তুমি বীর পুরুষ—সাহসী?

বৌদির কাছে এই বদনামটা ঘোচাবার জন্যে মনে মনে একটা সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলুম একদিন সমুদ্র বেড়িয়ে ফিরে দেখি বৌদির মুখ ভার ও মিঃ বোস চিন্তিত। ব্যাপার কি, প্রশ্ন করতে বৌদি একেবারে ঝেঁজে উঠলেন, বললেন, এখানকার ঝি চাকরগুলো বড্ড নেমকহারাম! ঝিটা তো ছেলের অসুখের নাম করে চারদিনের ছুটি নিয়ে কাল চলে গেছে। আজ আবার

রঁাধুনিটি বলছে তার নাকি বাপ মর—মর। তাকে দেখে পরশু ফিরে আসবে, অথচ কাল লক্ষ্মী পূর্ণিমা, সারাদিন উপোস করে থেকে রাত্রে গোবিন্দ মন্দিরে পুজো দিয়ে তবে আমি জল খাবো, এঁটো-কাঁটা কিছু ছুতে নেই।

আমি বললুম, ওঃ এই কথা। আচ্ছা আমি এখুনি রঁাধুনিটাকে বুঝিয়ে রাজি করাচ্ছি। আপনি কিছু ভাববেন না।

মধ্যে মধ্যে ওকে দু-চার আনা বকশিশ দিতুম। দিনে দশ-বারো কাপ চা খাওয়া আমার অভ্যেস, সে ঠিক ঠিক সময় ওপরে আমার পৌঁছে দিয়ে আসতো বলে।

মিঃ বোস বললেন, দেখো ভাই তুমি যদি বোঝাতে পারো, আমরা স্বামী—স্ত্রী তো হার মেনেছি।

আমি রান্না ঘরে গিয়ে প্রথমেই দুটো টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে তারপর আসল কথাটা পাড়লুম। বললুম, অন্ততঃ লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিনটা তুমি থেকে যাও।

রঁাধুনি ঠাকুর তার গোল গোল দুটো চোখ আমার মুখের ওপর রেখে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো দু'টাকা কেন, পঞ্চাশ টাকা দিলেও আমি কাল রাত্রে এ বাড়িতে কাজ করবো না।

তার কণ্ঠে ভয়ের ইঙ্গিত পেয়ে আমি শুধু প্রশ্ন করলাম, কেন! কি ব্যাপার তোমার!

সে এবার ফিস্‌ফিস্ করে আমায় বললো, জানেন বাবু, লক্ষ্মী-পূর্ণিমাররাত্রে সাহেব ভূতটা……ওই মূর্ত্তিটা……ওই মূর্ত্তিটা থেকে এসে ঘরগুলোতে ঘুরে বেড়ায়।

থরথর করে তার গলা একবার কেঁপে উঠলো। তারপর দু'হাতে কান মলে জিভ কেটে জানালো যে, এর বেশি আর একটা কথাও সে মুখে উচ্চারণ করতে পারবে না! এই বলে একটু চুপ করে থেকে রঁাধুনিটা আমায় বললো, যদি ভাল চাও তো তুমিও পালাও বাবু এ বাড়ি ছেড়ে…

বৌদিদের ঘরে এসে কথাটা বলে আমি খুব হাসতে লাগলুম, মিঃ বোসও আমার হাসিতে যোগ দিলেন। কিন্তু বৌদি চুপ করে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। মালিটা কদিন আগেই ছুটি চেয়ে নিয়েছিলো তাঁব কাছে ওই লক্ষ্মী পূজোর বাত্রে বাড়ি যাবে বলে। বৌদি তখন সেই কথাটাই বুঝি চিন্তা কবছিলেন!

একটু পরে দেখি আমরা তিনজনেই চুপ করে আছি। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

আমি বললুম, কুছপরোয়া নেই বৌদি—আমি কাল রান্না করে সকলকে খাওয়াবো। ও বিদ্যেটা আমার জানা আছে, বিদেশে গিয়ে আমি বহুবার রান্না করে খেয়েছি। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করে আপনাকে শরীর নষ্ট করতে হবে না। শুধু মুখের কথা নয়। বৌদিকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা কবিয়ে নিয়ে তবে ছাড়লুম।

পরেব দিন যথাবীতি উপবাস করে থেকে সন্ধ্যাব আগে বৌদি তাঁর স্বামীকে নিয়ে গোবিন্দজীব মন্দিবে পূজো দিতে চলে গেলেন। আর আমি রান্নঘরে উনুন জ্বেলে রাঁধতে শুরু করলুম। বেচারি বৌদি সারাদিন না খেয়ে রয়েছেন। যাতে পূজো দিয়ে এলেই খেতে দিতে পারি সেইজন্যে আমি আরো বেশি তাড়া করছিলুম, বেগুন ভাজা, আলুব দম তৈরী করে, লুচির ময়দা মেখে লেচি কেটে একটা কাঁচের রেকাবিতে সাজিয়ে রেখে, যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাছপালার মাথা থেকে নেমে মাটির বুকে চেপে বসেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যে এতোটা রাত হয়েছে বুঝতে পারি নি। বৌদিদের এতো দেরি হচ্ছে কেন, ভাবছি বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এমন সময় হঠাৎ রান্নাঘর থেকে বাসন-কোসন নাড়ার শব্দ কানে এলো, বিড়াল ঢুকলো নাকি? ছুটে গিয়ে দেখলাম কোথায় বিড়াল। তবে শব্দ করল কে, কথাটা মনে আসবার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সমুদ্রের হাওয়া তো এ-ঘরে ঢোকবার উপায় নেই, তবে? ঘরের শিকল টেনে দিয়ে আবার বাইরে এসে

দাঁড়ালুম। বৌদিরা এতো দেরি করছেন কেন? ওই বুঝি তাঁরা আসছেন। ফটকটা বাড়ি থেকে অনেকটা তফাতে, তাই দু-একপা করে সেদিকে এগিয়ে যাবো কিনা ভাবছি, এমন সময় ঝাউগাছের শোঁ-শোঁ আওয়াজ ভেদ করে, মনে হলো যেন কার ভারি জুতোর শব্দ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

'কে-কে'-বলতে আমিও যেই সিঁড়ি দিয়ে ছুটে ওপরে উঠেছি, অমনি দমাস দমাস করে দরজা জানালাগুলোও শব্দ করে উঠলো থরথর করে একবার আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘরের সব আলোগুলো সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিলুম। এতে আবার সাহস ফিরে এলো বুকে। বৌদিরা জানালা-দরজা গুলো বন্ধ না করেই চলে গিয়েছিলেন, তাই হাওয়ায় ওরকম শব্দ হচ্ছিলো। আমি তখন একে একে বন্ধ করে আবার রান্নাঘরে নেমে এলুম।

মনটাকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখার জন্যে আর অপেক্ষা না করে, এবার লুচি ভাজতে বসে গেলুম। ভাজা শেষ হবার আগেই বৌদিরা এসে পড়লেন। বৌদি রসিকতা করে বললেন, 'কি ঠাকুর, রান্না হয়েছে? বড্ড খিদে পেয়েছে যে।'

আমি বললুম, সব তৈরি, বসে যান।

আমি যে কি রকম ভয় পেয়েছিলুম, সে কথাটা স্রেফ চেপে গেলুম। বৌদি হাসতে হাসতে রান্না ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন। সত্যি তুমি কি সুন্দর গোছ করে রেখেছো ঠাকুরপো।

বৌদি কিন্তু সেদিন আমাদের সঙ্গে প্রতি রাত্রের মতো এক টেবিলে বসে খেতে চাইলেন না। বললেন, আজ যখন ব্রত করেছি তখন আলাদা ভাবেই খাবো। তোমরা দু-জনে টেবিলে বসে খাও, আমি তোমাদের খাইয়ে তারপর খেতে বসবো।

আমি বললুম, তা হবে না—আপনি সারাদিন উপোস করে রয়েছেন, আপনি বরং আগে খেয়ে নিন।

বৌদি এতে রাজি হলেন না। বললেন, বেশ তোমরা এ-ঘরে খেতে বসো—আমিও ও ঘরে বসি। এক সঙ্গেই খাওয়াটা চলুক—তবে দু'জায়গায়।

আচ্ছা তাই হোক!······বলে আমার দুজনে টেবিলে খেতে বসলাম আর বৌদি তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

আমরা দু-জনে টেবিলে বসে যখন খাচ্ছি—সহসা আমার মনে হলো যেন আমাদের মাঝখানে যে চেয়ারটায় বৌদি বসে খেতেন, সেখানে একটা অশরীরী মূর্তি বসে রয়েছে। তাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না বটে তবে তার অদৃশ্য দেহের স্পর্শ যেন একটু নড়লেই আমার গায়ে লাগবে।

মনের ভয় ঢাকবার জন্য খেতে খেতে গল্প শুরু করে দিলুম মিঃ বোসের সঙ্গে। এই ভাবে বেশ ধীরে ধীরে গল্প করে খাওয়া যখন হয়ে এলো, তখন চোঁ চোঁ করে গ্লাসের জলটা সব এক নিঃশ্বাসে শেষ করে, মিঃ বোস ডাকলেন তাঁর স্ত্রীকে—মণিকা—মণিকা এক গ্লাস জল দিয়ে যাও তো?

একি! সব চুপচাপ—কোন সাড়া নেই কেন ঘরের ভেতরে। কেমন সন্দেহ হলো আমার। টপ. করে তাই উঠে পড়লুম বৌদির ঘরে যাবো বলে। কিন্তু দরজায় সামনে পা দিয়েই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, মিঃ বোস শীগ্‌গির আসুন, বৌদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন ঘরের মেঝেয়। একি, তাঁর খাবার থালা গেলাসগুলো সব কোথায় গেলো? তাইতো!······বলে একবার ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম বাগানের দিকে, পাথরের মূর্তিটাসেখানে আছে কিনা দেখবো বলে। মিঃ বোস তখন বৌদির মুখচোখে জল দিয়ে পাখার হাওয়া করতে বসলেন।

লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত জ্যোৎস্নায় সমস্ত বাগানটা ভরে গেছে সেই চাতালটার কাছে যেতেই আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আতঙ্কে খাড়া হয়ে উঠল। একি! সেই পাথরের মূর্তিটা

তো নেই! কোথায় গেলো সেটা! তবে রাঁধুনিটা যা বলছিলো সব সত্যি! সত্যিই কি ভূত আছে? আর যেন ভাবতে পারলুম না। হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। কোন রকমে ঘরে এসে যখন পৌঁছলুম, দেখি, বৌদির চৈতন্য ফিরে এসেছে, আর মিঃ বোস তাকে জিগ্যেস করছেন, কি হয়েছিল তোমার?

বৌদি বলছিলেন, কি হয়েছিল মনে নেই তবে একটা সাহেবের বিরাট ছায়ামূর্তি এসে আমার খাবারের সামনে দাঁড়িয়েছিলো, এইটুকু মনে আছে শুধু।

মিঃ বোস বললেন, ধ্যেৎ, ও তোমার মনের ভুল।

আমি তখন বললুম, না ভুল নয়, সত্যি। সে মূর্তিটা ওখানে নেই, এই মাত্র আমি দেখে এসেছি।

কি বলছো তুমি বাজে কথা।···বলে বড়ো বড়ো চোখ তুলে মিঃ বোস আমার দিকে তাকাতে, আমি বললুম বিশ্বাস না হয়তো চলুন হাতে হাতে যদি প্রমাণ চান।

মিঃ বোস ও বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে আমি তখনি সেখানে গেলুম। আরে একি! ওইতো রয়েছে সেই পাথরের মূর্তিটা। ঠিক সেই জায়গায়, সেই অবস্থায়।

মিঃ বোস বললেন, তোমরা দুজনেই সেই রাঁধুনীর কথা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, তাই ভূত দেখেছো!

আমি বললুম তাহলে খাবারগুলো কোথায় গেলো? কোথায় গেলো সেই থালা গেলাস?

তাইতো বলে মিঃ বোস এবার চিন্তা করতে লাগলেন।

পরের দিন সকালে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেলো সেই খাবারের থালা-গেলাস নিচের একটা গুদাম ঘরে ভাঙাচোরা আরো অনেক জিনিস পত্রের মধ্যে পুরনো ময়লা একটা মেহগনির টেবিলের ওপর রয়েছে। আর সেই টেবিলটার এক কোণে অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা মিঃ রাইটের নাম।

সুমথনাথ ঘোষ

বাংলা সাহিত্যে সুমথনাথ ঘোষ স্বকীয়তায় বিশেষ উজ্জ্বল। গতানুগতিক তার বহমান স্রোতে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি। তাঁর রচনার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়ভাবে সুস্পষ্ট। বাংলার চিরন্তন মানব-জীবনের সুখ-দুঃখের কথা তো তাঁর সাহিত্যে অবশ্যই আছে, তা ছাড়াও তাঁর রচনায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভৌগোলিক পরিচয়ও বিধৃত। সুমথনাথের ভাষাও অত্যন্ত সহজ অথচ ঋজু। সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় তাঁর রচনা একটু স্বতন্ত্র মেজাজের। তিনি এ-পর্যন্ত অসংখ্য গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় মূলতঃ মানব-মানবীর সহজাত অন্তর্বেদনা অত্যন্ত গাঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট। পাঠকের কাছে তাই তাঁর রচনার আবেদন কখনো মলিন হয়না। গল্প বলবার ভঙ্গিটিও তাঁর একান্ত নিজস্ব। ভৌতিক কাহিনী রচনায়ও তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পে মানুষের মনের অবচেতনায় সুপ্ত রহস্য নিগূঢ়ভাবে উদঘাটিত। সংকলনের গল্পটি সুমথনাথের 'মরণের পরে' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। সুমথনাথ ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণ কলিকাতা নিবাসী এই লেখক আজও সতেজ ও সক্রিয়।



ভূত নেই

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

আমি তোমাদের আগেও বলেছি এখনও বলছি ভূত আর ভগবান নিয়ে তর্কের আজও শেষ হয়নি। যতদিন মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা থাকবে, ততদিন শেষও হবে না।

এ বিষয়ে পৃথিবীব বিদ্বান এবং সাধাবণ লোক দুটো মত পোষণ করেন। কেউ বলেন, বিজ্ঞান ভূতের অস্তিত্ব মানে না, কিন্তু বিজ্ঞানই কি শেষ কথা? আমাদের সব প্রশ্নের উত্তব বিজ্ঞান দিতে পারে? আবার কেউ বলেন ভূত নিশ্চয় আছে।

এমন ঘটনা তোমার মধ্যে অনেকেই শুনেছ কিংবা দেখেছ: খ্যাতনামা ডাক্তারেরা যে মুমূর্ষু বোগীকে দিনের পর দিন চিকিৎসা করেও সারাতে পারে না, এক সামান্য ফকির রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে কিংবা তার মাথায় একটা রুদ্রাক্ষ ছুঁইয়ে তাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলেছে।

এতে বোঝা যায় আমাদের লৌকিক জগতের বাইরে আর একটা জগৎ আছে যেটা ঠিক বিজ্ঞানের নিয়মে চলে না।

তোমরা পরজন্ম সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছ। সংবাদপত্রেও নিশ্চয় পড়েছ জাতিস্মর নিয়ে দিন রাত আলোচনা হচ্ছে।

সুদূর রাজস্থানের মরুর মধ্য দিয়ে উটের পিঠে চেপে বাপের সঙ্গে ছোট সাত বছরের ছেলে চলেছে। হঠাৎ একটা গ্রামের কাছে এসে একটা কুটিরের দিকে হাত দেখিয়ে ছেলে বাপকে বলল—

ওই দেখ বাবা ওই আমার বাড়ি। ওখানে আমার আত্মীয় স্বজন সবাই আছে।

বাবা প্রথমে কড়া ধমক দিল ছেলেকে, কিন্তু তাকে নিরস্ত করা গেল না, তার মুখে এক কথা।

ওখানে আমাব বুড়ো বাপ বয়েছে, বউ চন্দ্রা বয়েছে, ছোট ভাই এক ভোব বেলা পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে কুয়াব মধ্যে ফেলে দেয়। তুমি চলই না ওখানে।

কৌতূহলেব বশবর্তী হয়ে বাপ সেই কুটীবের সামনে গেল, দাওয়াব ওপর এক বৃদ্ধ বসে হাঁপাচ্ছে, একটি বউ জল তুলছে কুয়া থেকে।

ছেলেটি উট থেকে নেমে হন হন করে বৃদ্ধের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বাবা আমি কেশোপ্রসাদ। তোমার বড় ছেলে। দু'চোখের উপর কোঁচকানো মাংসের স্তর নেমেছে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ।

বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়ে দেখে বলল।

দিল্লোগি করতে এসেছ? আমার ছেলে আজ আট বছর মারা গেছে, ভোব বেলা কুয়া থেকে জল তুলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল কুয়ার মধ্যে।

ছেলেটি বলল—

না, পা পিছলে পড়ে যায় নি, মাধোপ্রসাদ তাকে ঠেলে দিয়েছিল। তার মতলব ছিল আমি না থাকলে বাজরার খেত, বাড়িঘর সবই সে পাবে। যে বউটা জল তুলছিল, সে ছেলেটির কথায় আকৃষ্ট হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

তার দিকে চোখ পড়তেই ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল।

আবে চন্দ্রা, আমি কেশোপ্রসাদ তোমাব মরদ।

চন্দ্রার বয়স বছব ত্রিশেব কম নয়। সে সাত বছবের স্বামীকে দেখে হেসে ফেলল, চোখের কোণে একটু জল দেখা গেল।

বলল, পাগল কোথাকার।

ছেলেটির বর্তমান বাপ একটু পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে

এগিয়ে এসে বলল, কি ঝামেলা করছিস? দেরি হয়ে যাচ্ছে চল।

ছেলেটি যাবার কোন লক্ষণই দেখাল না, দাওয়ার ওপর বসে পড়ে বলতে লাগল।

কোন্ ঘরে সে শুত, সে ঘরে কি আসবার আছে, বাজরার খেতের পরিমাণ কত, বাপেব ত্বার সাংঘাতিক অসুখ করেছিল, বিকানীর থেকে সে-ই হেকিম নিয়ে এসেছিল।

আরো অনেক কথা সে বলল। সে কোন গাঁয়ে বিয়ে করেছিল। চন্দ্রার বাপের নাম কি। এমন কি বিয়ে করে বউকে নিয়ে যখন ফিরছিল, তখন মাঝপথে তুমুল বালির ঝড় উঠেছিল। সে আর চন্দ্রা সারা দেহ আবৃত করে উটের পেটের নীচে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের বাঁচিয়েছিল।

চন্দ্রা আর চন্দ্রার শ্বশুর তো অবাক্।

সাতবছরের ছেলে এত সব কথা জানল কি করে?

এবার ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল—

মাধোপ্রসাদ তো আর নেই?

না, তাকে খেতের মধ্যে সাপের কামড়েছে। তুই যাবার এক বছরের মধ্যেই।

ছেলেটি যাবার মুখেই বাধা।

চন্দ্রা তাকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কান্না।

সে তাকে ছেড়ে দেবে না।

ছেলেটি বলল—

আমাদের নবজন্ম হয়েছে। নতুন আমির ওপর তোমাদের কোন দাবি নেই। আমার বাবা আছে, মা আছে দাদারা আছে। সে সংসারে আমাকে ফিরে যেতেই হবে। এই নিয়ম। ছেলেটি বাপের সঙ্গে আবার উটের পিঠে চাপল, তবে মাঝে মাঝে সে পুরানো সংসারেও আসত। এই ছেলেটি জাতিস্মর।

আগের জন্মের কথা তার সব মনে আছে।

বিজ্ঞান এব কি ব্যাখ্যা দেবে ?

খবব পেয়ে বিখ্যাত এক গবেষক ছেলেটিব কাছে গিয়েছিলেন। তাকে নানা পবীক্ষা করেছিলেন। শেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, এব মধ্যে কোন কাবচুপি নেই। ছেলেটিব সত্যিই আগের জন্মেব সব কথা মনে আছে।

এইবকম জাতিস্মবেব কাহিনী ইদানীং অনেক শোনা যায়।

শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীব অন্যান্য দেশেও।

ঠিক এমনিভাবে ভূতেব কাহিনী সাবা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

আজ তোমাদেব এমনই এক ভূতেব কাহিনী শোনাচ্ছি। এ কাহিনীর সঙ্গে আাম কিছুটা জড়িত। কাজেই এটা যে নির্ভেজাল সত্যি কাহিনী এ াবষয়ে তোমাদের কাজে আমি হলফ ক.ব বলতে পারি।

আমাব একজন খুব নিকট আত্মীয়, নাম আবতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম' এ বি' এল কিন্তু ওকালতি করে না। বেসবকারি অফিসেব আইনবিভাগর উচ্চপদস্থ অফিসার।

থাকত পাইকপাড়ায়। এক বান্ধবীব সঙ্গে একটি ফ্ল্যাট নিয়ে।

বান্ধবীটি এক স্কুলের শিক্ষিকা।

জীবন দুজনের বেশ ভালই কাটছিল। ছুটির দিন সিনেমা, কিংবা আবো অনেক বান্ধবী মিলে বনভোজন, অথবা গড়ের মাঠে প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া।

হঠাৎ আরতির বিয়ে ঠিক হলো। পাত্রও উচ্চশিক্ষিত। এক যন্ত্রপা তির কারখানাব আধা মালিক।

আরতি আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

আপনি তো অনেক কিছুর সন্ধান রাখেন। আমাকে একটা বাড়ি খুঁজে দিন।

জিজ্ঞাসা করলাম।

কি, কিনবে?

না, না, ভাড়া নেব। খুব বড় দরকার নেই। দুজনের থাকবার মতন। একটু যেন ভাল এলাকায় হয়, আর দক্ষিণ কলকাতায় দেখবেন, কারণ ওর কারখানাটা কালীঘাটে।

আমি নিজে থাকি বালীগঞ্জে একেবারে লেকের কাছে। পরদিন থেকেই বাড়ি খোঁজা শুরু করে দিলাম। শুধু নিজে নয়, গোটা দুয়েক দালালকেও লাগিয়ে দিলাম।

অনেক বাড়ির সন্ধান এল, কিছু নিজে কিছু আরতিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি দেখতে লাগালাম।

আরতি ভারি খুঁতখুঁতে মেয়ে। কোন বাড়িই তার পছন্দ হলো না। কোন না কোন কারণে সব নাকচ করে দিল।

তিন মাস ঘোরাঘুরির পর কালীঘাট অঞ্চলে এক বাড়ির সন্ধান মিলল।

পার্কের সামনে প্রায় নতুন বাড়ি। সগু রং করা হয়েছে। খান তিনেক কামরা। বারান্দা, বাথরুম আবার ওরই মধ্যে একফালি উঠানও আছে।

সেই অনুপাতে ভাড়াও খুব বেশী নয়। দুশো কুড়ি। বাড়ির মালিক পাশের বাড়িতেই থাকেন।

এ বাড়ি আরতির পছন্দ হয়ে গেল।

শুধু আরতির নয়, আরতির স্বামী আশিসেরও।

আর দেরি না করে সেদিনই 'দু' মাসের ভাড়া আগাম দেওয়া হলো।

মাসখানেক পর আরতির বাসায় বেড়াতে গিয়ে খুব ভাল লাগল।

নতুন আসবাবপত্র দিয়ে চমৎকার সাজিয়েছে। উঠানের পাশে সারি সারি টব।

দেশি ফুল বেল, জুঁই যেমন আছে, তেমনি বিদেশী ফুল ডালিয়া, পপি, হলিহকও রয়েছে।

এমন বাসা খুঁজে দেবার জন্য আরতি-আশিস দুজনেই আমাকে বারবার ধন্যবাদ দিল।

এরপর অনেকদিন আরতির সঙ্গে দেখা হয়নি।

অফিসের কাজে দিল্লি যেতে হয়েছিল সেখানে মাস তিনেক কাটিয়ে কানপুর। সেখানেও একমাসের ওপর লেগে গেল। কলকাতা ফিরলাম প্রায় পাঁচমাস পর।

এক ছুটির দিনে বন্ধুবান্ধব দিয়ে গল্প করছি আরতি এসে ঢুকল।

প্রথম নজরেই মনে হলো চেহারা একটু যেন ম্লান। আরতি ভিতরে চলে গেল—

বন্ধুরা বিদায় হতে আমিও ভিতরে গেলাম।

দেখলাম, আরতি চুপচাপ সোফার ওপর বসে আছে। আমাকে দেখে বলল—

আপনার সঙ্গে কথা আছে।

কি বল? শরীর খারাপ নাকি। চেহারাটা কেমন দেখাচ্ছে। আরতি মুখ তুলে বলল—

রাত্রে একেবারে ঘুম হচ্ছে না।

সে কি। ডাক্তার দেখাও, নইলে শক্ত অসুখে পড়ে যাবে।

—ডাক্তার কিছু করতে পারবে না।

তার মানে?

মানে বাড়িটা ভাল নয়।

সে কি, স্যাঁৎস্যাতে বা অন্ধকার এমন তো নয়। রোদ বাতাস প্রচুর।

সে সব কিছু নয় অন্য ভয় আছে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আবতি কিছুক্ষন কি ভাবল, তারপর আস্তে আস্তে বলল ও বাড়িতে আমরা তুজন ছাড়াও অন্য একজন আছে।

অন্য একজন আছে ?

হঁ্যা তাকে মাঝে মাঝে গভীব বাতে দেখা যায়। অন্য লোক হলে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিত। শুনতেই চাইত না।

কিন্তু আমি মৃত্যুব পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আমার স্থির ধারনা, যাবা অতৃপ্ত কামনা বাসনা নিয়ে এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় তাবা আবাব ফিরে আসে। কখনও বাযবীয় মূর্তি কখনও মানুষের রূপ ধরে ফেলে যাওয়া সংসারেব মাঝখানে ঘুরে বেড়ায়।

কি ব্যাপার খুলে বল তো।

বলছি।

আবতি কোলের ওপর বাখা ভ্যানিটি ব্যাগটা পাশে নামিয়ে রাখল সহজ হয়ে বসে বলতে লাগল।

মাস তুয়েক আগে হঠাৎ খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। মনে হলো বাইরের ঘরে যেন কার পায়ের আওয়াজ। আশিস পাশেই শুয়েছিল। তার ঘুমের বহর তো জানোই। বুকের ওপর দিয়ে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য চলে গেলেও তার ঘুম ভাঙবে না।

কাজেই তাকে ডাকার চেষ্টা না করে নিজেই উঠে পড়লাম। ভীতু এ বদনাম কেউ দিতে পারবে না। বরং সবাই জানে আমি রীতিমত সাহসী।

প্রথমে জানালা দিয়ে দেখলাম। কিছু দেখা গেলনা কিন্তু খুটখাট শব্দ ঠিক চলতে লাগল।

মনে হলো, খড়ম পায়ে দিয়ে কে যেন পায়চারি করছে।

অথচ কোন লোককে দেখা গেলনা।

রাতের মাংস রান্না হয়েছিল। হাড়ের টুকরো রান্নাঘরে প্লেটের ওপর পড়েছিল, খুব সম্ভবতঃ ইঁদুর সেই হাড়ের টুকরো বাইরের ঘরে নিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

তখনই ঘুম এল না। একবার ঘুম ভেঙে গেলে চট করে ঘুম আমার আসে না। এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। পাশের লোকটি অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে। নাক দিয়ে বিচিত্র ধ্বনি বের হচ্ছে।

ঘরে হালকা সবুজ রঙের একটা বাতি জ্বলছিল। অন্ধকারে আমি ঘুমাতে পারি না। এ আমার ছেলেবেলার অভ্যাস।

হঠাৎ দেখলাম, দীর্ঘ একটা ছায়া আলোক আড়াল করে এ ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেল।

চমকে উঠে বসলাম।

আশিসকে ডেকে বললাম।

এই ওঠ, ওঠ ঘরের মধ্যে কে ঢুকেছে।

আশ্চর্য মানুষ। চোখ খুলল না।

পাশ ফিরতে ফিরতে বলল—

ফ্লিট দিয়ে দাও।

ছায়াটা সরে সরে বাইরের দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল। আর দেখা গেল না।

আমি তখন বিছানার ওপর উঠে বসেছি।

মনকে বোঝালাম এ শুধু চোখের ভুল, তা না হলে ছায়া দেখা গেল অথচ মানুষটাকে দেখা গেল না, তা কি হতে পারে।

ভূতের কথা ভাবতেও পারিনি, কারণ ভূত আছে এমন অদ্ভুত কথা আমি কোনদিন বিশ্বাস করি না। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে আরতির কথা শুনছিলাম।

এবার বললাম—তারপর ?

তারপর দিন কুড়ি সব স্বাভাবিক, কোন গোলমাল নেই। সে রাতে ভয় পেয়েছিলাম ভেবেই হাসি পেত। একেবারে ছেলেমানুষি কাণ্ড।

আশিস কারখানার কাজে দিন চারেকের জন্য জামসেদপুর গিয়েছিল। বাড়িতে আমি একলা। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

এবারে একেবারে স্পষ্ট দেখলাম।

দীর্ঘ একাহারা চেহারা। খালি গা। কাঁধের ওপর ধবধবে সাদা উপবীত। কোঁচাটা ভাঁজ করে সামনে গোঁজা।

মাথায় পাকা চুল। দুটি চোখ জবাফুলের মতো লাল। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ির মধ্যে দিয়ে উঁচু চোয়াল দেখা যাচ্ছে।

লোকটির ঊর্ধ্বদৃষ্টি। হাতে শক্ত একটা দড়ি। ওপর দিকে কি যেন খুঁজছে।

সেই মুহূর্তে শরীরের সব রক্ত জমে হিম শীতল হয়ে গেল। দুহাতে বুকটা চেপে ধরেও দ্রুত স্পন্দন কমাতে পারলাম না। মনে হলো, তখনই হার্টফেল করব।

বিকৃত কণ্ঠে বললাম—কে কে ওখানে ?

লোকটি ওপর থেকে দৃষ্টি নামিয়ে আমার দিকে দেখল।

জ্বলন্ত দৃষ্টি—পলকহীন।

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তখনই মনে হলো ,লোকটা এ জগতের কেউ নয়, অশরীরী আত্মা।

আস্তে আস্তে লোকটা পাশের ঘরে ঢুকে গেল, আমি খাট থেকে নামলাম, কিন্তু তার পিছনে যাবার সাহস হ'ল না।

এই কথাগুলো বলবার সময়ে দেখলাম আরতির মুখচোখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

আমি বললাম—এরকম যখন ব্যাপার, তখন না হয় এবাড়ি ছেড়ে দাও।

অন্য কোথাও বাড়ি খুঁজি।

আরতি উত্তর দিল—

তাতেও তো মুশকিল, আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি বাড়ির দেয়াল ভেঙেচুরে আমি দুটো ঘর বাড়িয়েছি। বাইরেটা চুনকাম করেছি, ভিতরে রং দিয়েছি। গ্যাস বসাবার জন্য রান্নাঘরেরও অনেক অদল বদল করেছি। অবশ্য এসব বাড়িওয়ালার মত নিয়েই করেছি। ভাড়া থেকে মাসে মাসে কিছু করে টাকা কেটে রাখছি। সে টাকা শোধ হতে বছর দুয়েক লাগবে। তার আগে বাড়ি ছেড়ে দিলে আমার অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে।

একটু ভেবে আমি বললাম—

ঠিক আছে আমি একবার তোমার বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করব। তিনি কি বলেন শুনি।

দিন দুয়েকের মধ্যেই বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, বিপুকায়। কলকাতায় কিছু বাড়ি আছে, কাঠের ব্যবসা।

একটা ইজিচেয়ারে বসেছিল। আমাকে দেখে ওঠবার চেষ্টা করল পারল না।

কি খবর? আমার কাছে হঠাৎ?

আরতির কাছে শোনা সব কিছু বললাম। শেষকালে জিজ্ঞাসা করলাম, ঠিক করে বলুন তো? ও বাড়িটার কোন দোষ আছে?

দোষ মানে?

মানে, কেউ ও বাড়িতে অপঘাতে মারা গিয়েছিল। আগের কোন ভাড়াটে?

বাড়িওয়ালা মাথা নাড়ল।

না মশায়, এর আগে মাত্র দুঘর ভাড়াটে ছিল। অপঘাতে তো দূরের কথা, এমনিই মৃত্যু কারো হয়নি। তাছাড়া এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যখন পায়চারি করার জন্য চাঁদে যাচ্ছে, তখন কি সব ভূত প্রেতের কাহিনী আমদানি করেছেন।

তর্ক করলাম না। অনেক বিষয় আছে তর্ক করে বোঝান যায় না, স্থূল উদাহরণ দেওয়া যেখানে সম্ভব নয়।

চলে এলাম।

তারপর মাস দুয়েক আরতির কোন খবর নেই।

আমিও নিশ্চিন্ত। যাক অপদেবতার উপদ্রব আর নেই সব শান্ত।

কিন্তু আমার ধারনা ভুল প্রমান করে একদিন সকালে আশিস এল।

কোটরগত চোখ, বিবর্ণ মুখ, ঘোলাটে দৃষ্টি। বললাম, কি হে শরীর খারাপ নাকি? আরতি কেমন আছে।

আমার কথার উত্তর না দিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল—

একটু জল দিন।

জল শুধু খেল না, মুখে চোখেও দিল। তারপর বলল, আরতিকে টালিগঞ্জে তার দিদির বাড়ি দিয়ে এসেছি। কালিঘাটের বাড়িতে আর আমাদের থাকা চলবে না।

কেন, কি হোল?

আরতির কাছে তো কিছু কিছু শুনেছেন। আমি কিন্তু এপর্যন্ত কিছু দেখিনি। কোন শব্দও শুনিনি। সেইজন্য এতদিন আমি আরতিকে ঠাট্টা করতাম। তাছাড়া ভূত আত্মা সবে আমার কোনদিনই কোন বিশ্বাস নেই।

কাল একটা কাজে হাওড়ায় আটকে পড়েছিলাম। বাস বন্ধ, ট্যাক্সিও পাই না। কিছুটা হেঁটে তারপর ট্রামে বাড়ি পৌঁছতে প্রায় বারটা হয়ে গিয়েছিল।

আরতি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

যাক আরতিকে খাবার সাজাতে বলে আমি হাত মুখ,ধোওয়ারজন্য বাথরুমে ঢুকে পড়লাম।

নীচু হয়ে বেসিনে মুখ ধুয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মাথায় ঠক করে কি একটালাগল।

বাথরুমে আবার কে কি রাখল।

একটু কমজোর বাতি। কিন্তু সে বাতিতেও দেখতে কোন অসুবিধা হোল না।

ঠাণ্ডা একটা বরফের স্রোত আমার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল।

বাথরুমটা অ্যাসবেসটসের ছাউনি দেওয়া। আগে টালির ছাদ ছিল। আমারই খরচ করে অ্যাসবেসটস দিয়ে ছিলাম। ওপরে দুটো কাঠের বাড়ি।

একটা কড়িতে দেহটা ঝুলছে।

গলায় দড়ির ফাঁস। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়েছে। দুটো চোখ আধবোজা জিভটা অনেকখানি বের হয়ে গেছে। বোধহয় জিভের ওপর দাঁতের চাপ পড়ে'ছিল। তাই জিভ কেটে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়েছে। কিছুটা দেহের ওপর; কিছুটা মেঝেতে।

পরনে আধময়লা ধুতি, কাঁধে পৈতে।

মাথা উঁচু করবার সময় ঝুলন্ত দেহের পা আমার মাথায় ঠেকে গিয়েছিল। আমি সব কিছু ভুলে আরতি বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

আরতি আমার অপেক্ষায় খাবার টেবিলে বসেছিল।

আমার চিৎকারে ছুটে এসে বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

প্রথমে সে ঠিক বুঝতে পারেনি!

তারপর ওপর দিকে চোখ যেতেই 'ও মাগো' বলে মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে অজ্ঞান।

আরতির মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে কোনরকমে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম।

তারপর বাকি রাতটা দুজনে বাইরের ঘরে বসে কাটালাম। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ট্রামে উঠে আরতিকে নিয়ে যখন তার দিদির বাড়ি এলাম, তখন জ্বরে আরতির গা পুড়ে যাচ্ছে দুটো চোখ করমচার মতন লাল।

আমি চুপ করে সব শুনলাম।

আশিসের কথা শেষ হতে জিজ্ঞাসা করলাম, আরতি এখন কেমন আছে?

খুব ভাল নয়। বিকারের ঘোরে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে, ওই লোকটা, ওই লোকটাই তো ঘুরে বেড়াচ্ছিল দড়ি হাতে। আমি এখানে থাকব না। আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চল।

অবশ্য আরতির জন্য খুব চিন্তা নেই। ভয়টা কেটে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সব কিছু নিজের চোখে দেখবার দারুণ ইচ্ছা হলো।

এমন তো নয়, এক সময় দরজা খোলা পেয়ে বাইরের কোন লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে আত্মহত্যা করেছে?

সে হয়তো আত্মহত্যা করবার নির্জন একটা জায়গা খুঁজছিল।

তাই আশিসকে বললাম—

চল একবার নিজের চোখে দেখে আসি। তাছাড়া তোমরা ব্যাপারটাকে ভৌতিক ভাবছ, তাতো নাও হতে পারে। পুলিসে খবর দেওয়াও তোমাদের একটা কর্তব্য। তারা এসে মৃতদেহের ভার নেবে।

আশিস আমার সঙ্গে চলল।

তালা খুলে ভিতরে ঢুকলাম।

বাথরুমের মধ্যে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। কোথাও কিছু নেই সব পরিস্কার।

আশিসকে জিজ্ঞাসা করলাম—

কই হে ? কোথায় তোমার ঝুলন্ত দেহ ? রক্তের একটি ফোঁটাও তো কোথাও দেখছি না।

আশিস রীতিমত অপ্রস্তুত।

সব চোখের ভুল, বুঝলে ?

আশিস মাথা নাড়ল।

কিন্তু দু'জনেই ভুল দেখলাম ?

ওরকম হয়। একজনের ভয় আর একজনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাকেও এক ধরনের কাল্পনিক দৃশ্য দেখায়। তুমিই দেখ না কাল রাতে তুমি যদি সত্যিই ওরকম একটা দৃশ্য দেখে থাক, তাহলে আজ কোথাও কিছু নেই, তা কি হতে পারে? এইখানটাই তো দেখেছিলে।

মুখ তুলে ওপরের দিকে দেখেই আমি থেমে গেলাম ?

কি আশ্চর্য, এটা তো আগে দেখিনি। কড়ির সঙ্গে একটা মোটা দড়ি বাঁধা। দড়িটা ফাঁসের আকারে ঝুলছে।

অস্বীকার করব না, আমার হাত পা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বুকের দাপাদাপি এত জোরে যে ভয় হলো, স্পন্দন থেমে না যায়। এ দড়ির ফাঁস তো প্রথমবার দেখিনি। আরও অবাক কাণ্ড দড়ির ফাঁসটা অল্প অল্প দুলছে, অথচ কোথাও বাতাস নেই।

বাইরে বাতাস থাকলেও বাথরুমে বাতাস ঢোকবার কোন সুযোগই নেই।

আশিসের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

এটা যে ভৌতিক ব্যাপার নয়, কোন মানুষের কারসাজি তা হওয়াও সম্ভব নয়। কোন যুক্তিতর্ক বিস্তার করেও সমাধান করতে পারলাম না।

আরতিরা আরও বাড়িতে ফিরে যায় নি। ভবানীপুরে একটা বাড়ি ঠিক করে উঠে গিয়েছিল। আর্থিক লোকসান সত্ত্বেও।

এ ঘটনার প্রায় মাস তিনেক পর এক বিকেলে কালিঘাট পার্ক দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ আরতির বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বেঞ্চে বসে আছে।

আমি তার পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম—মশাই, সত্যি কথা বলুন তো। বাড়িটার কি রহস্য? আমার আত্মীয়াটি তো থাকতে পারল না, পালাল।

প্রথমে কিছুতেই বলবে না। অবশেষে আমার পীড়াপীড়িতে বলল।

এক বুড়ো ভদ্রলোক ওই বাড়িতে আত্মহত্যা করেছিল। তা প্রায় বছর দশেক আগে। পেটে শূল বেদনা ছিল। বাড়ির সবাই নিমন্ত্রণ খেতে বাইরে গিয়েছিল, তখন বাথরুমে বুড়ো গলায় দড়ি দেয়। তারপর থেকে ভাড়াটে আসে, তারাই ভয় পায়। বেশীদিন থাকতে পারে না।

আমি বললাম—

গয়ায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করেননি কেন।

করার চেষ্টা করেছি মশাই। অনেকবার করেছি। প্রত্যেকবার এক-একটা বিপদ। বুড়োর আত্মীয়রা গয়া গিয়েছিল পিণ্ড দিতে, তিনদিন ধরে দারুণ ঝড় বৃষ্টি। ধর্মশালা থেকে বের হতেই পারল না।

আমি নিজে একবার গিয়েছিলাম। ট্রেন থেকে স্টেশনে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে একমাস হাসপাতালে শয্যাগত।

পুরোহিত দিয়ে শান্তি স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করার চেষ্টা করেছিলাম। সেখানেও বিপত্তি।

পুরোহিত আসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ছাদ ভেঙ্গে একটা ছাঙড় তার মাথায় পড়ল। পুরোহিত জ্ঞান হারিয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

ব্যাস, তারপর থেকে আর কোন পুরোহিত আসতে রাজী হলো না। কি করি বলুন তো?

সে উত্তর জানা ছিল না। কাজেই সেদিন বাড়িওয়ালার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিনি। একটা কথা শুধু মনে হয়েছে। পৃথিবীর সব অবিশ্বাসী মানুষদের জড় করে চিৎকার করে বলি, যাঁরা মনে করেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়, প্রেতযোনি বলে কিছু নেই, তাঁরা কালীঘাট অঞ্চলের এই বাড়িটায় রাত কাটিয়ে যান। বাড়িটা এখনও খালি।

ঠিকানা আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন অবশ্য আমি ভাল মন্দ হয়ে গেলে কোন কিছুর জন্য দায়ী থাকব না। এই মর্মে আমাকে একটা লিখিত চুক্তি পত্র দিতে হবে।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ২৩ শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন স্কুল ও কলেজ জীবন বর্মাদেশে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কল্লোল যুগের অব্যবহিত পরবর্তী সময়েই বাংলাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর রচনায় শরৎচন্দ্রের মতো ব্রহ্মদেশের পটভূমি বার বার ঘুরে এসেছে। তিনি সেখানে দীর্ঘদিন প্রবাসী ছিলেন। লেখক অত্যন্ত বৈঠকী ভঙ্গীতে গল্প-উপন্যাস রচনা করেন। সাধারণ সহজ বাক্য-বিন্যাসে তাঁর লেখাগুলি এগিয়ে যায়। মূলতঃ তাঁর রচনাগুলি চরিত্রভিত্তিক। ঘটনার ঘনঘটাও সেজন্য কম কিছু থাকে না তাঁর রচনায়। অজস্র বাঙালী চরিত্রের সহজ রূপায়ণ তাঁর সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। হরিনারায়ণের প্রথম উপন্যাস 'ইরাবতী'একটি অসাধারণ সৃষ্টি। এপর্যন্ত তিনি অজস্র উপন্যাস ও গল্প রচনা করেছেন। অলৌকিক গল্প রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। 'ভূত নেই' গল্পটি লেখকের স্বনির্ব্বাচনের গৌরবে ভূষিত হয়ে এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গল্পটি ভৌতিক গল্পের এক অনাবদ্য সংযোজন হিসাবে গণ্য। তিনি ১৯১৬ সালে মতিলাল পুরস্কার ও ১৯১৬সালে তারাশঙ্কর পুরস্কার লাভ করেন।

সাহিত্যে ভৌগোলিক পরিধি বিস্তার করা একটি বড়ো গুণ। হরিনারায়ণ বাংলা সাহিত্যে দেশ-কাল পাত্রের সীমানা যথেষ্ট বাড়িয়েছেন। ব্যাক্তগত জীবনে মেধাবী ছাত্র এবং বিরল স্বভাবের অধিকারী এই লেখক রচিত সাহিত্যে ও সেই প্রবণতা সঞ্চার করেছেন। বিচিত্র চরিত্রের মানুষ তাঁর সাহিত্যেউপস্থাপিত। বংলার নিজস্ব মাটি এবং আবহাওয়ায় লালিত মানুষও যেমন তাঁর রচনায় আছে,তেমন রয়েছে অজস্র অবাঙালীর চরিত্র গল্পের গল্পত্ব তাঁর রচনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনেক বিশিষ্ট সমবয়সী লেখকদের মধ্যেও হরিনারায়ন স্বতন্ত্রধারার পরিচায়ক। আদিবাসী মানুষও তাঁর রচনা থেকে বাদ পড়ে নি। মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিয়েই তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য জীবন-কথা।



সহচর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গী ভদ্রলোক হঠাৎ আবিষ্কার করলেন সামনের একখানা ছয়-বার্থের সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ করেছেন তাঁরই পরিচিত একদল এবং তাদের বার্থ খালি যাচ্ছে একখানা। খবরটা সংগ্রহ হতে না হতে হৈ হৈ করে তিনি মালপত্র টেনে নামালেন। যাওয়ার সময় এক গাল হেসে বলে গেলেন, "ভালোই হল মশাই আপনার। এখন আপনি একচ্ছত্র। বেশ সম্রাটের মতো ঘুমিয়ে যেতে পারবেন।"

'সম্রাট' 'একচ্ছত্র'—এ-সব ভালো কথা শোনবার আগেই আমি অনুমান করেছিলুম, বাইরের কার্ডে যাঁর নাম ছিল, তিনি এ কালের একজন দিক্‌পাল্‌ সাহিত্যিক। আমি তাঁকে অবশ্য কখনও দেখিনি; কিন্তু তাঁর ছবির সঙ্গে এ ভদ্রলোকের চেহারারও সাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট। তাই একখানা 'কুপে'তে ওপরের বার্থে এমন একজন ভয়ঙ্কর বিখ্যাত সঙ্গীকে নিয়ে ট্রেন যাত্রার কল্পনায় রাত্তিরভো শঙ্কিত ছিলুম আমি।

সাহিত্য এবং সাহিত্যিক—দুটোকেই আমি নিদারুণ ভয় করি। আমি কাজ করি স্ট্যাটিসটিক্সে এবং এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই সংখ্যাতত্ত্বের কাছে রসতত্ত্বের স্বাদ অত্যন্ত জোলো বলে মনে হয় আমার কাছে। সারা ভারতবর্ষে বছরে কোন্ ভাষার কত বই ছাপা হয় তার হিসেব মোটামুটি একটা দিতে পারি, কিন্তু ঊর্ধ্বলোকেবিহারী সাহিত্যিক মহারথটি যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন তাঁর কী কী বই আমি পড়েছি—তাহ'লেই গেছি। মানসাঙ্কে ফেল করা ছাত্রের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া নান্যোব গতিবন্যথাঃ

কাজেই তিনি নেমে যেতে বেশ খানিকটা স্বস্তিই অনুভব করলুম—সন্দেহ কী। বেশ করে নিজের মতো বিছানা পেতে নিলুম—গুছিয়ে নিলুম জিনিষপত্র। তারপর আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে মুখাগ্নি করলুম সিগারেটে।

হাওড়া থেকে যখন ট্রেনটা ছাড়ল—সেই স্বস্তির আমেজে তখনও ভরপুর হয়ে আছি। পর পর উল্কাবেগে যখন কয়েকটা স্টেশন ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল, তখনও। কিন্তু আলো নিভিয়ে শোওয়ার উপক্রম করতেই কি রকম একটা অদ্ভুত অশান্তি আমাকে পেয়ে বসল।

হঠাৎ মনে হতে লাগল, আমি একা। শুধু এই ছোট কামরাটুকুর ভেতরেই নয়—এই বিরাট ট্রেনটাতে আমি একা ছাড়া আর কোথাও কোন যাত্রীই নেই। একটা অতিকায় ভূতুড়ে গাড়ী আমাকে নিয়ে একরাশ অজানা অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোথায় যাচ্ছে আমি জানি না, হয়তো গাড়ীটারও সে-কথা জানা নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি উঠে বসলুম আলো জেলে দিলুম। আর তীক্ষ্ণ তীব্র আলোর একটা ঝাপটা চোখে এসে লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই অস্বস্তির ঘোরটা কেটে গেল। সত্যি কথা বলতে গেলে স্বস্তিই পেলা

আমার। সাহিত্যিকের সঙ্গগুণ আছে বটে। ভদ্রলোক আমার সহযাত্রী না হতেই তাঁর ব্যাধি এসে আমাকে ছুঁয়েছে—সঙ্গে থাকলে আর রক্ষা ছিল না দেখা যাচ্ছে। কী করে যে এসব উদ্ভট কল্পনা মাথায় এল—আশ্চর্য্য!

একগ্লাস জল খেয়ে, একটা আলো জেলে রেখে শুয়ে পড়লুম আবার।

কিন্তু চোখের কাছে আলো জ্বললে আমার কিছুতেই ঘুম আসে না। বিরক্ত হয়ে আমি এপাশ ওপাশ করতে লাগলুম। অথচ আলো নিবিয়ে দিতেও সাহস হচ্ছে না—পাছে আবার ওই সমস্ত এলোমেলো ভূতুড়ে ভাবনা আমাকে পেয়ে বসে। চোখের পাতা দুটোকে যথাসাধ্য চেপে ধরে প্রাণপণ ঘুমের সাধনা শুরু করলুম।

সেও মাত্র কিছুক্ষনের জন্যে। তার পরেই একটা নতুন ভাবনা আমাকে পেয়ে বসল। বড় বেশী জোরে যাচ্ছে নাকি গাড়ীটা—বড় বেশী অস্বাভাবিক স্পীডে? যতগুলো রেলওয়ে অ্যাকৃসিডেণ্টের খবর জানি একটার পর একটা মনে পড়ে যেতে লাগল সেসব। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অন্ধের মতো ছুটছে ট্রেনটা—পার হয়ে যাচ্ছে ঘুমন্ত গ্রাম, শূন্য প্রান্তর, কালো জঙ্গল, নদীর পুল। এই নির্জন নিশীথ যাত্রা যেন ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কে বলতে পারে কোথায় আলগা হয়ে আছে একটা ফিস প্লেট, কোথায় ব্রীজের পিলারে ধরেছে ফাটল। মুহূর্তের ভেতরে লাইন থেকে ছিট্‌কে পড়ে যেতে পারে ট্রেনটা, তারপর—

আবার আমি নিজের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠলুম। কি আশ্চর্য—কেন এ সমস্ত অবান্তর অর্থহীন ভাবনা আমার! প্রতিদিন, প্রতিরাত এমনি অসংখ্য ট্রেন সারা ভারতবর্ষময় ছুটে বেড়াচ্ছে, তাদের ক'খানাতে অ্যাকৃসিডেণ্ট হয়? দুর্ঘটনা ঘটনার ভয় আমার যত বেশী। তার চাইতেও অনেক বেশী রেল কেম্পানীর—এই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের। কম করেও তিনচারশো মানুষের প্রাণের

দায়িত্ব যাদের হাতে, এ সব ভাবনা আমার চাইতে ঢের বেশীই ভাবছে তারা।

আমি আবার উঠে পড়লুম। 'টয়লেটে' ঢুকে মাথায় চোখে ঠাণ্ডা জল দিলুম খানিকটা। একা গাড়িতে এভাবে চলবার অভিজ্ঞতা জীবনে আমার প্রথম নয়—যাব জন্যে এই সমস্ত ছেলেমানুষী দুশ্চিন্তা আমাকে পেয়ে বসবে। কোনো কারণে মাথা গরম হয়ে গেছে, তাই এই কাণ্ড!

দুটো পাখারই রেগুলেটার পুরো ঠেলে দিয়ে গাড়ি অন্ধকার করে আবার শুয়ে পড়লুম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই অদ্ভুত ভয়টা যেন বুকের ওপরে এসে চেপে বসতে লাগল। মনে হতে লাগল, কোথায় কী যেন ঘটতে চলেছে—কী একটা নিশ্চয় ঘটবে! আজ হোক কাল হোক—এই গাড়িতে হোক আর পরে হোক। আরো মনে হতে লাগল, এই গাড়িতে এখন আর আমি একা নেই, আমার সঙ্গে আর কেউ—অথবা আর কিছু একটা চলেছে। আমার এই বার্থ টার নীচেই সে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। একবার মাথা নামিয়ে নীচের দিকে তাকাতেই আরো দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আমি দেখতে পাবো।

কিন্তু এইবারে আমি নিজের ওপরে চটে উঠলুম। পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি আমি! কোন কারণ নেই—কোন অর্থ নেই, তবু পৃথিবীর যত অবাস্তব উদ্ভট কল্পনা আমাকে পেয়ে বসেছে! হালে কতকগুলি বিলিতী ভূতের গল্প পড়েছিলুম, হয়তো তারই প্রতিক্রিয়া এ সব।

এই অদ্ভুত অস্বস্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে এবার আমি মনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলুম দস্তুরমতো। প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করলুম সংখ্যাতত্ত্বের কতকগুলি জটিল সমস্যা—যা ভেড়া গোণবার চাইতেইও কার্যকরী। তারপর প্রায় আরো এক ঘণ্টা পরে—গাড়ি খড়গপুর ছাড়িয়ে গেলে, আমার চোখে ঘুম নেমে এল।

কিন্তু কে জানত—জেগে থাকার চাইতেও আরও বীভৎস হয়ে উঠবে ঘুমটা! মনের সমস্ত সরীসৃপ ভাবনা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ঘুমের ভেতরে! আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলুম।

অদ্ভুত কুৎসিত সে স্বপ্ন! পরিষ্কার দেখলুম একটা ন্যাড়া নগ্ন পাহাড় আমার সামনে। তার কোথাও একটা গাছপালা নেই—এক গুচ্ছ ঘাস পর্যন্তও নয়। কলকাতার চিড়িয়াখানার অতিকায় কচ্ছপগুলোর মতো বড়ো বড়ো পাথরে ছেয়ে আছে তার সর্বাঙ্গ। চারিদিকে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। শুধু পাহাড়টার মাথার ওপরে পড়ন্ত বেলার খানিক রক্ত-রৌদ্র কারো নিষ্ঠুর ভ্রূকুটির মতো জ্বলছে। আর সেখানে সেই অশুভ রাঙা আলোয় ডানা মুড়ে বসে আছে একটি মাত্র শকুন, যেন অপেক্ষা করে আছে কালপুরুষের মতো।

কিন্তু ওইখানেই শেষ নয়। আরো ছিল তারপর। আমি দেখলুম, সেই পড়ন্ত আলোয়, সেই ভয়ঙ্কর নগ্নতার ভেতরে—শকুনের সেই ক্ষুধার্ত চোখের নীচে চারজন মানুষ একটা মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে চলেছে। কোথায় চলেছে জানি না—তাদের চারজনের চোখে মুখেই একটা বিবর্ণ ক্লান্তি। আর—আর সেই শববাহকদের মধ্যে আমি একজন।

চিৎকার করে আমি জেগে উঠলুম। আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে তখন দরদর করে ঘাম পড়ছে। চলন্ত ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে বেজে উঠছে আমার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ।

আলো জ্বেলে দিয়ে উঠে বসলুম এবার! না—ঘুমোব না। যে কোনো কারণেই হোক—আমার মধ্যে কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম—রাত প্রায় তিনটের কাছাকাছি। ঐ সময়টুকু না হয় আলো জ্বেলে বসেই থাকব।

এতক্ষণে আমার মনে অনুতাপ হতে লাগল। সাহিত্যিক ভদ্রলোককে ধরেই রাখা উচিত ছিল আমার গাড়িতে।

এই দুঃস্বপ্নের চাইতে সাহিত্যচর্চাও নেহাৎ মন্দ ছিল না।

হেলান দিয়ে বসে বসে আবার সংখ্যাতত্ত্ব ভাবতে শুরু করলুম। কিন্তু এতক্ষণে সত্যিই ঘুম আমাকে পেয়ে বসেছে। বসে থাকতে থাকতে আবাব আমার চোখ জড়িয়ে এল।

এবং -

এবং একটু পরেই সেই কুৎসিত স্বপ্নটার পুনরাবৃত্তি! সেই পাহাড় —সেই পড়ন্ত রোদ —সেই শকুন! আর তেমনি একটা মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে আমরা চারজন শবযাত্রী!

এবার চিৎকার নয়— আর্তনাদ করে সোজা হয়ে বসলুম আমি। আর পাশের জানলাব জালের ভিতর দিয়ে যদি ভোরের ফিকে আভাস দেখা না যেত—তা হলে হয়তো চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দিতুম, নয় তো ঝাপিয়ে পড়তুম দরজা দিয়ে!

উঠে সমস্ত জানলাগুলো খুলে দিলুম। সূর্য ওঠে নি এখনো— বাইরের গাছপালা, মাঠ আর পাহাড়ের ওপরে শুভ্র ধূসর ব্রাহ্মমুহূর্ত। একরাশ কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে কাঁপুনি দিলে শরীরে— আমি গ্রাহ্য করলুম না। বিদেশী কবির ভাষায় শুধু আমার প্রাণভরে বলতে ইচ্ছে করছে : "Hail Holy light—"

বেলা আটটার সময় পৌঁছলুম গন্তব্য স্টেশনে। ভূতুড়ে গাড়িটা থেকে নেমে যেন মুক্তিস্নান হল।

স্টেশনে একা ছিল—মামাই পাঠিয়েছেন। এক ঘণ্টার মধ্যে আট মাইল রাস্তা পার হয়ে গেলুম।

মামা ব্যাচেলার মানুষ। একটু পাগলাটে ধরনের। প্রথম জীবনে সন্ন্যাসী হয়ে কয়েক বছর অজ্ঞাতবাস করেছেন, তারপর এখানে এসে ডাক্তারি শুরু করেছেন। একেবারে পাণ্ডববর্জিত গ্রাম-অঞ্চল। কয়ে বাক্স হোমিওপ্যাথি ওষুধের জোরেই এখানে ধন্বন্তরি হয়ে বসেছেন তিনি।

পাহাড়, শালবন, একটি ছোট নদী আর কয়েক ঘর দেহাতী

মানুষের ভেতরে মামার লাল টালির ছোট্ট বাড়িটি অত্যন্ত মনোরম। জায়গাটার কাব্যসৌন্দর্য আমি ঠিক বর্ণনা করতে পারব না—সেই সাহিত্যিক ভদ্রলোক থাকলে তিনিই সেটা ভালভাবে করতে পারতেন। মোটের ওপর আমার ধারণা—কলকাতা থেকে যারা কিছুদিনের জন্য পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায় এবং সেই অজ্ঞাতবাসের সময়ে শহরের কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা না হলেই যারা স্বস্তি বোধ করে এ জায়গা তাদের পক্ষে আদর্শ।

অনেকটা আগ বাড়িয়েই মামা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর রগের দুপাশে দু গোছা পাকা চুল ঝকঝক করছিল সকালের রোদে।

কিন্তু তার চাইতেও ঝকঝকে হাসি হাসলেন মামা,— 'আয়-আয়! পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

অসুবিধে। আমি ম্লান হাসলুম উত্তরে। সারারাত ট্রেনের সেই দুঃস্বপ্নটা আবার আমার নতুন করে মনে পড়ে গেল।

কিন্তু একটু পরেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করে জ্বালা-ধরা চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল সব, তখন চামচেতে মুরগীর ডিমের পোচ তুলতে তুলতে আমি মামাকে স্বপ্নটা বললুম। শুনে মামা হো হো করে হেসে উঠলেন।

"আসবার আগে মাংস-টাংস খেয়েছিলি বোধ হয়?"

"তা খেয়েছিলুম। একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল।"

"তাই এই কাণ্ড। পেট গরম হলেই লোকে ওসব খেয়াল দেখে। রান্নার তো দেরি আছে—ব্রেকফাষ্টটা ভালো করে সেরে নিয়ে ঘণ্টা তিনেক নিশ্চিন্তে ঘুমো। আমি ততক্ষণে গ্রাম থেকে একটা রোগী দেখবার পাট সেরে আসি।"

ব্রেকফাষ্ট চুকে যাওয়ার পরে এবং মামার ডাক্তারী ব্যাখ্যাটাকে হৃদয়ঙ্গম করে সমস্ত মনটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেল। তারপর ক্যাম্বিসের খাটিয়ায় গা এলিয়ে দিতেই আবার ঘুমের পালা। এবার নিঃস্বপ্ন এবং নিশ্ছিদ্র।

ঘুম ভাঙল চাকরটার বিকট কান্নায়।

ছুটে বেরিয়ে এলুম বারান্দায়। মামাকে একদল মানুষ বয়ে আনছে কম্পাউণ্ডের মধ্যে। তাদের চোখে মুখে শোক আর বেদনার ছাপ। হাউ হাউ করে কাঁদছে চাকরটা।

"কী হয়েছে? কী হয়েছে?" বুকফাটা জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিলুম আমি।

কিন্তু উত্তরের দরকার ছিল না—আমার মন তা আগেই টের পেয়ে গেছে। তবু কে জানত মামার হার্টের অবস্থা এত খারাপ ছিল! মাইল চারেক দূরে পাহাড়ী রাস্তায় ওঠবার সময় ঘোড়া থেকে তিনি পড়ে যান। যারা কাছে ছিল, তারা বললে, ঘোড়া থেকে পড়ে তিনি মারা যান নি—পড়বার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কাঁদবার মত শক্তি আমার ছিল না। এসে যখন পড়েছি, তখন শোকে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা আমার চলে না। আট মাইল দূরের পোষ্ট অফিসে দরকারী টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে—সব ঠিক করে, যখন মড়া নিয়ে বেরলুম—তখন বেলা নেমে এসেছে।

আড়ষ্ট ক্লান্ত পায়ে চলেছি। প্রায় মাইল দেড়েক দূরে শ্মশান।

কিন্তু একি—একি! এখানে সেই ন্যাড়া পাহাড়টা এল কোত্থেকে? কোথা থেকে তার ধারালো চুড়োটার ওপরে অমন করে পড়েছে শেষ বেলার হিংস্র আরক্তিম আলো—কোথা থেকে একটা শকুন এসে সেখানে ডানা মেলে বসেছে কালপুরুষের মতো?

সব এক—সেই স্বপ্নের সব এক। আমার চারিদিকে সেই অবিশ্বাস্য শূন্যতার সেই প্রেতশাণ্ডুর বিস্তৃতি!

অমানুষিক ভয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম—কে যেন আমার পা দুটোকে টানতে লাগল পাথুরে মাটির তলায়। সারারাত ট্রেনে আমাকে অমন করে ভয় দেখালে কে? আমার বার্থের তলায় গুঁড়ি মেরে যে বসেছিল—কে সে?

সে কি মৃত্যু? আমার সঙ্গে—আমারই সহচর হয়ে এসেছে সে?

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কল্লোল পরবর্তী যুগে যাঁরা অত্যন্ত বিশিষ্টতার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে নিজেদের আসন স্থায়ী করে রেখেছেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮—১৯১৬) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচনা সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র ধারার পরিচায়ক। গভীর অভিনিবেশ, সূক্ষ্ম ঘটনা-সংস্থান, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনায় লক্ষণীয় মাত্রায় বর্তমান। যুদ্ধোত্তর বাংলার দুর্দশাপীড়িত মানবসমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় ভাষার কারুকার্য একটি বিশেষ লক্ষণ। বাংলা সাহিত্যে তিনি এক্ষেত্রে অননুকরণীয়। নদনদী, পাহাড় পর্বত ও ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা এবং অতীতের বিস্মৃতির স্মৃতিভরা দিনগুলি লেখকের অনবদ্য ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। লালমাটি, শিলালিপি, উপনিবেশ স্বর্ণসীতা, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, অমাবস্যার গান প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গল্প রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সমধিক স্বীকৃত। তাঁর অজস্র ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। তিনি ছোটদের জন্যও অসংখ্য রচনা উপহার দিয়েছেন। তাঁর হাসির-গল্প এবং ভৌতিক গল্পও অবিস্মরণীয়। বাংলা ভাষায় প্রতিটি শাখাতেই তাঁর অনায়াস-বিচরণ ছিল। লেখকের "সুনন্দর জার্ণাল" একদা সাপ্তাহিক 'দেশে' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ভাষার প্রসাদগুণ তাঁর রচনার একটি বিশেষ সম্পদ। বিশ্ব সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর রচনায় বন্ধন মুক্তির বৈচিত্র্য এনেছিলেন খুব সহজেই।

"মৃত্যুতে বিশেষ জন্মের ছেদ ঘটে, কিন্তু প্রাণ বিলুপ্ত হয় না। সে বিশ্বব্যাপী অনন্ত জীবনধারায় মিশে যায়। ক্ষণিক জীবনের শেষ আছে, কিন্তু চিরজীবন অর্থাৎ জীবনপ্রবাহ, অনন্ত অক্ষয়।"

—রবীন্দ্রনাথ

"ঈশ্বর আত্মা আর ভূত—এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য"

—পরশুরাম

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্ণানি নরোঽপরানি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী।"

—গীতা

"মৃত্যু ধ্বংস নয়, বিচ্ছেদ বা অবসান নয়—মৃত্যুর ফলে
জীবন বাসা বদল করে, বেশ বা রূপ বদল করে

—রবীন্দ্রনাথ—

"ঘোষ্ট যত টোষ্ট-খায় তার সাথে চাহে চাঁহা
মামাদারা নাস্তা করে, কোর্মা গোস্তা খেয়ে—আহা।"

—তারাশঙ্কর

"প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কোন গুরুত্বপূর্ণ
সমস্যার সম্মুখীন হলে মিডিয়ামের সাহায্যে
পরলোকগত আত্মার সঙ্গে পরামর্শ করতেন"

—অমিতাভ চৌধুরী



ভূতের সন্ধানে

উজ্জ্বল ঘোষ

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় আমার এক মাসতুতো বোনের বিয়েতে অজিতের সঙ্গে প্রথম দেখা ও পরিচয়। ও আমার মাসতুতো ভাই অনুপের বন্ধু। আমাদের চাইতে বয়সে কিছু বড়, একটা মারচেণ্ট অফিসে চাকরি করে, দেখতে শুনতে বেশ, এবং খুব মিশুক। একটু আলাপেই আমাকে 'তুমি' বলতে শুরু করে দিল।

বিয়ের পর্ব চুকে যাওয়ার পর আমরা যখন অনুপের ঘরে গিয়ে বসি, অনুপ প্রথমেই ওকে বলে, 'তোমার জন্য আর একটা ভূতুড়ে বাড়ীর সন্ধান এনেছি ভাই।'

'তুমি গতবার যে বাড়ীর সন্ধান এনেছিলে, সেটা একেবারেই বাজে। ও বাড়ীর ভূত ছিল পাড়ারই একটি দুষ্টু ছেলে। যাতে বাড়ীটা বিক্রি না হয়, আর সে মনের সুখে ফল-পাকুড় চুরি করে খেতে পারে, তাই ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে ইট পাটকেল ছুঁড়ত, পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে দুম দাম করে হেঁটে বেড়াত, জানালায় দড়ি বেঁধে খটখট করত, আরও কত কি। আমরা তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে কিছু উত্তম মধ্যম দেওয়ায় সে সবই স্বীকার করে।' বলে অজিত হো হো করে হাসতে থাকে।

অনুপ বলে, এ বাড়ীতে ও রকম হবে না। যা সব শুনছি

আমাকে মেরে ফেললেও আমি ও বাড়ীর ত্রিসীমানায় যাবো না। শোন তবে, বলি তোমায় সব।

বাড়ীটা হচ্ছে ডানকুনিতে। স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে। কি করে যেতে হবে সে সব আমি জেনে এসেছি, তোমাকে পরে বুঝিয়ে দেবো। বাড়ীটা আমার বন্ধু, অনিলের এক কাকার। পুরোনো বাড়ী, তিনি খুব সস্তায় কিনেছিলেন। কিছুদিন আগে ওটা সারাতে গিয়ে কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে এবং ওঁর যতদূর ধারণা দুর্ঘটনাগুলো ভৌতিক কারণেই ঘটেছে। তাই তিনি এখন বাড়ীটা বিক্রী করে দিতে-চাইছেন।

স্থানীয় কুলি-মজুরদের দিয়েই বাড়ীটা সারানো হচ্ছিল। তারা সকাল বেলা কাজে আসত, সন্ধ্যার সময় চলে যেত। রাত্রি বেলা এক মাত্র দারোয়ান ছাড়া কেউ ওখানে থাকত না। বাড়ীর এক ধারে দারোয়ান-মালীর জন্য দু-তিনটে চালার ছাদওলা ঘর ছিল, তারই একটায় দারোয়ান থাকত। কিছুদিন পরে কলকাতা থেকে দুজন মিস্ত্রী কাজ করতে এসে ওখানেই থাকা ঠিক করে। ওরা দারোয়ানের পাশের ঘরে থাকত। কিন্তু একদিন রাত্রে গরমের জন্য ওরা ঐ বাড়ীর দোতলায় পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঘরটায় শুতে যায়। মাঝরাতে দারোয়ান বাড়ীর মধ্যে এক বিকট চীৎকার শুনতে পেয়ে টর্চ নিয়ে ছুটে যায় এবং সিঁড়ির কাছে গিয়ে দেখে যে ওই দুজন মিস্ত্রী সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে নামছে। একজন টাল সামলাতে না পেরে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ল, আর একজন ঠিকমত নেমে এসে দারোয়ানের দিকে কোন রকম ভ্রূক্ষেপ না করে, সোজা ছুটে বেরিয়ে গেল। যে লোকটি পড়ে গিয়েছিল সে ঘাড়ে চোট পেয়ে মারা যায়, আর যে সোজা ছুটে বেড়িয়ে গিয়েছিল, সে হয়ে যায় পাগল ও বোবা। এখনও সে সুস্থ হয়নি আর কোন দিন হবে বলে মনে হয় না, তাই সে রাত্রে যে কি হয়েছিল, তা আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি।

এই ঘটনার পরেই লোকজনেরা ওখানে আর কাজ করতে চায় না। অনিলের কাকা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের রাজী করালেন। কিন্তু দু-চার দিন যেতে না যেতেই ঐ পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঘরটায় আবার হল এক দুর্ঘটনা। দুজন মিস্ত্রী ঐ ঘরে পুরোনো প্লাস্টার ছাড়াচ্ছিল, ঠিক সন্ধ্যেটার সময়। প্রায় একই সময়ে, একজন নিজের মাথায় মারল হাতুড়ির এক বাড়ি আর একজন মই নিয়ে পড়ল উল্টে। দুজনেই হল গুরুতরভাবে আহত। যে নিজের মাথায় বাড়ি মেরেছিল সে বলে, যে কেউ হাতুড়িটাকে ঠেলে দিয়েছিল তার মাথার দিকে, আর যে পড়ে গিয়েছিল সে বলে, সিঁড়িটাকে কেউ ধাক্কা মেরে উল্টে ফেলেছিল।

এর পরে আর কেউ ও বাড়ীতে কাজ করতে রাজী হল না। অনিলের কাকা বেশি পীড়াপীড়ি করাতে সর্দার মিস্ত্রী বলে যে তারা ওখানকারই লোক, অতএব এটা যে ভূতের বাড়ী তা তাদের অজানা নয় এবং এই ভূতটা হচ্ছে একটা ভীষণ বজ্জাত লোকের ভূত।

লোকটা সম্পত্তির লোভে তার নিজের ভাইপোকে গলা টিপে খুন করে এবং পুলিশ ধরতে এলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। নেহাৎ কুলি-মজুরেরা ভেবেছিল যে দিনের বেলায় কাজ করলে হয়তো কিছু হবে না, তাই তারা কাজ করতে এসেছিল। কিন্তু সেদিনের ব্যাপারের পর আর তারা ভরসা পাচ্ছে না। টাকা ত' আর প্রাণের চেয়ে বড় নয়। শেষ পর্যন্ত বাড়ীটা আর সারানো হয়নি। আমি বাড়ীর চাবি নিয়ে এসেছি, আর স্টেশন থেকে বাড়ী যাবার রাস্তার একটা নক্শাও করে এনেছি। তুমি যদি যাও ত' তোমাকে দিয়ে দেবো।

অজিতের মুখ দেখেই বোঝা যায় যে সে ভারী খুশী। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলে, 'যাব না মানে? এরকম বাড়ীই'ত চাই।'

জিজ্ঞাসা করে জানি যে অজিতের এরকম ভুতুড়ে বাড়ীতে রাত্রিবাস করার এক বাতিক আছে। যদিও সে কোন কোন বাড়ীতে ভূতের

অস্তিত্বের কিছু নিদর্শন পেয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে পারে নি।

তাই সে সমানেই ভূতুড়ে বাড়ীর খোঁজ করে চলেছে।

কেন জানি না, আমারও খুব ইচ্ছে হল তার সঙ্গে যাবার। তাই আমি বলি, 'আমি কোনদিন যাইনি ভূতুড়ে বাড়ীতে, নিয়ে যাবে ভাই আমাকে ?

'তুমি গেলে ত' ভাই ভালই হয়। যে বন্ধু বরাবর আমার সঙ্গে যেতো সে কলকাতার বাইরে বদলী হয়ে গেছে। তুমি গেলে আমার আর অন্য সঙ্গী খুঁজতে হবে না। একা একা গিয়ে ঠিক জমে না ওসব জায়গায়। এ অনেকটা রাত্রিবেলা পিক্‌নিকের মত, তবে এতে পিক্‌নিকের চাইতে অনেক বেশী থ্রিল।'

'কবে যাবে ?'

'চল না, পরশুই যাই, তোমার যদি অসুবিধে না হয়।'

'আমার আর কি অসুবিধে, আমি ত' এখন বেকার।'

অজিত তখন অনুপকে বলে, 'নিয়ে এস তোমার নক্সা ও চাবি। আর একটা টাইম টেব্‌লও এনো।'

অনুপ তার টেবিলের ড্রয়ার থেকে নিয়ে এল সব। অজিত নক্সা ও চাবি পকেটে পুরে টাইম টেব্‌ল্ খুলে দেখে আমায় বলে, 'সাড়ে চারটের ট্রেনটায় গেলেই সুবিধে হবে। চারটের সময় হাওড়া স্টেশনে এন্‌কোয়ারি কাউণ্টারের কাছে আমার মিট্ করবো। আমি স্টোভ, রান্নার বাসন, খাবার জিনিসপত্র, বালতি ঝাঁটা .....'।

অজিতকে শেষ করতে না দিয়ে আমি হেসে বলি, 'ঝাঁটা দিয়ে কি করবে আবার, ঝাঁটা মেরে ভূত তাড়াবে নাকি ?'

অজিত হেসে জবাব দেয়, 'পোড়ো বাড়ী বড় নোংরা, একটু পরিষ্কার না করে নিলে রাত্রিবাস করা যাবে না। চায়ের জিনিসপত্রও আমি আনবো, তুমি শুধু আমাদের দুজনের শোবার মোটামুটি বিছানা ও ভাল একটা টর্চ এনো, আর কিছু লাগবে না।'

বাড়ী ফিরে মাথায় শুধু ভূতের বাড়ীই ঘোরে। অ্যাড্‌ভেঞ্চারের জন্য কেউ জঙ্গলে যায় শিকারে, কেউ ওঠে আকাশচুম্বী পর্বতে, কেউ নৌকোয় দেয় সমুদ্র পাড়ি—কত ঝঞ্ঝাট, কত খরচা, ভূতুড়ে বাড়ীতে যাওয়ার কোন ঝঞ্ঝাটও নেই, খরচাও নেই। আমার জীবনে এই প্রথম অ্যাড্‌ভেঞ্চার—উৎসাহের আর শেষ নেই।

মঙ্গলবার চারটের অনেক আগেই হাওড়া স্টেশনে হাজির হয়ে অজিতের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখি। ঠিক চারটে বেজে পাঁচ মিনিটের সময় দেখি একজন লোক কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে আমার দিকে আসছে। কাছে এসে লোকটি জিজ্ঞাসা করে, 'আপনিই কি ইন্দ্রজিতবাবু?' আমি হ্যাঁ বলার পর লোকটি কুলিকে মাল নামাতে বলে পকেট থেকে একটা খাম বের করে আমার হাতে দেয়।

খামটা খুলে দেখি ওর মধ্যে অজিতের চিঠি, একটা নক্সা, আর চাবি। চিঠিতে লেখা:

প্রিয় ইন্দ্রজিত,

বিলেত থেকে আমাদের কোম্পানির একজন ডিরেক্টর আসায় আমি সময় মত যেতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আমি পৌনে সাতটার ট্রেনে যাবো। দুজনেই রাত্রিবেলা গেলে বড় অসুবিধা হবে, তাই তুমি যদি ভাই সাড়ে চারটার ট্রেনে চলে গিয়ে, সব দেখে শুনে, ঘর বাড়ী একটু ঠিকঠাক করে নাওত' বড় ভাল হয়। রাত করে গেলে রিক্সা পেতেও অসুবিধে হতে পারে। যদি পার ত রান্নাও শুরু করে দিও। দোতলায় পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঘরটাতেই আমাদের থাকার বন্দোবস্ত কোরো। আমি সাড়ে সাতটায় পৌঁছে যাবো।

ইতি—অজিত।'

একা একা যেতে হবে ভেবে মনটা দমে যায়। যাই হোক সাড়ে চারটায় ট্রেন ধরেই আমি চলে গেলাম ডানকুনি। স্টেশন থেকে একটা রিক্সা নিয়ে ঐ ভূতুড়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম।

রিক্সাওয়ালা এক কথাতেই চিনে ফেলে বাড়ীটা। যেতে যেতে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কি একাই ঐ বাড়ীতে থাকবেন নাকি বাবু?'

'না' আমার এক সঙ্গী আসবে রাত্রিবেলা, আমরা দুজনে থাকবো।'

'এ বাড়ীতে রাত্রিবেলা না থাকাই ভালো। এখানে সকলেই জানে যে ওটা ভূতের বাড়ী'।

বাড়ী এসে গেলে। রিক্সাওয়ালা গেট দিয়ে ঢুকে পচ-এর নীচে রিক্সা দাঁড করিয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে রাখল বারান্দায়। তারপর ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

কাছাকাছি আর কোন বাড়ী ঘর নেই। ও বাড়ীটা দোতলা, বেশ খানিকটা জমি নিয়ে। রাস্তা দিয়ে আসবার সময় আর কোন দোতলা বাড়া নজরে পড়েনি। বাড়ীর চারপাশে ঘুরে দেখি, তিন দিকে নানা রকম ফলের গাছ, আর সামনের দিকে আছে কিছু ফুলের গাছ। প্রায় সব গাছেরই নীচের দিকের পাতা গরুতে খেয়ে গেছে।

বাড়ীটা দক্ষিণমুখী, সামনে রেলিং দেওয়া বারান্দা। বারান্দা থেকে ঢুকবার দুটো দরজা। ডানদিকের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ, সামনের দরজায় তালা দেওয়া। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলে দরজায় ঠেলা দেই। সামনেই একটা প্যাসেজ, তার দুপাশে ঘর। প্যাসেজে ধুলো জমে আছে, আর ওপর থেকে ঝুলছে মাকড়সার জাল। জানালা দরজা বন্ধ থাকায় সব অন্ধকার।

মাকড়সার জাল সরাবার জন্য গাছের একটা ডাল ভেঙে এনে টর্চ জেলে ভেতরে ঢুকি। জানালা দরজা এতদিন বন্ধ থাকায় ভেতরে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। সোজা প্যাসেজ দিয়ে দিয়ে প্যাসেজের শেষের জানালা খুলে দেওয়ায় আলো হল। প্যাসেজের বাঁ দিকে দোতলায় উঠবার কাঠের সিঁড়ি, ডানদিকে একটা দরজা। দরজা খুলে দেখি ছোট একটা উঠোন ও সেখানে এক টিউবওয়েল। পাম্প করে খানিকটা ঘোলাটে জল বের করে দেবার পর বেশ পরিষ্কার জল এল—খেয়ে দেখলাম ভালই।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাই। কাঠের সিঁড়ি। বেশ জোরে আওয়াজ করতে থাকি। ওপরেও নীচের মত প্যাসেজ যার দুপাশে রয়েছে ঘর, পেছন দিকে সিঁড়ি ও সামনে বারান্দা। দুটো শোবার ঘর বেশ বড় বড়, পাশে পাশে স্নানের ঘর। পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঘর তিনটে দরজা। একটা সামনের বারান্দায় যাবার, একটা প্যাসেজ ও একটা স্নানের ঘরে। সব ঘরই খালি, কোনও জিনিসপত্র নেই। জানালা-দরজা সব খুলে দিলাম, যাতে আলো-হাওয়া আসে ও ভ্যাপসা গন্ধটা দূর হয়।

নীচের ঘরগুলি বাড়ী বানাবার নানা জিনিসপত্রে প্রায় ভরা। যাতায়াতের জায়গা, সিঁড়ি ও দোতলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণের শোবার ঘরটা ঝুল ঝেড়ে ও ঝাঁট দিয়ে মোটামুটি পরিষ্কার করে ঐ ঘরে আমাদের জিনিসপত্র সব এনে রাখলাম। নীচে গিয়ে হাত পা ধুয়ে অজিতের পাঠানো বালতিতে এক বালতি জলও এনে রাখলাম ওপরে। তারপর উঠে যাই ছাদে। পশ্চিমে আকাশ লাল, সূর্য ডোবার আর বেশী বাকী নেই। সিঁড়ির দরজায় শিকল এঁটে নীচে নেমে গিয়ে সামনে পেছনে বাইরে থেকে ঢোকবার দরজা দুটো বন্ধ করে দিই, যাতে হঠাৎ কেউ বাড়ীতে ঢুকে দুষ্টুমি করে আমায় ভয় দেখাতে না পারে।

ঘরে এসে বিছনাটা পেতে ফেলি। অজিতের পঠোনো জিনিসপত্র সব খুলে ঠিকঠাক করে রেখে, কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখলাম ঘরে। স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দেখি যে প্রায় ছ'টা বাজে। অজিতের আসতে আরও দেড় ঘণ্টা, এতক্ষণ একা একা কি করব তাই ভাবি। ওর ডিরেক্টর আসার আর সময় পেলেন না, ঠিক আজকের দিনেই এসে হাজির। চা খেয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখি যে একটা রাখাল কয়েকটা গরু নিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় এ বাড়ীতে আমায় দেখে ও আশ্চর্য হয়ে গেছে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে একটা হাঁক দেয়, মনে হল গরুগুলোকে তাড়াতাড়ি যেতে বলছে। ভূতের ভয়ে নাকি?

একবার ভাবি নীচে গিয়ে ওকে ডেকে দুটো কথা বলি, খানিকটা সময় কাটবে। আবার মনে হয়, কি ভাববে লোকটা? এই ভাবতে ভাবতে মিলিয়ে যায় সব অন্ধকারে।

কি করা যায়? খেয়াল হল, আমি ত' তাস এনেছিলাম, ব্যাগ থেকে তাস বের করে পেশেন্স খেলতে শুরু করি। হঠাৎ শুনি কে যেন দরজা ধাক্কাচ্ছে। অজিত এলো বোধ হয়? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি মাত্র পৌনে সাতটা। অজিত ত সাড়ে সাতটার আগে আসবে না। হয়ত বা আগের ট্রেনেই চলে এসেছে। আবার দরজায় ধাক্কা পড়ে। অজিত একটা লাঠি পাঠিয়েছিল, সেই লাঠি আর টর্চ নিয়ে বেরিয়ে যাই ঘর থেকে। অজিত হলে নিশ্চয় আমার নাম ধরে ডাকত। কিন্তু অজিত ছাড়া আর কে-ই বা হতে পারে।

তাড়াহুড়ো করে নেমে পড়ি সিঁড়ি দিয়ে। প্যাসেজ দিয়ে ছুটে গিয়ে, খিল খুলে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে খুলে যায় দরজাটা। আমি পিছিয়ে না এলে জোরে বাড়ি খেতাম একটা। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে গায়ে। হাওয়া যে রকম এলো তাতে ত এত জোরে দরজা খোলার কথা, নয়। বাইরেও ত' কাউকে দেখছি না! দরজায় ধাক্কা দিয়ে পালালো নাকি লোকটা? হয়ত গাছের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে আছে।

কে জানে, হয়ত ঐ রাখালটাই ফিরে এসেছিল, আমাকে ভয় দেখাবার জন্য। বাড়ীর চারি দিকে ঘুরে কাউকে দেখতে পেলাম না। দরজা বন্ধ করে উঠে এলাম ওপরে।

আবার ভাবি, কি করা যায়? রান্না শুরু করে দেবো নাকি? অজিত ত তাই লিখেছে।

কি রান্না করবো? কিছুই ত বিশেষ জানি না। রান্নার জিনিসপত্র ঘেটেঘুঁটে মনে হয় ওর বোধ হয় খিচুড়ি প্ল্যান ছিল। ওটা আমিও একটু একটু জানি। খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে আবার তাস নিয়ে বসি।

তাস সাজাতেই একটা দুমদাম আওয়াজ শুনি। মনে হয় নীচের

ঘরে কে যেন জিনিসপত্রের মধ্য দিয়ে হাঁটাহাঁটি শুরু করেছে। আমি যখন বাইরে গিয়ে বাড়ীর চার দিকে খুঁজে দেখছিলাম তখন কেউ ভেতরে ঢুকে পড়েনি ত? যে লোকটা ধাক্কাচ্ছিল সে-ই হয়ত শেষের বার দরজা ধাক্কা দিয়ে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়েছিল, যেই আমি বাড়ীর বাইরে গেছি অমনি ঢুকে পড়েছে ভেতরে। বাইরে থেকে এসে তখন আবার চারদিক দেখে নেওয়া উচিত ছিল।

নীচে নেমে সব ক'টা ঘর যতদূর সম্ভব খুঁজে দেখি। কিন্তু কাউকে দেখতে পাই না।

আবার উঠে যাই ওপরে। ওপরে গিয়ে দেখি যে ঘরে ছিলাম সে ঘর থেকে ত' কোন আলো আসছে না। কি হল, সবগুলি মোমবাতিই কি নিবে গেল হাওয়ায়? ঘরে গিয়ে যা দেখি তাতে একেবারে হতভম্ব হয়ে যাই। ঘরে যেন একটা ঝড় হয়ে গেছে। সব জিনিসপত্র একেবারে তছনছ। তাসগুলি ছিটিয়ে আছে সর্বত্র, বিছানাটা দলা পাকিয়ে পড়ে আছে এক কোণে, খিচুড়ির ডেকচি ছিটকে পড়েছে স্নানের ঘরের কাছে, খিচুড়ি পড়ে আছে মাটিতে। স্টোভটা কাৎ হয়ে পড়ে কেরোসিনে ভেসে গেছে ঘরের একটা কোণ। আগুন লাগেনি, কি ভাগ্যিস। দুটো কাচের গ্লাসও ও একটা কাপ ভেঙে একেবারে চুরমার। বড় ঝড়েও বোধ হয় এরকম হয় না। ত'ছাড়া ঝড় এলোই বা কখন? এ রকম ঝড় এলে ত' আমি তা টেরই পেতাম। দমকা হাওয়া একটা এসে থাকতে পারে, কিন্তু তাতে জিনিসপত্র এতটা তছনছ হতে পারে না। অসম্ভব। কতকগুলো দুরন্ত ছেলেমেয়ে ছুটোপাটি করলে ঘরের যে অবস্থা হয়, ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে ঘরের। আর যাতে এ রকম না হয় তাই প্যাসেজে যাবার দরজা আর রাস্তার দিকের জানালাটা খোলা রেখে আর সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিলাম।

মনকে বোঝাতে চাই যে দমকা হাওয়া এসেই এ কাণ্ডটা করেছে কিন্তু—একটা কিন্তু থেকেই যায়। আর নীচেই বা কি করে আওয়াজ

হল ? মনে পড়ে যায় মিস্ত্রী দুটোর কথা, যাদের একজন সিঁড়ি থেকে পড়ে মরেই গেল ও আর একজন হয়ে গেল পাগল বোবা।

কি দেখেছিল ওরা ? কি হয়েছিল ওদের ?

বেশ কয়েকটা মোমবাতি জেলে ঘরের চারদিকে রাখি, যাতে ঘরটায় ভাল মত আলো হয়। ঘরটা ঠিকঠাক করে, কেরোসিন ভরে, স্টোভ জ্বালিয়ে আবার চাযের জল বসাই।

একবার জানালার কাছে গিয়ে দেখি অজিতকে দেখা যায় কিনা। রাস্তা ফাঁকা। আটটা বাজে। কি হল অজিতের? ওর ত' সাড়ে সাতটায়ই এসে পড়ার কথা। ট্রেন কি লেট হল ? আমার এ রকম বোকার মত একা একা আসা উচিত হয়নি। অজিতের জন্য হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষা করতেই পারতাম। হঠাৎ পেছনে একটা হিস্‌হিস্‌ শব্দে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াই। কেট্‌লির জল ফুটে গিয়ে আওয়াজটা হচ্ছে। বুঝতে পারি কী ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেছি। চা বানিয়ে বিছানায় বসে চা খেতে খেতে একটু ভাল বোধ করি

হঠাৎ দেখি যে প্যাসেজের দরজাটার সামনে দিয়ে একটা মানুষের ছায়ার মত কি যেন চলে গেল। কাপটা পড়ে গেল হাত থেকে। খানিকটা চা ছিটকে পড়ল গায়ে কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি দরজার দিকে। টর্চটা জেলে দাঁড়াতে চেষ্টা করি, পা কাঁপতে থাকে। অনেক কষ্টে মনকে শক্ত করে কোন রকমে দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে কাঁপতে কাঁপতে এসে বিছানায় বসে পড়ি।

আবার ঘড়ি দেখি, সওয়া আটটা। কি করেএত দেরী হয় অজিতের ট্রেনত' এত লেট হতে পারে না। হলো কি তবে ? ট্রেন মিস্‌ করল নাকি ? কি দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক, আগে জানলে কক্ষণো এরকম লোকের সঙ্গে আসা ঠিক করতাম না। জীবনের মত শিক্ষা হয়ে গেল। ফিরে যাবে নাকি বাড়ী ? এখন ত একা। একা নীচে আসতেও সাহস হচ্ছে না। ঐ যে ছায়ার মত কি একটা গেল, ওটা

নিশ্চয় কোথাও ওঁৎ পেতে আছে; বাহিরে গেলেই লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে। তারপর অবস্থা হবে ঐ মিস্ত্রী ছুটোর মত, হয়তো আছাড় খেয়ে পড়ে মরে যাবো নয়ত হয়ে যাবে পাগল ও বোবা।

একবার উঠি একবার বসি, আবার উঠি আবার বসি। আচ্ছা, অজিত যদি একেবারেই না আসে তাহলে কি করবো আমি? কেন আমি একা একা এলাম? কেন এলাম? এখন ফিরে যাবারও ত উপায় নেই, এখানে থাকবোই বা কি করে?

আবার জানালার কাছে গিয়ে টর্চ ফেলি রাস্তায়। মনে হয় দূরে টর্চের পাল্লার বাইরে কে যেন আসছে ছায়ার মত; নিশ্চয় অজিত।

ধীরে ধীরে এগোয় ছায়া মূর্তি, কিন্তু যেই টর্চের আলোর কাছে এলো অমনি গেল মিলিয়ে। এমনি করে একের পর এক ছায়া মূর্তি আসে, কিন্তু আলোয় এসেই যায় মিলিয়ে। না, অজিত আর আজ এলো না। হতাশ হয়ে গিয়ে বসে পড়ি বিছানার ওপরে।

তারপর আবার দরজা ধাক্কা দেবার শব্দ। এবার নিশ্চয় অজিত। তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলতে যাই, তারপরেই এক পা পিছিয়ে আসি, ঐ ছায়াটার কথা মনে পড়ে গিয়ে। তাছাড়া জিজ্ঞাসা না করে দরজা আর খুলবো না। জানালার কাছে সরে গিয়ে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করি, 'কে? অজিত?'

উত্তরে শুধু দরজা ধাক্কাবার আওয়াজ শুনি। আবার জিজ্ঞাসা করি, 'অজিত তুমি এসেছো'।

আবার দরজায় ধাক্কা পড়ে।

'এখন তামাসা করবার সময় নয়, স্পষ্ট করে বল তুমি অজিত কিনা না হলে দরজা খুলবো না।' নিজের গলার স্বর নিজেরই কানে বাজে।

কোনো জবাব নেই, দরজাতেও আর ধাক্কা পড়ে না।

খানিকক্ষন সব চুপ চাপ। তারপর হঠাৎ একটা শব্দ শুনে মনে হয়, কেউ বোধ হয় সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। কান পেতে শুনি, হ্যাঁ কে যেন উঠছে সিঁড়ি দিয়ে। কিন্তু বাহিরের দরজা ত' বন্ধ, কি করে

এলো লোকটা? শব্দ ক্রমেই জোরে হচ্ছে, ধাপে ধাপে উঠে আসছে লোকটা? থেমে গেল শব্দ। ওপরে উঠে পড়েছে নিশ্চয়। পাকা মেঝেতে পায়ের আওয়াজ হচ্ছে না। তাকিয়ে দেখি ঘরের সব কটা দরজাই খিল আঁটা। একটু যেন আশ্বস্ত হই, ভাগ্যিস দরজাগুলো আগে থেকেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

তারপরই চমকে উঠে দেখি, প্যাসেজ থেকে আসবার দরজার খিলটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত দৃষ্টি.তে তাকিয়ে থাকি খিলট'র দিকে একটু একটু করে খুলে আসছে খিল। বারান্দা দিয়ে লাফিয়ে পড়বো ভেবে উঠতে যাই, উঠবার শক্তি নেই, বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ি পিটছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে ঠক্ ঠক করে। কপাল দিয়ে ঘাম ঝরে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।

খুলে গেল খিল, খুলে গেল দরজা, নিবে গেল সব আলো। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

অন্ধকারের চাইতেও অন্ধকার কি যেন একটা এগিয়ে আসছে গুঁড়ি মেরে। কি একটা বিকৃতি, বিকট, ভীভৎস মূর্তি।

ঘরের বাতাস কি শেষ হয়ে গেছে? নিঃশ্বাস নিতে পারছি না কেন?

কে যেন ড'কছে 'ইন্দ্রজিত, ইন্দ্রজিত'—ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে আওয়াজটা। অজিতের গলা, সিঁড়ি দিয়ে উঠছে ও।

একটা ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে যেন জ্ঞান ফিরে আসে, ছুটে বেরিয়ে যাই।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকি দুজনে, পা আমার চলতে চায় না। হঠাৎ খেয়াল হল বাইরের দরজাটা কে খুললো? কে আর খুলবে, আমার ঘরের দরজা যে খুলেছে সে-ই।

খানিকক্ষণ পরে অজিত বলে, 'আমি ভাই বড়ই দুঃখিত এখানে আসার জন্য তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনায় পড়ে যাই, তাই দেরী হয়ে গেল। তুমি এখন ভাল বোধ করছে ত'?

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে অজিতের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, আগে খেয়াল করিনি।

তারপর রাস্তায় লোকজনও দেখি। অজিত বলে, 'স্টেশন আর বশী দূর নয় ওরা সব স্টেশনে যাচ্ছে। তুমি ভাই একটা রিক্সা করে চলে যাও, এখন একাই যেতে পারবে। ঐ যে একটা খালি রিক্সা আসছে।'

ওর কথা শুনে আমি একেবারে থ হয়ে যাই, জিজ্ঞেস করি 'তুমি কি করবে? তুমি যাবে না?

'আমি ভাই বাড়ীটা একটু দেখে যাবো, এসেছি যখন এত দূরে।'

'বল কি এ বাড়ীতে…'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে অজিত বলে, আমি ভাই একবার নিজের চোখে না দেখে পারবো না। তুমি এই রিক্সাটায় চলে যাও, না হলে ট্রেন মিস্ করবে, শীগগিরও আর ট্রেন নেই। আমার জন্য ভেবো না, আমি পরে যাবো।

রিক্সাটা কাছে এসে পড়েছিল, সেটাকে দাঁড় করিয়ে, 'আচ্ছা ভাই এসো তুমি, আমি যাই। বলে অজিত উল্টো দিকে হন্‌হন্ করে হাঁটতে শুরু করে দিল।

ভাবি, কি অদ্ভুত লোক, কি দুর্জয় সাহস! সাহস ত নয়—দুঃসাহস।

স্টেশনে পৌঁছে টিকিট কাটতে না কাটতেই ট্রেন এসে গেল।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়ী।

পরদিন অনুপ এসে বলল, 'তুই একা একা ভূতুড়ে বাড়ীতে গেছিস জানতে পেরে মার খুব চিন্তা হচ্ছিল, তাই তোর খোঁজ নিতে পাঠালেন। জানিস, অজিত কাল মারা গেছে। ডানকুনি যাবে বলে

তাড়াহুড়ো করে চলন্তি বাস ধরতে গিয়ে হাত ফসকে পড়ে যায়, আর মাথাটা গিয়ে পড়ে ফুটপাথের ধারে পাথরের ওপর। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটায় হাসপাতালে মারা গেছে। ওখানকার ডাক্তার ও নার্স বলল, ও না কি অনেকবার 'ইন্দ্রজিত, ইন্দ্রজিত' ও 'ডানকুনি, ডানকুনি' বলেছে। আর কোনোও কথাই বলেনি'। 'কিন্তু'·· বলেই আমি চুপ করে যাই।

উজ্জ্বল ঘোষ—বৃত্তিতে ইঞ্জিনীয়ার হয়েও লেখকের মন সাহিত্য-মানসিকতায় লালিত। উজ্জ্বল ঘোষের 'ভূত চতুর্দশী (আশ্বিন, ১৯১৬) বাংলা অতি-প্রাকৃত গল্প সংকলনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কিছু কিছু সত্য ঘটনার ছায়ায় ও নিজস্ব অভিজ্ঞতায় বিধৃত হয়ে গল্পগুলি রসোত্তীর্ণ। লেখকের আর একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ—'এ কি সত্যি' তৃতীয় মুদ্রণ কার্তিক ১৯১৬) অতি-প্রাকৃত ঘটনার তাত্ত্বিক আলোচনায় ভরপুর। এ গ্রন্থে পুনর্জন্ম অর্থাৎ মৃত্যুর দ্বার থেকে প্রত্যাগত লোকের অভিজ্ঞতা 'অ্যাস্টাল ট্র্যাভেল' অর্থাৎ আত্মার স্থূল শরীর ছেড়ে সূক্ষ্ম শরীরে বিচরণ, 'বাইলোকেশন' অর্থাৎ একই সময়ে একই লোকের দুই জায়গায় বিস্ময়কর অবস্থান ইত্যাদি আলোচনা আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। এছাড়া এখানে মিডিয়ামের উপস্থিতিতে বাস্তব ভৌতিক ঘটনাবলী দুই বন্ধুর তর্ক মাধ্যমে সহজ ও রসগ্রাহ্য পন্থায় উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক ১৩২৭ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও আজও সাহিত্য সাধনায় নিরত।



বাণী রায়

এমন রাতই ভয় দেখাবার রাত সন্দেহ নেই।

যেন আমার পশ্চাতে প্রেতধ্বনি—যে দু'টি মানুষ আমার পেছু নিয়েছে তারা নয় অন্য গ্রহের কোন জীব। পৃথিবীর আদিম জন্মদিনে সে জীব উল্লাস-সহ পশুরক্তে করাঙ্গুলি সিক্ত করে কাঁচা মাংসে পৃথিবীর জন্মোৎসব পালন করেছে, যেন পৃথিবীর সেই সকল অতিথি আমারি পশ্চাতে পদক্ষেপ করছে।

ভয়ে ভয়ে অপাঙ্গে পেছু তাকাচ্ছি। সম্পূর্ণ তাকাবার সাহস নেই আমার। যদি তারা বুঝতে পারে আমি তাদের লক্ষ্য করছি, আমি তাদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছি!

ভয়ে ভয়ে হাতব্যাগ শক্ত করে চেপে ধ'রছি শাড়ির আঁচলের নীচে। ঘন অন্ধকার, বড় অন্ধকার। বিজলী বিভ্রাটে এই রাস্তায় অতর্কিতে আলো নিভে গেছে। অথচ আমার বাড়ি ফেরার এটাই সহজ, সংক্ষিপ্ত রাস্তা। অনেক দূর এসেছি, ফিরে যাওয়া চলবে না।

ফিরে যাওয়া চলবে না। নিশ্চিত পা ফেলে যারা আমার পিছনে হাঁটছে, ফিরতে গেলে ওদের মুখোমুখি পড়তে হবে নিশ্চয়।

তখন কি হবে?

তখন কি হবে, আমি কি জানি? ওরা কেন আমার পেছনে আসছে, তা কি আমি জানি? জানলেও বুঝতে পারলেও ভাববার সাহস আমার নেই। অন্ধকারের আঁচল উড়ছে বাদল বাতাসে একটু আগে বৃষ্টি এসে গেছে, পথের লালমাটি ভিজে ভিজে। এই ছোট পথটাকে এখনও পীচ ঢালে নি। গাছপালার ফাঁদে ফাঁকে নূতন তৈরি বাড়ি আছে।

. আর আছে অন্ধকার।

আমি ভীত। আমি ভয় পেয়েছি। জীবনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেছি, উটের পা ফেলা শুনেছি কিন্তু আজ এই যুগল পদক্ষেপ আমার কাছে ভয়াবহ। নিশ্চিত রূপে এগিয়ে আসছে তারা।

কিন্তু তার আগে তো আমার গল্প আছে।

ঘণ্টা পড়ছে নীলামের।

ডায়মণ্ড—এমারেল্ড যুল সেট গোয়িং ফর টু থাউজাণ্ড। গোয়িং ভেরী চীপ। এনি অফার? গোয়িং গোয়িং অন। নীলামের চালকের হাতের হাতুড়ি ঢং করে পড়ল টেবলে। সঙ্গে সঙ্গে হীরা জহরের অলঙ্কারে সাজানো শো-কেস থেকে একটা চকোলেট রং-এর চামড়ার বৃহৎবাক্স হাতে চলে এল আমার।

আমি হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বীণাদি আমার কানে কানে চাপা গলায় বলে উঠলেন, এ কি করলে?

সত্যি, এ কি করলাম? একটা হীরের আংটি কিনব বলে এখানে এসেছিলাম। বীণাদির উকিলের বাড়ি তাঁর এক মক্কেলের মূল্যবান জহরৎ নীলাম হবে শুনে লোভে লোভে এসেছিলাম। বীণাদি তার ভাইঝির বিয়ের জন্য কিছু মুক্তোর গয়না কিনবেন বলে এখানে উপস্থিত হয়েছেন খবর পেয়ে। আমিও চিরদিনের সখ ছোট একটা হীরার উদ্দেশে সঙ্গে এসেছি।

হীরার ছড়াছড়ি চারিদিকে, কিন্তু ছোঁবার উপায় নেই। দামী

হীরক ব্যবসায়ীরা আসর জমিয়ে বসেছে। এখান থেকে নিয়ে একটু ঘষ'ঘষি করে দ্বিগুণ দামে বিক্রয় করবে। তাদের চোখ বা হাতে এড়িয়ে হীরা পাওয়া সম্ভবপর নয়। মুক্ত চুনী-পান্না তাঁরা ছোঁয় না, সস্তায় সেগুলো যাচ্ছে। পাঁচশো টাকার মধ্যে বীণাদির উপহার কেনা হয়ে গেল, চার গাছি মুক্তার চুড়ি।

আমি ক্রমান্বয়ে গোটা পাঁচেক আংটি ডাকালাম। কিন্তু প্রত্যেকবারই কোন না কোন হীরক ব্যবসায়ী ডেকে নিতে লাগল। শেষে আমি ক্ষেপে গেলাম। পূর্ববঙ্গের মেয়ে আমি, রক্তে জেদ আছে।

একটা হীরা পান্নায় ফুল সেট চোখে পড়েছিল, তার মধ্যে ভারী সুন্দর একটি আংটি ছিল। কিন্তু অত টাকা খরচ করে ফুল সেটটি কিনবার সামর্থ্য বা ইচ্ছা ছিল না বরাবর হতাশ হয়ে অপমানিত বোধ করে শেষ ডাক ডেকে কিনে নিলাম বস্তুটি নিজেরও অজ্ঞাতসারে।

চেক বই নিয়ে গিয়েছিলাম। বীণাদির উকিলের লোক হিসাবে নীলামদার চেক নিতে রাজী হল।

অতি কষ্টে তিলে তিলে জমানো টাকার বিনিময়ে একগাদা পুরণো গয়না কিনে অবাক হলাম। সকলে অবশ্য আমাকে অভিনন্দন জানাল, পাঁচ হাজারের মাল আমি নাকি দু'হাজারে পেয়েছি।

কিন্তু মন মানে কই? এতগুলো টাকা যা দরকার নেই, তাতেই ঢাললাম, অথচ যা দরকার এমন কত জিনিস আমার নেই।

বীণাদি সান্ত্বনা দিলেন, দেখ, এমন করে কিনলে কিছু কেনা হয় না। বেশ, সারা গায়ে হয়ে গেল। একটা আংটি নিয়ে কি করতে?

এখন বাড়ি ফিরি কি করে? পুরণো রঙচটা একটা কাশ্মীরী থলে জাতীয় হাত-ব্যাগ নিয়েছিলাম পথে দু'একটা প্রসাধনী কিনে ফিরব বলে। ওরই মধ্যে চামড়ার কেসটি রাখলাম। এখন করি কি?

উকিলবাবু গাড়ি করে বীণাদিকে পৌঁছে দিলেন বাড়িতে। এটা-ওটা দিয়ে তিনিও প্রায় হাজার টাকার জিনিস কিনেছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, একা মহিলার পক্ষে ভাড়াটে ট্যাক্সি নিরাপদ নয়।

বীণাদি প্রস্তাব দিলেন, তুমি আমার সঙ্গে চল প্রীতি। আমার স্বামী অফিস থেকে ফিরলে উনি গাড়ি করে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন। এত টাকার গয়না নিয়ে একা পথ চলা নিরাপদ নয়।

অগত্যা রাজী হলাম। ঘোর অন্ধকার চারিদিক ছেয়ে আসছে, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তায় মেঘলা। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিও পড়ছে এক-আধটু। বীণাদির বাড়ি চলে এলাম ওঁর সঙ্গে।

বীণাদির আধুনিক ফ্ল্যাটে বসলাম। উজ্জ্বল আলোর নীচে বেয়ারা চায়ের ট্রে সাজিয়ে দিল। হাসি পেল ভেবে এই আলোকোজ্জ্বল জগতের বাইরে আবার ভয় বাস করে না কি?

বীণাদি বললেন, গয়নার বাক্স যেন এখানে বার কোর না প্রীতি। আমার চাকর বাকর বিশ্বাসী নয়।

চা খাবার মধ্যেই টেলিফোন বেজে উঠল। বীণাদি ধরলেন। হাসপাতালে নাকি ওঁর একমাত্র বিবাহিতা কন্যাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শ্বশুরালয়ে ছিল সে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়। এখনি সিজারিয়ান করতে হবে।

বীণাদি পাগল হয়ে উঠলেন। স্বামীকে টেলিফোন করে ঘরে দোরে চাবি দিয়ে প্রস্তুত হলেম। হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য তক্ষুণি বেয়াইও গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হলেন।

—তুমি কি করবে প্রীতি? উনি তো অফিস থেকে সোজা হাসপাতালে চলে যাবেন এখন। আমাদের এই গাড়িতে যদি তোমাকে—বীণাদি ইতস্তুতঃ করলেন।

—হাসপাতাল আমার বাড়ির উল্টোদিকের পথে। কুটুম্বর গাড়িতে যাচ্ছেন আপনি, তায় এক মিনিট দেরী হলে চলবে না। আপনি চলে যান বীণাদি। আমি একটা ব্যবস্থা করেই নেব। না হয় এখানে বসেই অপেক্ষা করব।

দ্বিধাগ্রস্তা বীণাদিকে ঠেলে বার করে দিয়ে আমি বসবার ঘরে সোফায় বসলাম ভাবনা-চিন্তার আশায়।

কি করি এখন? আমার বাড়িতে টেলিফোন নেই যে টেলিফোনে কাউকে ডেকে নেব। বীণাদির চাকর-বাকর বিশ্বাসী নয়। বীণাদি বা তাঁর স্বামী কত রাত্রে ফিরবেন কে জানে? আজ রাত্রে হয়তো ফিরবেনই না। পরের বাড়ি কতক্ষণ বা বসে থাকব? এধারে বাড়ির লোকজন আমাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। অতএব যাবার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ট্যাক্সিতে যাওয়ার চেয়ে গলি দিয়ে হেঁটে বাড়ি যাওয়া ভাল। বীণাদির বাড়ি থেকে আমার বাড়ি খুব দূরে নয়। কে জানবে পুরণো ব্যাগটায় হীরা-হহরৎ আছে। আমাকে দেখে আর যা হোক হীরার খদ্দের মনেও হবে না।

মনস্থির করে হাতব্যাগটি আঁকড়ে ধরে পথে নামলাম। তখন রাত্রি হয়ে এসেছে। বৃষ্টি নেই বটে, জলভরা মেঘ আকাশ ঢেকে থমথম করছে অন্ধকার, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি আরও নিবিড়। এমন রাতই ভয় দেখাবার রাত, সন্দেহ নেই।

এমন ভয় নিয়ে কতক্ষন হাঁটব? পা অবস হয়ে যাচ্ছে, হাতে ব্যাগটা আঁকড়ে ধরার বল পাচ্ছি না। কি প্রয়োজন ছিল আমার, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা হীরার গহনার স্বপ্নে? আমার অতি কষ্টের সঞ্চিত টাকায় রবীন্দ্র রচনাবলী কিনলাম না, কিনলাম না শেক্সপীয়র, কিনলাম না সমগ্র মহাভারত। আমার টাকায় কোন দুঃখের মোচন হল না। আমি কিনলাম হীরা, যার প্রতিটি পলে অনেক অশ্রু। সেই হীরার ভার আর বয়ে নিতে পারছি না। লোক দুটো আমার পেছু নিয়েছে, ডাল কুকুর যেমন রক্তের গন্ধে শিকারের পেছু ধাওয়া করে। হয়তো নীলামের জায়গা থেকেই ওরা আমার পেছু নিয়েছিল। বীণাদির বাড়ির সম্মুখে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিল। আমি দেখি নি।

থামবার সাহস নেই। এক মরীয়া সাহস তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে। কতক্ষণ যে কালো পোশাকধারী লোক দুটো পেছু পেছু

আসছে প্রথমে লক্ষ্য করিনি। এখন মনে হচ্ছে যেন সৃষ্টির প্রথম থেকে আমি পথ হাঁটছি, লোক দুটো আমারই পেছনে বকের মত দীর্ঘ সরু সরু পা ফেলছে আমাকে খুঁজে খুঁজে। পথ যেন লাটাই জড়ানো সুতো, যত চলেছি তত খুলে খুলে দীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছে।

এখন কি করি?

হঠাৎ মনে হল এখানে বনানী সোম থাকেন একটু দূরে। এককালে আমাদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন তিনি। অবসর নিয়ে ছোট একটা বাড়ি করে আছেন। বীণাদির বাড়ির পাশে এক-আধদিন এই রাস্তায় এলে তাঁর খবর নিয়েছি। খুবই খুশি হতেন বলতেন প্রীতি, তুমি বুঝি আজকাল অনুপ্রাসের ভক্ত হয়েছ? বীণা থেকে বনানীতে এসেছ তাই।

প্রায় তিন মাস বনানীদের খবর জানি না। আমাকে দেখলে কত খুশি হবেন। কিন্তু তার আগেই ওরা যদি আমাকে ধরে ফেলে এই রাত্রে কেউ দরজা খুলে রাখে না, বিশেষত বাড়িতে বুড়ো ঝি প্রমদা ভিন্ন কেউ থাকে না। তার ছেলে জাহাজে কাজ করে, মধ্যে মধ্যে আসে। ওদের থাকবার জন্য উঠোনের একপাশে রান্নাঘরের পাশে একটা বড় ঘর করে দিয়েছিলেন বনানীদি।

পেছন দিয়ে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। দুটো ঘর আছে ওপরে। শুধু খাবার সময়ে বনানীদি নীচে নেমে রান্নাঘরের পাতা টেবলে বসত।

নির্জন পাড়ায় এভাবে থাকার জন্য বনানীদিকে অনেক নিষেধ করেও ফল হয়নি। কিন্তু ওই দরজায় ঘা দিতে গেলেই ওরা আমার মুখে কাপড় গুঁজে ধরে ফেলে যদি?

মরীয়ার মত উড়ে বনানীদির হলুদে বাড়ির দরজায় এলাম। এবার আমাকে থামতেই হবে।

কিন্তু দরজা খোলা, সামনে বনানীদির কাল চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

উর্ধ্বশ্বাসে ঢুকে গেলাম, নিঃশব্দে বনানীদির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বিস্মিত হবার সুযোগ পেলাম এতক্ষণে, আপনি নিজে দরজা খুললেন।

—আমি যে ওপর থেকে দেখলাম লোক দুটো তোমার পেছু নিয়েছে। দোতলায় যাবার সিঁড়িতে বনানীদি উঠলেন।

আমিও সহগামী হতে গিয়ে দেখলাম বড় ঘর আর রান্না ঘরে আলো জ্বলছে।

—প্রমদার ছেলে এসেছে বুঝি? আমি প্রশ্ন করলাম।

—হ্যাঁ, ওরা চা-টা খাচ্ছে। তুমি যাও না, চা খেয়ে নাও। একটু থেমে বনানীদি বললেন আচ্ছা, একটু আমার কাছে বোস আগে অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।

অনেকদিন আসতে পারিনি, বনানীদি। আপনি ভাল আছেন?

—ভাল? হ্যাঁ ভাল আছি।

—কিন্তু গলাটা যে ধরে গেছে, বনানীদি। কেমন শোনাচ্ছে। সর্দি লেগেছে বোধ হয়? সারাগায়ে চাদর জড়িয়ে বসে আছেন।

ঘরে মিট্‌মিটে টেবল ল্যাম্প জ্বলছে একটা—বনানীদির পড়ার ঘর। ও কোণে অন্ধকার চেয়ারে বনানীদি বসেছেন। তার মুখ চোখ দেখতে না পেলেও কেমন ক্লান্ত বিষণ্ণ লাগছে তাঁকে। যেন বড় কষ্ট হচ্ছে তার।

—ও কিছু নয়, প্রীতি! তোমার গল্প বল।

আমি নিজের নির্বুদ্ধিতার গল্প বললাম তাঁকে।

হীরার গয়না দিয়ে তুমি কি করবে, প্রীতি? আবার নিলামেই বেচে দিও। কোথায় তুমি প'রে যাবে? সবচেয়ে বড় কথা, কোথায় রাখবে? এই সব হীরে জহরতের জন্যেই পৃথিবীতে এত পাপ। এরই জন্যে মানুষ তারি মত মানুষকে খুন করে।

বলতে বলতে বনানীদি কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, অন্ধকারও

তার চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠল, তিনি বললেন এখন বাড়ি যাও প্রীতি। নীচে গিয়ে প্রমদার ছেলেকে বল গাড়ি ডেকে তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে। কোন ভয় নেই প্রীতি আর দেরী কোর না।

আমি মাথা নামিয়ে উঠলাম। শিক্ষয়িত্রী আমার কেবল নীরস শিক্ষা দান নয়, স্নেহ দানও করেছেন! কিন্তু বনানীদি অন্যদিনের মত আমাকে এগিয়ে দিতে এলেন না সিঁড়ির মুখে, বসেই রইলেন অন্ধকার কোনটায় চাদর মুড়ি দিয়ে।

স্বীকার না করলে কি হবে বনানীদি অসুস্থ, রীতিমত অসুস্থ। সিঁড়ির নীচে দাঁড়ালাম এসে। এখানেও অন্ধকার, কিন্তু রান্না ঘরে প্রমদার জোয়ান ছেলে মঙ্গল আর দু একজন চা খাচ্ছে বসে বসে। আমার দিকে প্রমদার চোখ পড়ল ওমা প্রীতি দিদিমণি যে! এতদিন কোথায় ছিলেন?

আমি বললাম, দেখ প্রমদা বনানীদি বললেন যে প্রমদা কেমন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল, কি বলছেন দিদি? জানেন না?

আমি হঠাৎ সজাগ হলাম, কি জানব?

মা যে আর নাই? আজ দশদিন হল থ্রম্বোসিসে মা মারা গেছেন। ওনার শ্রাদ্ধ এই বাড়িতেই হবে। ওনার ভাই-বোনেরা কাল আসবেন। ভাই খবর দিতে এসেছিলেন, আমাদের বাড়ি পাহারায় রেখে গেছেন। আহা আগে এলেন না দিদি, মা যে আপনাকে ভারী ভালবাসতেন, প্রমদার চোখে জল এল।

আমি এক মুহূর্তে জমে গেলাম ভয়ে, কি বলছ প্রমদা। আমি যে নিজ চোখে দেখলাম এই মাত্তর অপনি দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ির নীচে দাঁড়ালেন ওপরে আবার গেলেন কখন?

মঙ্গল আমার গলা শুনে রান্না ঘর থেকে বের হয়ে এল, কিন্তু প্রীতি দিদিমনিকে দরজা খুলে দিল কে?

—তাইতো। প্রমদা একটুক্ষণ নির্বাক হয়ে থেকে বলল, কি জানি ভুলো মনে আমিই হয়তো ছিটকিনী লাগাই নি।

মঙ্গল তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিল, থাকগে ও কথা দিদিমণি, ঘরে একটু বসুন চ খান। তারপর আমি আপনাকে পৌঁছে দিই। এত রাত্রে একা ছাড়ব না।

আমি নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম। আমারি কি উত্তেজিত মস্তিষ্কের প্রহেলিকা মায়া সৃষ্টি করে আমাকে দেখিয়ে দিল জীবন মৃত্যুর ব্যবধান কিছুই নয়?

ভয় দেখাবার রাত আরো ভয় নিয়ে এল কি?

শ্রীমতি বাণী রায়—১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী জীবনে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'পুনরাবৃত্তি লিখেন। এক নতুন শিল্পকৌশলে বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দেন তাতে সাহিত্য মহলে রীতিমত সাড়া জাগে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। দিল্লীতে জাতীয় কবি-সম্মেলন অংশ গ্রহণ, আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে ভারতীয় সদস্যা হিসাবে পূর্ব বার্লিনে অনুষ্ঠানে যোগদান, এগুলি তাঁর কর্মজীবনের সুষ্ঠু পরিচয়। কাব্যগ্রন্থ জুপিটার' এবং 'প্রেম'। নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ, চোখে আমার তৃষ্ণা, সকাল সন্ধ্যা রাত্রি প্রভৃতি কথা-গ্রন্থ তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিংহদাস পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক ও লীলা পুরস্কার, শেফালী স্মৃতি স্বর্ণপদক প্রভৃতি সম্মান বাংলার এক শ্রেষ্ঠ মহিলা লেখিকা হিসাবে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি করেছে। মৌলিক রচনা ছাড়াও বিভিন্ন অনুবাদেও লেখিকার সুনাম সুবিদিত। তাঁর ভৌতিক গল্পগুলির মধ্যে "ভয় দেখাবার রাত" বিশিষ্টতার দাবি রাখে।



আজও যা ঘটে

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

রাত ন'টা বাংলোর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির ঝমঝমানি নূপুর বাজানো মিঠেল আওয়াজ মনে একটা মধুর আমেজ এনে দিচ্ছে। বাগানের গোলাপবালাদের বারি ধারার ছোঁয়ায় সলজ্জ কম্পন দেখছি। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় ভেজানো গেটটা কেঁপে উঠলো। মানুষ যেমন দু'হাত দিয়ে গেট খোলে, সেই রকম হাওয়ার গতি হয়ে, দুধারে গেটের দুটো পাল্লাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

গোলাপ গাছগুলোকে ঠেলে সরিয়ে সরিয়ে কে বাংলোর দিকে আসছে না?

মলয়দাই তো! টলছে কেন? ওর কী হল? দৌড়ে ঘর থেকে বাগানে গেলুম। কোথায় কে? কেউ তো নয়। ঘরে ফিরে এলাম। জ্যাঠাইমা এসে বললেন—মলয় এসেছে রে? কই? না তো।

মলয় যেন কতো অসহায় করুণভাবে মা মা বলে ডাকলো। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম।

আমার তো মনে হয়েছিলো, বাগান দিয়ে মলয়দা আসছে।

জ্যাঠাইমাকে বোঝালুম, বৃষ্টি বাদলের জন্যে পথে কোথায় আটকে

পড়েছে হয়তো, ভাবনার কিছু নেই। একটু বাদেই আসবে। বৃষ্টি থেমে আসছে ক্রমশ। জ্যাঠাইমা শুনতে গেলেন।

প্রিয়জনকে কাছে রাখবার প্রবল ইচ্ছাই অবচেতন মনের কোণে ইহা-সর্বদা বিরাজ করতে থাকে বলেই বোধ হয় প্রিয়জনের ভাবছবি তার অভাব পূরণ করে। এক এক রূপ নিয়ে কল্পনার চোখে দেখা দেয়, কানে কথা শোনায়।

কারমাটার এই গোলাপ বাগানটি ঠাকুরদার আমলের। তিনি বছরে প্রায় তিন চার মাস কাটিয়ে যেতেন এখানে। মনের মতো করে তাঁর হাতে গড়া গোলাপ বাগিচার মাঝখানে সুন্দর বাংলোটি। আমরা আসি বছরে একবার। একটু চেঞ্জের উদ্দেশ্যে। তাও স্বল্প সময়ের জন্যে। এইভাবে জ্যাঠাইমা, মলয়দা আর আমি এসেছি। রয়েছি মাসখানেক। এইবার ফিরে যাবো সামনের সপ্তাহ নাগাত।

মলয়দা একটু উদ্ধত প্রকৃতির। কারো কথা শোনে না। নিজে যা ভালো বুঝবে সেইটাই ঠিক। জ্যাঠাইমা এতে কিন্তু অশান্তি পান খুব। আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে ঝগড়া নিয়েই থাকে মলয়দা। আমিও বুঝিয়ে পারিনে!

বৃষ্টির জলের সঙ্গে গোলাপদের মিতালি দেখা মাথায় উঠলে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মলয়দার না ফেরাতে নানা উদ্ভট চিন্তা ভিড় করতে লাগলো। তাই তো যা গোঁয়ার, কারো সঙ্গে মারপিট করছে না তো কোথাও? জ্যাঠাইমা অবশ্যি মলয়দা যখুনি কোথাও বেড়াতে বেরোয়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেন, কিন্তু মলয়দা রাজী হয় না। আমিও পীড়াপীড়ি করিনে আর। মলয়দা একটু দেরী করে বাড়ি ফিরতে বলে দিয়েছেন অনেকবার। কিন্তু কি আক্কেল মলয়দার।

জ্যাঠাইমার ব্যথা বুঝি। ভাবি মলয়দা কী একটু বোঝে না। ছেলের জন্যে মায়ের কী ব্যাকুলতা। আর কবে ও বুঝবে। সারারাত

মলয়দার দেখা নেই। বৃষ্টি মুষলধারে পড়তে শুরু করলো আবার। এই দুর্যোগে কোথায় যাই? কোথায় খুঁজি? জ্যাঠাইমার অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়। মালাকে পাঠালুম। যতদূর পারলো, যেখানে যেখানে মলয়দা যেতো, সব জায়গা খুঁজে নিরাশ হয়ে ম্রিয়মাণ মুখে ফিরে এলো। পরের দিন সকালে খোঁজ—খবর অনেক নেওয়া হল চারধারে। কোন সন্ধান পাওয়া গেল না মলয়দার! সে রাতে আবার আগের রাতের পুনরাবৃত্তি ঘটলো। একটা দমকা হাওয়া। গেট খোলা। জ্যাঠাইমার দরজা ঠেলা। বাগানে টলতে টলতে আসে। মা—মা বলে আর্তনাদ। বড় বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হতে লাগলো আমি বসে ভাবছি এখন কি করি। এমন সময় আমার পিছন থেকে পিঠে করে যেন ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করলুম। কে যেন আমায় ঠেলে ঠেলে কোথায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। ভেতরে সব অনুভব করছি। কিন্তু কি শক্তি এটি তা বুঝতে পারছিনে। কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে। ভয় যে হচ্ছে তাও না, অথচ কার স্পর্শ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি সেই টানাকে বাধা দিতে পারছিনে। আর বাধা দেবার ইচ্ছেও নেই।

আমি এগিয়ে চলেছি। গেট পার হয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছি। প্রায় মাইল খানেক পথ পার হতে কোরাস গানের আওয়াজ শুনতে পেলুম। ঢোলক বাজছিলো। গান হচ্ছিলো দেহাতি ভাষায়। হাত তালি দিচ্ছিল সকলে মিলে। বাতাস তাড়ির গন্ধে ভরপুর।

লোকগুলো তাড়ির নেশায় এতো উন্মত্ত হয়ে উঠেছে যে, তাদের পাশ দিয়ে আমি চলেছি, আমার ওপর কারো নজর নেই। সব দেখছি। সব বুঝছি। কিছু ভুল নেই। এগিয়ে চলেছি কেন। এইটাই বুঝতে পারছিনে। আমার পিঠের হিমশীতল স্পর্শ যেখানে এসে সরে গেলো, চেয়ে দেখি, গাছ ঘেরা নির্জন থমথমে জায়গাটা। ঝোপের পেছনে ভাঙা খাটিয়া আর ছেঁড়া চট-থলের স্তূপ।

একি। এখানে কেন এলুম? চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। এমন

সময় সেই স্পর্শ আবার আমার পিঠে লাগলো। এবারে বাংলো মুখো এগিয়ে নিয়ে এলো।

বাংলোয় পৌঁছুতে স্পর্শ আপনা হতে সরে গেলো। সকালে উঠে রাতের ব্যাপারটি কি জানাবার জন্যে সেই জায়গাটিতে গেলুম। যা রাতে দেখেছিলুম, দিনেও ঠিক তাই দেখলুম। যাক, মাথা তাহলে খারাপ হয়নি। এবারে জ্যাঠাইমার অবস্থা চরম। দুদিন কেটে গেলো এইভাবে। মলয়দা কলকাতার বাড়িতেও যায়নি। খবরা-খবরে কলকাতা থেকেও আত্মীয়-স্বজন সব এসে পড়েছেন। সকলেই বিষাদগ্রস্ত। দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে অনুক্ষণ। মলয়দা দুরন্তপনার জন্য বাড়ির সকলের বরাবরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। মলয়দার ওপর একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ছিলো সবার।

তৃতীয় দিন রাতে আবার সেই অবস্থা হল আমার। সেই হিমশীতল স্পর্শ আবার আমাকে নিয়ে চললো আগেকার জায়গায়। যেখানে ভাঙা খাটিয়া আর ছেঁড়া থলের স্তূপ। ঠিক ওই জায়গায়ই হিমশীতল স্পর্শ আমার স্পর্শানুভূতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। এবারে আমার এইভাবে যাওয়া দেখে অনেকেই আমাকে অনুসরণ করেছিলো।

ওই জায়গাটি থেকে বেরবার চেষ্টা করছি, কানে ভেসে আসতে লাগলো একটা গোঙানির আওয়াজ। যেন সেই ভাঙা খাটিয়া থলের স্তূপ থেকে আওয়াজটা বেরুচ্ছে। আমি কেমন হয়ে গেলুম। আমার মনে হল এই স্তূপের তলায় কেউ চাপা পড়ে আছে নিশ্চয়। স্তূপের কাছে দৌড়ে এলুম। আশেপাশের উত্তর প্রদেশীয়েরা বাধা দিলে। বললে, বাবুজী। ওসোব সমান হামাদের আছে। বহুত দিন তক, উহা মত যাবে। সাঁপকা ডর ভী বহুৎ আছে।

ওদের কথা শুনে যতো পেছুতে থাকি, ততো একটা চাপা আর্তনাদ ওখান থেকেই ভেসে এসে আমাকে স্তূপের কাছে আরো টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

স্তূপ সরাবার এক দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো। আমি সকলের কথা, বাধা অগ্রাহ্য করে একটা ভাঙা খাটিয়া টানতেই হুড়মুড় করে আওয়াজ হল। থলেগুলো যেন কোথায় নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলো মাটির তলায় কি ওদের গ্রাস করলো নাকি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না—তো। ওখানে একটা মস্ত গর্ত বলে মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, সত্যিই তো। যতো গর্তের কাছে এগুতে থাকি, ততো সেই গর্তের ভেতর থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাই। কাছে গিয়ে দেখি, একটা পুরোনো পাড়ভাঙা ইঁদারা! আমি চমকে উঠি। স্থানীয়েরা তখনো বলে—ওর ভেতরে সাঁপ আছে। বাবুজী! ও জল কেউ না লেয়, ইসলিয়ে হামি লোগ ভাঙা টুটা চারপায়া আউর বোরা দিয়ে ঢাকা বানিয়েছে। ইদারা কী মু বন্ধ করকে রাখছে।

আমরা সকলে ফিরে আসছি, আবার সেই হিমশীতল স্পর্শ টেনে নিয়ে গেলো আমাকে ইঁদারার কাছ অবধি। অন্যরাও আমার সঙ্গে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। আমার সঙ্গে এগোলো, আমার সঙ্গে পেছালো।

এবারে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম মলয়দাকে ইঁদারার মধ্যে। আমায় হানছানি দিয়ে ডাকছে। মুখে চোখে অসহনীয় যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে। আমার বেদনা কাতর গলা থেকে অস্ফুটভাবে বেরিয়ে এলো—মলয়দা! তুমি এর ভেতর পড়লে কি করে? জ্যাঠামশাই আমাকে ধরে ফেললেন। আমি এখন পাগলের মতো, ইঁদারা থেকে কিভাবে মলয়দাকে উদ্ধার করা যায়, সেই চিন্তা পেয়ে বসেছে। আর কোন দিকে লক্ষ্যই নেই। ইঁদারায় কি করে নেমে তোলা যায় মলয়দাকে?

জ্যাঠামশাই আর যাঁরা আমার সঙ্গে গেছেন, আমার কোনো কথাই কেউ বিশ্বাস করছেন না। কেন না তাঁরা কেউ শুনছেন না, দেখছেন না। সকলে বোধ হয় ভেবে নিয়েছেন, আমি পাগল হয়ে গেছি। উত্তর প্রদেশীয়দের মধ্যে মনুয়া সর্দার এগিয়ে এসে বললে,

বাবুজী ও ইঁদারামে ভূত আছে। উধার না যাবে আপনি লোগ! আমাদের ফেরাবার জন্যে তারই বেশী চেষ্টা। আমি মনুয়ার চোখের দিকে যতবার চাইছি, ততবার আমার পিঠে হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করছি। আর মনুয়ার চোখের তারায় মলয়দার মুখ স্পষ্টভাবে ভেসে উঠতে দেখছি—ইঁদারার কাতর চাউনির মলয়দাকে। আমার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। বসে পড়লুম। মনে পড়ে গেলো, বাগান থেকে রোজ গোলাপ চুরির জন্যে এই মনুয়ার ছেলেকে একদিন মলয়দা এমন মার মেরেছিলো যে আধমরা করে ছেড়েছিলো, কে যেন জোর করে ধরে ইঁদারার ধারে দাঁড় করিয়ে রাখলো। যেন আমাকে দিয়ে বললো, কাঁটা লাগানো শুদ্ধ দড়ি নিয়ে আসতে শীগ্‌গির। আমাকে তুলিয়ে বাংলোয় নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছে সবাই। অন্য সকলে ও ঘাবড়েছেন কিছু। আমি জিদ ধরেছি, কাঁটা—দড়ি আনা না হলে যাব না কিছুতেই। মেজদাকে বলে বাংলো থেকে কাঁটা লাগানো দড়ি আনা হল। বাগানের ইঁদারায় কিছু পড়লে ঐই কাঁটা-দড়ি দিয়ে তুলতুম। আমি দড়ি নামিয়ে দিতুম ইঁদারার ভেতর, পেট্রো-ম্যাক্সের আলোয় বেশ দেখতে পেতুম, মলয়দা আমার দড়ি ধরলো। উঠতে চেষ্টা করছে। আমি প্রাণপণে টানছি। এবারে মলয়দা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে আসছে আমার দড়ি ধরে ইঁদারার জলের নীচে থেকে। ওপরে কাঁটা বিঁধে যা উঠলো, তাতে আমার সঙ্গের সকলকেই এক শ্বাসরুদ্ধকারী মর্মান্তিক দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হল। মলয়দার মাঝ আঙুলে 'এম' লেখা মিনে-করা আংটি পরা ডান হাতখানি। যেন টাঙ্গি দিয়ে কাটা হয়েছে। একে একে সব অঙ্গই তোলা হল ওই ভাবে। মৃত মলয়দার চোখে দেখতে পেলুম জীবন্ত মানুষের মুখখানা স্পষ্ট।

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী—বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রসাধনা বিষয়ক রহস্যের অলৌকিক কাহিনী ছিল না বললেই হয়। দু' একজন খ্যাতনামা লেখক অবশ্য এই বিষয়বস্তুর দু'টি একটি আখ্যান রচনা করেছেন। অথচ এই জাতীয় কাহিনীর প্রতি সাধারণ পাঠকের একরকম সহজাত আকর্ষণ আছে। সেই তীব্র আগ্রহের প্রশমণ ঘটিয়েছেন তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী। তিনি খুব অল্পকালের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে নিজের বৈশিষ্ট চিহ্নিত করতে পেরেছেন। সাধন সম্পর্কিত গূঢ় রহস্য এবং তার বিচিত্র অনুভূতি, মানুষের অবচেতনা জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি বিষয়ের উপর তিনি নূতন অলোকপাত করেছেন। এই লেখক অত্যন্ত মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে গল্প উপস্থিত করে থাকেন। রহস্যের ঘনীভূত জাল ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে যায় তাঁর প্রতিটি রচনায়। পাঠককে তিনি গল্পের শেষ শব্দ পর্যন্ত সম্মোহিত করে রাখেন। বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ দিকটিতে তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেই কলম ধরেছেন। তাঁর রচনা এখন অবিশ্বাস্য রকমের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কলকাতার গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমবাসী লেখক সজ্জন ও সহৃদয় মানুষ হিসাবে পরিচিত।



সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

একবাব নয়, বেশ কয়েক বাং। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল আর স্পষ্ট নাম ধরে ডাকাডাকি কবছিল। ইয়াকুব, ইয়াকুব! সেই সময় মাঝ বাতে যেন বাতাসেব তোলপাড় শুরু হয়েছে। যেন ছোট-বড় সব বকম গাছপালা দুলতে লেগেছে চাবিদিকে। ভাঙা দালানের কোণায়-কোণায় ইদুরগুলো দৌড়ে যাচ্ছে! ···ইয়াকুব, ইয়াকুব! ইয়াকুবের বউ স্বপ্ন দেখে গোঙাচ্ছে। খরগোস কিংবা শেয়াল একটা, লাফ দিয়ে ঘরের মেঝেয় পড়ল। পাটকাঠির বেড়ায় ঠাসা জানালাটা মড়-মড় কবে উঠল। ···ইয়াকুব, ইয়াকুব! ইয়াকুব সরকারী লণ্ঠনটা তাড়াতাড়ি জ্বেলে নিয়ে আগড় ঠেলে, বেরিয়েছিল। বারান্দার নীচে সিঁড়ি বেয়ে নামলে যে সব পাথর বাঁধানো কবর-গুলো পায়ের সামনে প্রতিরোধ, ইয়াকুব বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছিল তাদের ভূতগুলোকে। ইয়াকুব খাঁব পায়ে পায়ে কবব! ইয়াকুব খাঁর পায়ে দোজাখ! খোজাবা কববের ভিতর দোজাখের আগুনে ঝল্‌সাচ্ছে। সেই আগুনে পা বাঁচানো কঠিন। ইয়াকুব অনেক সাবধানে হেঁটে ফটকের কাছে পৌঁছেছিল। ফটকটা তখনও নড়ে উঠছে। কিন্তু ভারি দরজার একটা পাল্লা একটু ফাঁক করে আর কাকেও সে দেখতে পায়নি।

ইয়াকুব মুণ্ডটা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক খুঁজেছিল। ঠাসা অন্ধকার। আকাশে নক্ষত্র জ্বলছে। সাম্‌নে ফাঁকা কিছু ঘাসের জমি। তার ওপারে জাতীয় মহাসড়ক। সব কিছু অন্ধকারের

মধ্যে একাকার। ছোট-বড় গাছপালার ঘন জঙ্গলে আবছা পোকা-মাকড়ের ডাক। আর আশ্চর্য, একটুও বাতাস নেই। সব কিছু শান্ত আর স্পন্দনহীন। সেই দুনিয়ার কোন চিহ্ন নেই আর—যে দুনিয়াটা প্রতি সকাল থেকে সন্ধ্যা ইয়াকুব খাঁর মতো বুড়ো মানুষটিকেও কবর ছেড়ে পালাতে ফুঁসলায়। মহাসড়কের খানিক দূরে রেল-লাইন—সমান্তরাল। সেই সময় ট্রেনের শব্দ শোনা গেলে ইয়াকুব খাঁ ফটক বন্ধ করে ফিরেছিল।

কানের ভুল হতে পারে। চোখের ভুল যেমন হয়! কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে আজ অব্দি এই বিরাট ধ্বসে-পড়া নবাবী মসজিদ আর দালানবাড়ি উঁচু পাঁচিল ঘেরা কবরখানায় তার জীবন কাটছে, তার বাপের কেটেছে, তার বাপের এবং তারও বাপের—ইয়াকুবকে কেউ ডাকেনি। সারাদিন ফটক খোলা থাকে। সবার দ্বার অবারিত কত মানুষ আসে। মুখসুদাবাদ রিয়াসতের খোজাদের কবরখানা দেখতে আসে। হরেক রকম মানুষ। পুরুষমানুষ, মেয়েমানুষ। কত রকম গায়ের রঙ। জীবন্ত, ঝলমলে, তুখোড়, হল্লাবাজ। খোজা নবাবী কী আমিরের সাদা টুটা পাথরে বাঁধানো কবরে বসে সিগ্রেট খায়। ফুল তুলে মেয়েরা খোঁপায় গোঁজে। বেলেল্লাপনা করে। কুতকুতে চোখে তাকিয়ে দ্যাখে বুড়ো খিদমদ্গার ইয়াকুব খান। রাগে গা জ্বালা করে। বেশরম আউরত। অসহ্য লাগলে সে গোমড়া-মুখে বলেই ফেলে, বহুত্ খুব হয়েছে হুজুরেরা, আওর কী দেখবেন এখানে? ইয়ে তো মামুলী কবরখানা হ্যায়—খোজা লোগোকা গোর। ঔর কুছ নেহী! জী। হাঁ।.....;

অসহ্য তবু ভালো লাগে। ভালো লাগে রাতের দিকে—যখন নির্জনতা থমথম করে, ঝিঁঝিঁ ডাকে দিনের সেই সব দৃশ্যগুলো চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসে। আঃ হা! ইয়ে তো হ্যায় জিন্দেগানী এই তো হচ্ছে জীবন! সারাটি দিন জীবনই দেখেছে সে। এখন রাতে শুধু মৃত্যুর স্বাদ। মৃত্যুকে অনুভব করা। চারপাশে মৌতকা

অন্ধেরা ঔর মৌতকা ঠাণ্ডে! মৃত্যুর অন্ধকার, মৃত্যুর শীতলতা শুরু। এবং তখনই দিনের রোদের প্রজাপতির মত সেই ফুটফুটে সুন্দর যুবক-যুবতীদের কথা তার মনে পড়ে যায়। আফসোসে ঘুম আসে না। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে ইয়াকুব খাঁর……

বড় বড় ঘরগুলো সব ধ্বসে পড়েছে। দরজা-জানালা কোনটার খুলে নিয়ে গেছে চোরে—কোনটার বা অন্য কেউ! বারণ করতে মন চায় না ইয়াকুবের। নিচ্ছে নিক। যা কাজে লাগে, নিক। তবে কৈফিয়ৎ দিতে হয় প্রাণান্ত বেচারার। জামিলা খাতুন—ওর বউ এখনও বুড়ো হয়নি। সে বলে, পাকড়কে লে যায়ে গা তুমকো—হ্যাঁ! কয়েদ হোগা! ··ইয়াকুব ম্লান হাসে। কয়েদ হলে জামিলা আর তার ছেলে নশরত খাঁ ভিক্ষে করবে। তো তামাম মুখসুদাবাদ জিলামে এহী মামুলী আদমীকা নসীব হ্যায়! ভিখ মাঙার নসীব। ···অবশ্য সারা মুর্শিদাবাদ জিলা দ্যাখেনি ইয়াকুব। এমন কি লালবাগ শহরটাও ভাল করে দ্যাখেনি। সময় কোথায় তার? সারাদিন ট্যুরিষ্টবাবুরা আসে-যায়। তোতা পাখির বুলি বলতে বলতে সামনে হাঁটে সে—ফিব, ইয়ে দেখিয়ে, খোজা নবাববাহাদুর হাসমত মীরজাকা কবর ··ঔর ইয়ে খোজাসরদার মীরজা মহম্মদ দানেশকা···ঔর ··

দেয়ালঘেরা কবরখানা আর কেল্লার মত প্রকাণ্ড ভাঙা দালানের চারপাশে জঙ্গল। অজস্র ধ্বংসস্তূপ। ধারে কাছে কোন বসতি নেই। অদূরে মুরশিদকুলী খাঁর কবর—কাটরা মসজিদ। কবরখানার পিছনে উঁচু দেয়ালঘেরা পুকুর আছে। শ্যাওলাভরা সবুজ জলে ইয়াকুব খাঁর দুরন্ত ছেলে সাঁতার কাটে। ইয়াকুব তাড়া করে ছেলেকে। ···জলদী বে, জলদী নাহানা। ইস্কুলকা দের হো যায়ে গা! ···ছেলে কিন্তু বাংলা বুলি বলে। কাটরা মসজিদের পাশে পাঠশালায় পড়তে যায়। আহা-হা, দুধের বাচ্চা—পাখির স্বরে পড়া বলে। ···তো ইয়ে হ্যায় জিন্দেগী কী রোশনি। জীবনের

প্রোজ্জ্বল বাতি! ইয়াকুব খাঁ মধ্যরাতে ছেলের গায়ে হাত রেখে ভাবে, একদিন নশরত বড় হবে! বাবা-মাকে নিয়ে যাবে সুন্দর একটা ঘরে—যার চারপাশে কবরখানা নেই। সে চাকুরী করবে —বাপের মত নচ্ছার চাকুরী নয়, কবরখানায় নয়, জ্যান্ত মানুষেরা যেমন করে, ঠিক তেমনি। সে ভূতের প্রহরী হবে না। ভূতের ঘরে থাকবে না।

তবে, ডাকল কে? নির্জন বসতিহীন এ কবরখানায় এত রাতে কার দরকার হল ইয়াকুব খাঁকে। বিছানায় শুয়ে সে অনেকক্ষণ ভাবছিল। কানের ভুল ছাড়া কিছু নয়। সারাজীবন কবরখানায় যার বাস—সে ভূত আছে মেনেও ভূতের ভয় করে না। ইয়াকুব খাঁ অনেক রাতে ছোট্ট কবরখানাটার ওই প্রাঙ্গণে কাকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে—হাঁ, স্পষ্ট দেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাড়া দিয়েছে, যাঃ শো যা চুপসে নিদ যা। অশান্ত ব্যর্থ খোজাদের ভূতগুলো হয়ত সারা রাত সারা দিন ছটফট করে। এই তার ধারণা। কত জওয়ানী আসে—তাদের বুকের ওপর বসে ফুল ছেঁড়ে! গোরের ভিতর আফসোসে নড়ে খোজার আত্মা। দেহ দিয়ে দেহ ছুঁতে যায় হয়ত। ছোঁওয়া যায় না! কী দুঃখ, কী যন্ত্রণা বেচারাদের!······

ইয়াকুব খাঁ এই সব কথা ভাবছিল। খোজাদের কথা। তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা। আহা, খোদাতালা মানুষকে তো একবার মাত্র একটাই দেহ দেন! ইয়াকুব খাঁ মোনাজাত করছিল খোদার কাছে, ওরা যেন প্রত্যেকে একটা করে সুন্দরী হুরী (অপ্সরা) পায়। ওদের শান্তি হোক। ওদের জিন্দেগীর তৃষ্ণা তৃপ্ত হোক! ······

হঠাৎ অস্পষ্ট ধুড়মুড় আওরাজ হল কোথায়। ইট-চুন-বালি ঝর ঝর করে খসে পড়ল! শেয়াল? তাই হবে। কিন্তু পরক্ষণে অস্পষ্ট কথাবার্তারও আওয়াজ শুনে চমকে উঠল ইয়াকুব। ওদিকে সারবন্ধ কয়েকখানা ঘর আছে। কোনটির ছাদ আছে, কোনটার নেই। ভিতরে ঘাস আর আগাছা—কোথাও যদি বা শূন্য, সারা

মেঝেয় জীবজন্তুর নাদি ছাড়ানো। ইয়াকুব ফের বিকৃত মুখে উঠল। লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে বেরল সে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কান পাতল। হ্যাঁ, কারা চাপা স্বরে কথা বলছে। শরীর শিউরে উঠল তার। মানুষ, না ভূত ওরা? কাঁপান গলায় চেঁচাল সে, কৌন্ কৌন্ হ্যায়?

সঙ্গে সঙ্গে চুপ। ইয়াকুব লণ্ঠনটা তুলে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামল। ওদিকেব ঘরের সামনে গিয়ে এদিক ওদিক আলো ঘুরিয়ে দেখবাব চেষ্টা করল। কিছু দেখতে পেল না। কিন্তু কথা বলার আওয়াজ সে স্পষ্ট শুনেছে। এটা কোনমতে ভুল হতে পাবে না। ধ্বংসস্তূপেব ওপর সাবধানে পা বাড়াল সে। শীতের মধ্যেও ঘাম দেখা গেল তার কপালে। তুলোর কম্বলটা গরম হয়ে উঠল যেন। শেষ প্রান্তের ঘুপটি ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে যারা, তারা মানুষ। মানুষ—কারণ এখানের ভূত অমন পোশাক পরে না। প্যান্ট-কোট আর শাড়ি। একজন পুরুষ, অন্যজন মেয়ে। দরজার ভিতর লণ্ঠনটা উঁচিয়ে মুহূর্তে সে চিনতে পেরেছে ওদের। দিনের সেই বেলেল্লা লড়কা-লড়কী!

ইয়াকুবের মুখটা বিকৃত হাসিতে ভরে উঠল। ···তো আপ হেঁয়া! ·····হিসহিস করে বলল সে, ইয়ে ঠিক নহী, ঠিক নহী। খান্দান আদমীকা গোরস্তানমে আপলোগ ক্যা মতলবসে আয়া? এত্তা—রাতমে?

যুবকটি হাসছিল।······আবে এস, এস খাঁসাহেব। বিদেশী মানুষ, কোথায় আর যাব বলো তো। তখন তোমায় অমন করে বললাম; রাত্তিরটার মত জায়গা দাও—দিলেও না। কি বেয়াড়া দেশ রে বাবা! কেউ জায়গা দিতে চায় না। অগত্যা কী আর করি, তুমিই বলো খাঁসাহেব?

যুবতীটিও নির্লজ্জের মত হাসছে। ·একটা মাদুর দেবে? কিছু ভাড়া নেবে বরং। সকালে বাস ধরে আমরা লালগোলায় পদ্মা দেখতে যাব।

ইয়াকুব কী বলবে, ভেবে পাচ্ছিল না। না, এমন কাণ্ড তার জীবনে কখনো ঘটেনি। দিনের বেলায় যে টুরিষ্ট দলটি এসেছিল —একটু দেরী করেই এসেছিল—সন্ধ্যার সামান্য আগে, তাদের মধ্যে ছিল এরা। যেন দলটাকে ফাঁকি দিয়ে এরা ছুটিতে কেটে পড়বার মতলবে ছিল। কারণ ওরা সবাই বেরিয়ে গেলে কবরের পিছনের ফুলের ঝোপ থেকে আচমকা এদের আবির্ভাব। ছ'টায় দেউড়ি বন্ধ করে দিতে হবে। ইয়াকুব সে কথা বলতেই ওরা রাতের আশ্রয় চেয়েছিল। থাকবার মত জায়গা নেই—তাছাড়া···তাছাড়া ওদের কমন বেলেল্লা মনে হচ্ছিল তার। দলের আড়ালে পরস্পর হাত ধরাধেরি, এমন কি ঝোপের ভিতর চুমু খেতেও দেখেছিল সতর্ক ইয়াকুব। মানুষ এমন বেহায়া হতে পারে! ওরা যে স্বামী স্ত্রী নয়, তাও মালুম হয়েছে তার। বাঙালী হিন্দু জেনানা লোক সিঁথিতে সিঁদুর পরে। মেয়েটির সিঁথি লক্ষ্য করেছিল সে। সিঁদুর নেই। তাজ্জব!······

ইয়াকুব ঘড় ঘড় করে বলল, হামি গরীব আদমী বাবু। রাতমে এত্তা পেরেসানী দিতে এলেন কেন? শহরমে যান হোটেল আছে বহুত। শহরমে বহুত ভদ্দব আদমি ভি আছে। সবাই জায়গা দেবে। ইয়ে গোরস্তানমে কাহে আপলোগ থাকবেন?

যুবকটি পকেট থেকে একটা পাচ টাকার নোট বের করল। তোমার বখশিস, ইয়াকুব খাঁ। বড্ড বিপদে পড়েছি তা না হলে কি এখানে আসি আমরা? তুমিই ভেবে ছাখ।

বিপদটা কী ভেবে পাচ্ছিল না ইয়াকুব। পাঁচ টাকা বখশিস্! কবরখানায় এই প্রহরী—যে ট্যুরিষ্টদের কাছে গাইড হয়ে ওঠে, তাকে বড়জোর দু-চার আনা কেউ দিয়ে যায় দয়া করে! আর ওই পাঁচ টাকা দিলে লালবাগের যে কোন হোটেলওয়ালা ওদের থাকতে দিত। এই শীতে লেপ-কম্বলও দিত। তবে কেন এ কবরখানায় থাকবার জেদ ওদের? সে বলল, কুছ সমঝমে নেই আতা বাবুজী! আপ লোক হোটেলমে যাইয়ে।

যুবতীটি ম্লান হাসল। ···এত রাত্রে ঠাণ্ডার মধ্যে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ ইয়াকুব। তুমিও তো মানুষ।

তর্ক করতে ভালো লাগছিল না ইয়াকুবের। সে বিরক্ত কণ্ঠে বলল, এ কি আপনাদের মতন আদমির জায়গা আছে হুজুর? জংলী গোরস্থান। সাপ আছে, বাঘভি আছে। তো কই খারাপ হয়ে গেলে যত পেরেসানী হামার হবে!

যুবকটি এবার গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ঠিক আছে। আমরা কিন্তু থাকছি। পারো তো জোর করে বের করে দাও।

কী নাছোড়বান্দা রে বাবা! ইয়াকুব গজ-গজ করতে করতে ঘরে এল। গোল্লায় যাক্ ওরা—তার কী?' গায়ের জোরেও এঁটে ওঠা যাবে না। জওয়ান লোক। তাক্দ আছে গায়ে। ইয়াকুব বুড়ো হয়েছে। তাছাড়া চেঁচামেচি করে তো লাভ নেই। কে শুনতে পাবে? আশেপাশে কোন বসতি নেই যে বিপদে-আপদে লোকের সাহায্য পাবে সে।

স্তূপগুলোয় সাবধানে পা ফেলে নামবার সময় হঠাৎ তার মনে হল, টাকাটা নিয়ে এলেই ভালো হত। পাঁচ-পাঁচটা টাকা! মাসে তিরিশ টাকা মাইনে পায় সে। এ বাজারে কী কষ্টে যে দিন কাটছে বলার নয়। জামিলা শুনলে তাকে বকবে। তার আক্কেলের নিন্দে করবে। ওই টাকায় কালকের দিন কী পরের দিনটিও হেসে-খেলে কেটে যেত! আফসোস লাগে।

নিজের ঘরে বারান্দায় এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সে। টাকাটা চোখের সামনে অন্ধকারে উড়ছে তাজা প্রজাপতির মত। যেন গায়ে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে বারবার। তুলোর কম্বলটা গরম হয়ে উঠেছে। ফের গিয়ে বেহায়ার মত চেয়ে বসবে নাকি?··· বরং······

বুদ্ধি জেঁকে উঠল মগজে। বরং একটা কাজ করা যেতে পারে। বারান্দার এক কোণে পাটকাঠির বোঝা আছে একটা।

জামিলা আশেপাশের এলাকা ঘুরে দিনমানে এগুলো সংগ্রহ করে আনে। এ তল্লাটে প্রচুর পাটের চাষ হয়। নালায় বা খালে-ডোবায় চাষারা পাট পচাতে দেয়। কিনারায় প্রচুর ভাঙাচোরা পাঠকাঠি পড়ে থাকে। চুপি চুপি সেগুলো নিয়ে আসে গরীব-দুঃখী মানুষেরা। ইয়াকুব খাঁ খাঁটির মানুষ—চোর নয়, বদমাস নয়। তার বউ চুরি করবে, এটা সে অপছন্দ করে। কিন্তু উপায় কী? চোখে দেখেও তো সব মেনে নিতে হয়।

এও সেই রকম। মেনে নিতে হবে ইয়াকুবকে। ওই মানুষ দুটিকে সে এক বোঝা পাঠকাঠি দিয়ে আসবে। বলবে, এর ওপব শুয়ে নিদ যান। একটা বাড়তি মাদুর বা তালাই থাকলে দিতাম। নেই। বউ যা একটা বোনে, বেচে আসে বাজারে। বড কষ্টে বাস করি হুজুর।

···হ্যাঁ ওনাদের জাড় ভি লাগবে। তো কী করা যায়? হামার কম্বল ভি নেই একটা। কাঁথা আর চট আছে। দোঠো বালিশ আছে। ঠিক হ্যায়! এক বালিশ আপনাদের দিচ্ছি। ঔব পছন্দ হলে হামার চট লিন।

নিঃশব্দ হাসিতে ইয়াকুবের তোবড়ানো মুখটা ফুলে ফুলে উঠতে থাকল।···গা জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকবে দুই মর্দনা-ঔরৎ। তারপর ওরা···তারপর···হাসিটা আওয়াজে ভাঙল এবার—খিক্ খিক্ খিক্ খিক্। ···বড়া তাজ্জব লাগে। এমনি করে বাচ্চা জন্মায় দুনিয়ায়। দুনিয়ায় বাচ্চা জন্মাবে বলে আদমিরা নিরালা ঘর খুঁজে বেড়ায়। আফসোস! কে ঘর পায় কে পায় না। ওরা পায়নি। তাই ওরা চলে এসেছে খোজাদের কবরখানায়। জানোয়ারের নাদির ওপর শুয়ে পড়তে চাচ্ছে। বাচ্চার জন্ম দেবে বলে দুটি মানুষের খুন টগবগ করে ফুটবে যৌবনের উত্তাপে।

দেব, হামি ঘর দেব আপনাদের। হ্যাঁ মৌতের আন্ধাব ঘরে জিন্দেগীর রোশনি জালুন হুজুর-হুজুরাইন!

তারপর পাটকাঠির বোঝা, নিজের বালিশ আর চটটা নিয়ে ইয়াকুব দরজার কাছে যেতেই হুড়মুড় করে উঠে বসেছে দুটি মানুষ। লণ্ঠনটা দম বাড়ানোর ফলে অকেজো হয়ে উঠেছে ততক্ষণে, কাঁচে ঘন কালি জমেছে। স্পষ্ট কিছু নজরে পড়ে না। তবু ইয়াকুব দেখতে পেল দৃশ্যটা। পোশাক-আশাক বিছিয়ে ওরা শুয়ে ছিল দুটিতে। এত শীত! তবু ওদের নগ্ন দেহ দুটো যেন ঘামে চকচক করছিল। ইয়াকুব মুখ ফিরিয়ে দাড়াল। লজ্জিত কণ্ঠস্বরে বলল, থোড়া বিস্তারা কা বন্দোবস্ত করেছি হুজুর। তকলিফ্ হলেও নাচার।

পুরুষটি গর্জে উঠেছে ততক্ষণে।··যাও, যাও বলছি এখান থেকে। ভুত কোথাকার!

শের হয়ে উঠেছে জওয়ান আদমী। সে তো ঠিকই। এখন ওনার মধ্যে জানোয়ার জেগে উঠেছে। বুড়ো ইয়াকুবকে থাবায় পিষে ফেলবে। নখে বুকটা ফেড়ে দেবে একেবারে। ··তবু ইয়াকুব লুকিয়ে হাসছিল। ··বিস্তারা হেঁয়া থাকল হুজুর। হামি যাই। আরামসে নিদ যান।

নাঃ বখশিসটার কথা এখন তোলা যায় না। উচিত নয়। জিনিসগুলো দরজার সামনে দুদ্দাড় নামিয়ে রেখে ব্যস্ত পায়ে চলে এল সে। লণ্ঠনটা সাফ না করলে আর কিছু দেখা যাবে না। বারান্দায় বসে ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে ফেলল সে। মুহূর্তে সারা কবরখানা ঘন অন্ধকারে গভীর হয়ে উঠল। কুলুঙ্গী হাতড়ে কিছু পাটের ন্যাতা আনল সে। কাঁচ ঠাণ্ডা হবার অপেক্ষায় বসে রইল। সামনে বারান্দার নীচে খোজাদের কবর। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, প্রতিটি কবরে ভূতগুলো দেহ পাবার জন্যে ছটফট করে উঠছে। আর এ কী তাজ্জব! সেই সব ভূতেরা এসে পড়েছে তার কাছে খুবই কাছে। বড় ঠাণ্ডা তাদের অস্তিত্ব। পা বেয়ে, জানু-উরু তলপেট পেরিয়ে, বুক

থেকে গলা ঠোঁট মগজ অব্দি পোকার মত কিলবিল করে নড়ছে। সমস্ত দেহ হিম হয়ে উঠছে ক্রমাগত। হিমে আড়ষ্ট ইয়াকুব সাঁতার কাটছিল—অসহায় নড়াচড়া, কাকুতি, আগুনের জন্যে আর্তনাদ। অথচ গলা দিয়ে স্বর ফোটে না কোন মতে। দশ বছর আগেও ইয়াকুব তার মধ্যবয়সী বিবির গলা জড়িয়ে শুয়ে থেকেছে। নিভন্ত আগুনের সামান্য তাপে শেষ পুলক অনুভব করেছে। হায় এখন শুধু ছাই আর ছাই। ছাই আর হিম। ওই কবরে শুয়ে থাকা মানুষগুলোর দলে চলে গেছে ইয়াকুব। কে যেন ক্রমাগত ফিসফিস করে বলছে, ঔর ইয়ে গ্যায় খোজা ইয়াকুব খাঁ কা গোর······

পাটের ন্যাতা রেখে উঠে দাঁড়াল সে। মনে হল চারপাশের গাছপালা বনজঙ্গল জুড়ে অদ্ভুত ঝড় শুরু হয়েছে। কবরখানা নড়ছে। গাছগুলো দুলছে। পিছনের মসজিদের গম্বুজটা ভেঙে পড়ছে দুচালা চৌচির হয়ে যাবার মত এক প্রচণ্ড আলোড়ন অন্ধকার রাতটাকে তছনছ করে ফেলেছে। পায়ের নীচে মাটি দুলছে। বারান্দার থামটা আঁকড়ে ধরল সে। অস্ফুট বোবায়-ধরা স্বরে চিৎকার করে উঠল, বহু, জামিলা খাতুন।

পরক্ষণে ভয়ঙ্কর আওয়াজ হল খুব কাছেই। আড়াই শো বছরের কবরখানার অবশিষ্ট জীর্ণ দালানটা হঠাৎ মুছে গিয়ে দক্ষিণের ঢাকা আকশটা খুলে দিল। ধুলোর ঝড়ে ভেসে চলেছে ছোট-বড় উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল অজস্র নক্ষত্র হয়ত জামিলাই চেঁচিয়ে উঠেছিল, তফাৎ যাও তফাৎ যাও!

* * * *

গল্পটা শেষ করে মুর্শিদাবাদ খোজা কবরখানার প্রহরী ইয়াকুব একটু হাসল। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ···হা সাহাব, ওই ঘরগুলো মেহমান আর মোল্লামৌলবীদের জন্যে বানিয়েছিলেন নবাব। সেই মাঝরাতের 'ভুঁইকম্পে' সব ধ্বসে যায়। আর মেরামত হয়নি। কী হবে বলুন। মুর্শিদাবাদে তো শুধু কবর আর কবর। শুধু কবর

দেখতেই লোক আসেন। আর তো কিছু নেই। যেটুকু আছে, জলদি সেইটুকুও খতম হয়ে যাবে। তারপর……

বললাম তোমার ছেলে কই? কোন্ ক্লাসে পড়ে?

ইয়াকুব বলল, ছেলে কলেজে পড়ছে হুজুর। খরচ কোন রকমে নিজেই চালাচ্ছে' থাকে বহরমপুরে। শনিবার বিকেলে বাড়ি চলে আসে। সোমবার চলে যায়। খুব 'হেট্ওয়ালা ছেলে হুজুর। হাঁ—'কলারশিপ' পেয়েছিল একজামিনে। তবে সামনে বার আর এসে হামাকে দেখতে পাবেন না। ছেলের চাকরী হলেই নিয়ে পালাবে এ ভূতের ঘর থেকে। এখানে কি আদমি থাকে হুজুর?

একটু চুপ করে থেকে বললাম, আচ্ছা ইয়াকুব, ঘরগুলো ধ্বসে পড়েছিল দেখছি। ওগুলো কেউ সরায়নি নিশ্চয়। সবাই তো ওদের দেখতে পেত।

ইয়াকুব ঘাড় নাড়ল। নির্বিকার মুখে বলল, কী দরকার? আমি কাকেও বলিনি ওনাদের কথা। ওনাদের আত্মীয়কুটুম্ব শরমে পড়তেন। পড়তেন না হুজুর?

এত নিষ্ঠুর এই লোকটা! আমার খুব খারাপ লাগল এতক্ষণে। দুটি যুবক যুবতী ওই ধ্বংসস্তূপে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেছে, কাকেও সে কথা জানায়নি সে। নাকি সবটাই বানানো গল্প? হয়ত আমায় যেমন, আরো কতজনকে এই গল্প বলে চমক লাগিয়েছে ইয়াকুব।

সম্ভবতঃ তাই। ইয়াকুব আমাকে একটা মজাদার গল্প শুনিয়েছে মাত্র। কিছুক্ষণের মধ্যে এই বিশ্বাসটা দৃঢ় হল মনের ভিতর। হাসতে হাসতে বললাম, তুমি লেখাপড়া জানলে জব্বর কিতাব লিখতে পারতে ইয়াকুব খাঁ। খুব চমৎকার গপ্ শায়েরী করতে পারতে!

কাহে? ইয়াকুব বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

তারপর উঠে দাঁড়াল সে। বলল, ঠিক হ্যায় আসুন। আপনি বহুত শরীফ আদমি। ঔর আপনাকে বলতে ভি হামার ইচ্ছা হল। কিসিকো এ বাত হামি বোলেনি হুজুর, খোদাকসম। আইয়ে—দেখিয়ে।

দক্ষিণ পূর্বের ধ্বংসস্তূপের পাশে একটা মাত্র দেয়াল খাড়া হয়ে আছে। সেখানে আঁকা-বাঁকা হরফে নাম লেখা আছে অনেকগুলো। একদা ট্যুরিষ্টরা এসে লিখে গেছে। এখন এদিকে কেউ আসে না। এলে কবর দেখেই চলে যায়। ইয়াকুব আঙুল তুলে দেখাল—দেখিয়ে!

মুহূর্তে আমার গা শিউরে উঠেছে। পা কাঁপতে লেগেছে। ইটের স্তূপের ফাঁকে আগাছার ঝোপ। তার শেকড়ে জড়ান একরাশ ধূসর চুল। তার পাশেই একটা মড়ার মাথা। কিছু হাড়। ইটগুলো কবে কে হয়ত সরানোর চেষ্টা করেছিল। সে চিহ্ন স্পষ্ট। ইয়াকুব হাঁটু দুমড়ে বসে কয়েকটা ইট আর চুন সুরকীর পিণ্ড সরাতে থাকল। মাকড়সার জাল উইঢিবি ঝোপ। তার নীচে আরেকটা মড়ার মাথা এক টুকরো ধূসর কাপড়। কাপড়ের টুকরোটা আমার হাতে দিয়ে সে বলল, ক্যা দেখ্ রাহা?

গুঁড়ো হয়ে গেল কাপড়টুকু। কিছু পেলাম না। মুণ্ডু দুটোর দিকে তাকালাম। দেহের জন্যে রক্ত-মাংস বাসনা-কামনা আর প্রেম ভালবাসার জন্যে একটা গভীর আকুতি আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। দৌড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। পারছি না।

সযত্নে ঢেকে দিলে ইয়াকুব। তারপর হাত দুটো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। সাদা ভুরু। সাদা গোঁফদাড়ি, তোবড়ানো বিবর্ণ মুখ—আর চোখের কোণায় পিচুটি ছাপিয়ে জল ঝরছে। দাড়ি ভিজে যাচ্ছে বুড়ো প্রহরীর। ...হ্যাঁ ইয়ে আফসোস জিন্দেগীকা।... মাথা বার বার নাড়ছে দুপাশে। —আদমি এইসী তারাহ্ (এমন করে) ঘর ছোড় রাহা দুনিয়ামে। হা খোদা!

ঘর। মানুষেরা জন্ম দিতে চায় বলে, মানুষেরা জন্মাবে বলে মানুষেরা ঘর চুঁড়ে ফিরছে। নিভৃত নির্জন ঘর। প্রকৃতির গভীরে যেখানে উইঢিবি, জানোয়ারের নাদি, ব্যাঙের ছাতা, ঐতিহাসিক পুরানো দালান। তবু কে পায়, কে পায় না। কে পেয়েও সব হারায়।

বললাম, চলি ইয়াকুব। তিনটেয় ট্রেন। সে মুহূর্তে ঘরের জন্যই আমার মনে তাড়া লেগেছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আধুনিক কালের বাংলা কথা-সাহিত্যে মুস্তাফা সিরাজ একজন স্বতন্ত্র ভঙ্গির লেখক। গ্রামবাংলায় লালিত এবং দীক্ষিত মানুষটির অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বহুমুখী। তাঁর রচনায় রহস্য শিহরণ খুব সূক্ষ্মভাবে সঞ্চারিত থাকে। মানব জীবনের অন্তর্লীন অলৌকিকতা ঘুরে ফিরে আসে তাঁর নানা কাহিনীতে। ভৌতিক গল্প রচনায় একটি সহজাত প্রবণতা তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। সিরাজের ভাষা এবং বর্ণনা-ভঙ্গি অত্যন্ত প্রাণবন্ত। মানুষের বিভিন্ন দুর্বলতা এবং ট্রাজেডি তিনি অলৌকিকত্বে উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন। তরুণ কথাকারদের মধ্যে অন্যতম। এই লেখকের জন্ম হয় ১৯৩০ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার খোসবাসপুর গ্রামে। আবাল্য গ্রাম্য পরিবেশে বর্দ্ধিত লেখক গ্রাম বাংলার বহুমুখী বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়েছেন। পরিণত বয়ঃক্রমে কলিকাতাবাসী লেখক নগরজীবনের অভিজ্ঞতাও লাভ করেছেন। সবুজ মাঠ, হিজলের শস্যক্ষেত্র আর গ্রাম বাংলার সাধারণ ও অসাধারণ মানুষগুলি লেখকের নিজস্ব বর্ণনায় ভাস্বর। তাঁর রচনার ধারা যেমন বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, তেমনিই বেগবান।



অতিন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা ফিরছি কার্ডিফ থেকে। ব্রাজিলের ভিক্টোরিয়া পোর্ট-থেকে আকরিক লৌহ নিয়ে আমাদের জাহাজ এস. এন. এডেন ব্যাঙ্ক এসেছিল কার্ডিফে। ভিক্টোরিয়া থেকে উনচল্লিশ ডিগ্রী বরাবর জাহাজ চালিয়ে কার্ডিফে এসেছিলাম। আকরিক লৌহ নামিয়ে জাহাজ ড্রাই-ডক করতে যা কিছু সময় এবং তারপরেই ফের খালি জাহাজ নিয়ে নেমে এসেছিলাম ওয়েস্ট-ইন্‌ডিজের পোর্ট অফ জামাইকাতে। কিছু রসদ নেওয়া হল, জল এবং বাংকার। পরবর্তী বন্দর মিসিসিপির নদীর মোহনা ছাড়িয়ে। একটা ছোট্ট খাড়ি নদী পাওয়া যাবে। সেই নদী ধরে ঢুকে গেলে পোর্ট অফ-সালফার। সালফার নিয়ে আ[illegible]ন্দর যাত্রা নিউজিল্যাণ্ডের রাজধানী অকল্যাণ্ড বন্দরে। এবং এভাবে ভিক্টোরিয়া থেকে ইংলণ্ডের কার্ডিফ, কার্ডিফ থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রায় তিন মাসের ওপর সময় এবং এভাবে যাত্রা ক্যারাবিয়ন সমুদ্র ধরে, এবং এভাবে জাহাজ আরও আট ন' দিন চালিয়ে নিতে হবে, তখন জাহাজীদের বেশ কষ্ট। কারণ এই যে জাহাজে ক্যানেল পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়বে এবং কবে ফেরা যাবে দেশে যখন কিছু ঠিকঠাক নেই তখন জাহাজীরা খুব ম্রিয়মান, জাহাজে কিছু একটা ঘটলে বাঁচা যায়। কবে যে জাহাজ নিয়ে বের হয়েছি। সেই প্রায় চৌদ্দ পনের মাস আগে, আমাদের আর এভাবে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগছে না। তাছাড়া জাহাজে কি একটা হয়েছে, সবারই একটা ভয়াবহ অসুখের মতো। ভালো ঘুম

হচ্ছে না কারো। পীড়িত চোখ মুখ, দীর্ঘদিনের সফরে এমন হয়ে থাকে অবশ্য। সবচেয়ে মজার কথা ট্রানসমিটারে সামান্য গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। রেডিও অফিসার মাঝে মাঝে দৌড়ে আসে। ক্যাপটেনকে কী সব খবর দিয়ে যায়। এবং ক্যাপটেনের চোখে মুখে ভারি উদ্বেগ। এসব দেখে আমরা খুব ঘাবড়ে গেছিলাম। ঝড় সাইক্লোন কিছু একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে। অথবা পৃথিবীর কোনো সমুদ্র গভীরে হয়তো নিমজ্জমান আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটাচ্ছে। কিন্তু মজার ঘটনা, দুটো দিন বেশ কেটে গেলো। জাহাজের চার পাশে নীল সমুদ্র উপরে নীল আকাশ এখনও দুটো একটা এ্যালবাট্রস পাখীর ডাক, ওদের উড়ে যাবার শব্দ অথবা ডলফিনের ঝাঁক দূরে দূরে। তাছাড়া এক বিকেলে দুটো তিমিমাছকে দূরে মিটিং করতে দেখলাম। ওদের মিটিংয়ের সময় বলেই জাহাজের শব্দে ওরা পালিয়ে যায়নি। আসলে ওরা মিটিংয়ের সময় ভীষণ একগুঁয়ে হয়ে যায়। তোয়াক্কা করে না কার পাশে কি ঘটছে। আমরা সবাই বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। একবার দূরে সরে যাচ্ছে, আবার জাহাজের পিছু পিছু এগিয়ে আসছে, আবার সমুদ্র কাঁপিয়ে জলের ওপর প্রচণ্ড ঘূর্ণি তুলে ওরা কী যে অতিকায় এবং ওদের সেই মিটিংয়ের সময় কি যে আশ্চর্য সব ভঙ্গী ইতিহাসের পাতায় তা লেখা আছে কিনা জানা নেই। আমরা কিন্তু দেখে ফেললাম, ভারি নীল রংয়ের তিমি মাছের খেলা, সেই আশ্চর্য নীল সমুদ্রে আমরা যখন দেখলাম সমুদ্রে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এবং একরকম নিরিবিলি শান্ত সমুদ্রে ওরা ডুবে গেছে, সমুদ্রের গভীর ডুবে, অসহায় অন্ধকার লুকিয়ে পড়ছে তখন, আমরাও যে যার ফোকসালে ঢুকে গেছিলাম· মনে হয়েছিলো, কোনও ভয় নেই আর। সমুদ্রে সাইক্লোন উঠছে না। আমাদের জাহাজ আবার একদিন না একদিন বন্দর পেয়ে যাবে।

কিন্তু ঠিক তখন সাড়ে আটটা বাজে, রেডিও-অফিসার ক্যাপ-

টেনকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। মাংকি আয়ল্যাণ্ডে ওরা উঠে গেল। এবং ওরা কান পেতে কি শুনল। ক্যাপটেন, চিফ-অফিসার সবাই সেই সব শব্দ শুনে হঠাৎ এনজিনরুমে এলার্ম বাজিয়ে দিল। কাছে কোথাও কোন জাহাজে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। একটু ধীবে জাহাজ চালাতে হবে।

কিন্তু ক্যাপটেন অথবা চিফ অফিসার ভেবে পেল না এরিয়া স্টেশন থেকেই ওদের খবর পাওয়ার কথা। রেডিও অফিসার সঙ্গে সঙ্গে এরিয়া স্টেশনকে ধরার চেষ্টা করল। আশ্চর্য! এরিয়া স্টেশনকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

অবাক! সকালেও সে টি, তার পাঠিয়েছে। অর্থাৎ জাহাজের নাম, কোম্পানীর নাম কত জি, আর, টি, কত এন, আর টি এবং কোন কোস্টে জাহাজ যাচ্ছে, স্পীড এবং নেকসট পোর্ট অফ কল কি, সব জানিয়েছে। অথচ এখন এরিয়া স্টেশনকে ধরতে পারছে না। নানাভাবে চেষ্টা করেও পারছে না। এবং কি যে হয়ে গেছে, ওরা কি ভুল করে অন্য সমুদ্রে ভেসে এসেছে! কমপাস কি ঠিক রিডিং দিচ্ছে না? কিউ টিজি বারবার চেয়েও যখন বিফল তখনও দেখছে স্পিসিভারে সেই হাহাকার চারপাশে আগুন লাগলে জাহাজী যেভাবে আত্মরক্ষা করে থাকে অথবা চিৎকার চেঁচামেচি এবং বাঁচাও বাঁচাও বলে থাকে, তারপর একটা প্রচণ্ড দাবদাহের মতো বিস্ফোরণের শব্দ যেন কোনো জাহাজে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে একটা দিক উড়ে গেছে—এমন সব শব্দ পেয়ে ওরা সবাই ঘাবড়ে গেল। ওরা বাইরে এসে কোথাও কিছু দেখল না। শুধু সাদা জ্যোৎস্না নীল সমুদ্রে। শান্ত নিরিবিলি সমুদ্র। এবং পৃথিবীতে মনোরম জ্যোৎস্না এমন জ্যোৎস্নার সমুদ্র কোথায় কোনো জাহাজে অগ্নিকাণ্ড অথচ এরিয়া ষ্টেশনকে ধরতে পারছে না। নানাভাবে চেষ্টা করেও পারছে না। এবং কি যে হয়ে গেছে ওরা কি ভুল করে অন্য সমুদ্রে ভেসে এসেছে, কম্পাস কি ঠিক

রিডিং দিচ্ছে না ? কিউ টি জি বার বার চেয়েও যখন বিফল তখনও দেখছে রিসিভারে সেই হাহাকার। ওরা প্রায় ভয়াবহ ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে, আমরা নীচু তলার জাহাজী, আমরা ওদের মুখ চোখ দেখে এসব বুঝতে পারছিলাম। অথচ কিছুই ওরা আমাদের প্রকাশ করছে না। গোপনে গোপনে ওরা কেবল ডেকে অথবা ব্রীজে অথবা মাংকি আয়ল্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে দূরবীনে এই সাদা জ্যোৎস্নায় কিছু দেখার চেষ্টা করছে। এবং আমরা বুঝতে পারছিলাম, ক্যাপ্টেন অথবা চিফ-অফিসারের মাথা ঠিক নেই। রেডিও অফিসার অথবা যাকে মার্কনিসাব বলে থাকে সেও ভুল রিডিং পেয়ে যাচ্ছে, না কোথাও কিছু ঘটছে বুঝতে না পেরে একেবারে বোকা বনে গেছে। আর যেহেতু জাহাজীদের মন মেজাজ ভাল না, একবার সারেঙকে ডেকে বলবে তাও পর্যন্ত বলতে পারছে না ক্যাপ্টেন। নিজেরাই নিজেদের ভেতর গুমরে মরছে। কিন্তু বললে এখুনি হয়তো জাহাজীরা বলবে—ফেরাও জাহাজ, আমরা আর সফর করব না। আমাদের দেশে পৌঁছে দাও। আমরা সমুদ্রে শয়তানের পাল্লায় পড়ে গেছি। এবং এমন হয়ে থাকে, ভৌতিক অথবা অলৌকিক কিছু একটা, কাল আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, সমুদ্রের কত ভাবে কত ঘটনা মানুষের অগোচরে ঘটে যায়। কেউ আর ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিল না। আমরা সারেঙকে ঘিরে ধরলাম, কত বললাম, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, না হলে সাহেবদের এমন ছুটোছুটি বেড়ে যেতনা, জেনে এস, কি বিপদ আমাদের সামনে, না জানলে কাজ বন্ধ করে দেব, তখন সারেঙ আর কি করে। দুই 'সারেঙ' অর্থাৎ ডেক সারেঙ, এনজিন সারেঙ দুজনে মিলেই শেষ পর্যন্ত যা খবর নিয়ে এল, তাতে আশ্বস্ত হওয়া গেল। দুই সারেঙ, দু দলকে বোঝাল, কিছু না। ট্রানসমিটার রুমে কিছু অদ্ভুত শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। যান্ত্রিক গণ্ডগোল। ভয়ের কিছুই নেই। সমুদ্রে এসব খবর হামেশা থাকে। এ-তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। বলতে বলে দরিয়া। যা বিশাল

তার দুঃখও বিশাল। এ-ভাবে কিছু এলোমেলো কথা এবং মনে হল, তেমন কিছু নয়। খেতে খেতে নটা হয়ে গেল। খালি জাহাজ সুতরাং সমুদ্র শান্ত থাকলেও সামান্য পিচিঙ থাকে। এবং পিচিঙ না থাকলে আসলে আমাদের এখন ভালো খুব আসে না। এমন সুন্দর জ্যোৎস্না অনেকদিন সমুদ্রে দেখিনি। শীত, বেশ শীত লাগছে। ঠাণ্ডা বাতাস সমুদ্র থেকে অল্প অল্প উঠে আসছে। আমার ওয়াচ যেহেতু চারটা আটটা এবং যেহেতু আমি ইনজিনরুমের কর্মী, সুতরাং আর ডেকে নীল সমুদ্রে সাদা জ্যোৎস্না দেখে লাভ নেই। শুয়ে পড়াই ঠিক হবে।

এবং এভাবে আমাদের জাহাজে প্রায় সবাই তখন বোধহয় ঘুমোচ্ছিল, ব্রীজে সেকেণ্ড-অফিসারের ডিউটি, কোয়ার্টার মাষ্টার হুইল ধরে আছে। এনজিনরুমে তিনজন ফায়ারম্যান, একজন টিণ্ডাল, আর সেকেণ্ড-এনজিনিয়র জেগে। না, আরও একজন তখন জেগে রয়েছে। সে ডগওয়াচে যায়! ডেকে জাহাজীর ডিউটি সে। নাম সামসুর। সামসুর ডগ-ওয়াচ একেবারে জাহাজের সামনে ফোরোয়া পিচে বাংলা ভাষায় যাকে বলে আগিল ঠিক মধ্যযুগীয় পাইরেটদের মতো মাথায় মাংকি ক্যাপ এবং গরম জামাকাপড়ে একেবারে একটা শয়তান মানুষের মতো সতর্ক চোখ রেখেছি। কি জানি অজ্ঞাত কোনো জাহাজ, অথবা দ্বীপ যদি জাহাজের সামনে ভেসে ওঠে তবে সে এলার্মিং বেল বাজিয়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে এনজিনরুমে ঘড়ির কাঁটার মতো সেই বিশাল কাঁটাটা এস্টান অথবা অহেডে ঝুলবে। জাহাজ যত চলবে, না ধীর গতিতে, না একেবারে স্ট্যাণ্ডবাই কানটা সবই এক হবে ব্রীজ থেকে তখন।

'এহেন,-সময়ে সেই ওয়াচম্যান সামসুরের চোখ হঠাৎ কি দেখে আঁতকে উঠল। সেবিশ্বাস করতে পারল না ঘটনাটা। সামনে বেশ দূরে সমুদ্রে অগ্নিকাণ্ড। সমুদ্রে অগ্নিকাণ্ড লেলিহান জিহ্বা এবং তেলের ট্যাঙ্কে আগুন লাগলে যেভাবে ভয়াবহ আগুন সমুদ্রে ব্যাঙের মতো

লাফিয়ে লাফিয়ে অথবা ঢেউয়ের সংগে ভেসে ভেসে যায়, তেমনি আগুন চারপাশে ছড়িয়ে যেতে থাকল। এবং সেই শব্দ যা যা রিসিভারে ধরা পড়েছে। হুবহু এক। বাঁচাও বাঁচাও। সঙ্গে সঙ্গে সে এলার্ম বাজিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এনজিনরুমে খবর চলে গেলো একেবারে ষ্ট্যাণ্ড-বাই। এবং আমরা সবাই দ্রুত ছুটে সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে উঠলাম। পুব ডেক থেকে লাফিয়ে টুইন-ডেকে নামলাম কিছু দেখতে পাচ্ছি না, এবং আবার সিঁড়ি ধরে ছোট ডেকে। এবং সেখানে সব জাহাজীরা। ভয়াবহ এক বিস্ময়ে নিথর হয়ে গেছে সবাই। ওরা দেখছে, একটা জাহাজের অর্ধেকটা ডুবে যাচ্ছে। অর্ধেকটা ভেসে রয়েছে। সেখানে কোন অগ্নিকাণ্ড নেই। সেখানে আশ্চর্য নীরবতা। এবং এখন আমাদের কি কাজ আমরা জানি। যারা বেঁচে আছে তাদের উদ্ধার করা। এখন রেডিও-অফিসার নিকটবর্তী সব স্টেশনে খবরটা ট্রানস্মিট করতে গিয়ে থেমে গেল। কোথাও কোনো সংকেত পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও কেউ ধরছে না। কি ব্যাপার! কোথাও কি তবে কাছে পিঠে এই ৫৭ শ মাইলের ভেতর কোন জাহাজ নেই? কে তখন বাইরে এসে বলল, ক্যারেবিয়ান সমুদ্রে আমরা একা আছি ভাবতে পারছি না। সকালেও খবর ছিল—অনেক জাহাজীদের কোন্ কোন্ জাহাজ কোন্ কোস্টে যাচ্ছে তার রিপোর্ট রয়েছে। আর এখন সে একটা জাহাজকেও এমন একটা খবর পৌঁছে দিতে পারছে না।

ক্যাপ্টেন মুখ থেকে চুরুট সমুদ্রে ফেলে দিল। কি নিথর সমুদ্র! এতটুকু ঢেউ নেই। আর নির্জনতা শুধু। দূরে অলৌকিক অগ্নিকাণ্ড। অলৌকিক না বলে যে উপায় নেই। একটা দিক জাহাজের অক্ষত এবং বসে রয়েছে আর একটা দিকে আগুন জ্বলছে। এবং আকাশ লাল হয়ে গেছে। সামনের সমুদ্র লাল। ভাঙা জাহাজ থেকে চেঁচামেচি। বাঁচাও বাঁচাও। ক্যাপ্টেন, চিফ এবং সেকেণ্ড বোট হারিয়া করে দিতে বললেন। ঠিক হল চারজন করে ক্রু প্রত্যেক বোটে থাকবে। চারটে বোট, চারটের ভিতর দুটো মোটর বোট, দুটো হাতে

চালাতে হয়। আপাতত দুটো মোটর বোট যাবে। প্রথমে খুব কাছে যাবে না। ওরা দেখবে গিয়ে কতটা কি করা যায়। যদি সেই অর্ধেক জাহাজের হঠাৎ ভুস করে ডুবে যাওয়ার কোন অবকাশ না থাকে, তবে একটা বোট ফিরে আসবে। তখন এ-দুটো বোটও হারিয়া করে দেওয়া হবে। চারজন করে ক্রু একজন করে অফিসার ভাগ ভাগ হয়ে ভেসে পড়বে সমুদ্রে।

একটা মোটর বোটে আমার ডাক পড়ল। এমন দূর অন্ধকার সমুদ্রে, ক্যারেবিয়ান সমুদ্রে আমি আর চারজন মাত্র মানুষ, এবং অসীম গভীরতা নিয়ে সমুদ্র, নিচে হাজার হাজার হাঙর অথবা তিমি মাছেরা বিচরণ করছে কিংবা কোনো আয়লেণ্ডের ওপর দিয়ে দ্রুত ভেসে যাচ্ছি এবং এভাবে আমরা সবাই চুপচাপ, কেউ কথা বলছিলাম না, আমি কেবল একবার পেছনে তাকিয়ে দেখলাম। আমাদের জাহাজ বেশ দূরে সরে গেছে। আমাদের অনুমান ছিল, দু তিন মাইলের ভিতর ঘটনা, কিন্তু অবাক, আমরা পাঁচ সাত মাইলের মধ্যে এবং ক্রমে এগিয়ে যত যাচ্ছি সেই দৃশ্য তত দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা প্রথম আমাদের দিক ঠিক করে নিলাম, আমাদের জাহাজ থেকে প্রায় দুশো আশি ডিগ্রী এঙ্গেলে বোট ভাসিয়ে নিয়ে এসেছি। অবাক, যত যাচ্ছি দৃশ্যটা তত সরে যাচ্ছে। চিফ অফিসার ঘড়ি দেখলেন। প্রায় এক ঘণ্টার ওপর বোট চালিয়ে এসেছি। আমাদের সঙ্গে সার্চ লাইট রয়েছে। আমরা মাঝে মাঝে আর্ত চিৎকার শুনছিলাম।

জলে সার্চ লাইট জ্বেলে দেখেছি কিছু নেই দুটো একটা ফ্লাইং মাছ। আর আকাশে তেমনি নক্ষত্র। এবার প্রথম আমি চিৎকার করে উঠলাম, স্যার ঐ দেখুন।

সত্যি ভাবা যায় না। ধীরে ধীরে সেই অগ্নিকাণ্ড ক্রমে সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করছে। ক্রমে সেই সুদূর আকাশের সীমানা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করছে অগ্নিকাণ্ড। এবং সেই ভাঙা অর্ধেক জাহাজটা ক্রমে সমুদ্রের নীচে ডুবে গেল। কিছুক্ষণের পর আর সমুদ্রে কোন

লাল আভা নেই, আগুন নেই, মানুষের বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার নেই। সেই একেবারে নিরিবিলি শান্ত আকাশ, সমুদ্র, আর ছুটো একটা ডলফিনের আশ্চর্য মায়াবী শব্দ। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, জাহাজের আলো দেখা যাচ্ছে না। আমরা এক অপরিচিত জায়গায় চলে এসেছি। প্রথমে চিফ অফিসার স্যামুয়েল কথা বলল, সমুদ্রে শয়তানের পাল্লায় পড়েছি। আমাদের আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আমাদের ছু নম্বর বোট ছাখো কোথাও নেই। সেও আমাদের মতো বিপদে পড়েছে। তবু অভিজ্ঞ জাহাজীর মতো সে ঘাবড়ে গেল না। সে তার ডিরেকশান ফাইণ্ডার আনলে এত ঝামেলায় পড়ত না। আসলে ব্যাপারটাই যে এমন রহস্যজনক কে জানবে। ভয়ে সবার মুখ শুকিয়ে গেছে। এমন দৃশ্য সমুদ্রে এটা তো চোখের ভুল নয়। এতগুলো লোকের ভুল একসঙ্গে কি করে হবে ? তবু আমাদের এখন যেভাবেই হোক জাহাজে ফিরে যেতে হবে। আমরা যত ডিগ্রীতে বোট চালিয়ে নিয়ে এসেছি ঠিক তার বিপরীত বিন্দুতে মুখ ফিরিয়ে দিলে একসময় ঠিক জাহাজের কাছে পৌঁছে যাব। এবং এখনই মনে হচ্ছে যদি এখন আমাদের কাছে অন্ততঃ এল.বি.সেটটাও থাকত, আমরা তবে জাহাজে খবর দিতে পারতাম—শয়তানের পাল্লায় পড়ে গিয়েছি, আমাদের রক্ষা করুন। এবং এভাবে সারা রাত ঘুরে ফিরেও জাহাজের কাছে যেতে পারলাম না। যেন আমাদের নির্বাসনে রেখে আমাদের জাহাজও উধাও হয়েছে। এবং তখন ঈশ্বরের নাম ব্যতিরেকে আর কিছু আমাদের সম্বল ছিল না।

সকালে দেখলাম ছুটো বড় এ্যালবাট্রস্ পাখী উড়ে যাচ্ছে। স্যামুয়েল চিৎকার করে উঠল, আমরা ঠিক পৌঁছে যাব। কারণ ঐ ছুটো এ্যালবাট্রস্ ঠিক খাবারের সন্ধানে আমাদের জাহাজের দিকে যাচ্ছে। এভাবে সেই পাখীছুটোর পেছনে উড়ে উড়ে আমরা সন্ধ্যের ঠিক পরে আমাদের জাহাজের আলো দেখে কি যে চিৎকার করে উঠেছিলাম, এবং কি যে আনন্দ—আহা, সেইদিনে সেই পাখী ছুটোকে

আমাদের মনে হয়েছিল, ঈশ্বরের দূত। এবং যখন আমাদের ডেকে তুলে নেওয়া হল তখন কি যে আনন্দ সবার মুখে। তাদের ধারণা ছিল, সমুদ্রের শয়তান আমাদের টেনে নিয়েছে। দু'নম্বর বোট সকালের দিকে ফিরে এসেছিল। এবং আমাদের মৃত্যু অনিবার্য ভেবেছিল।

আসলে এখন আমরা ফের ঠিকঠাক জাহাজ চালিয়ে যেতে পারছি। এরিয়া-স্টেশন থেকে পরে খবর এসেছিল, গত বছর এ দরিয়ায় একটা অয়েল ট্যাঙ্কার ডুবে যায়। সেই থেকে এ দরিয়ায় একটি বিস্ময়কর রহস্য দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ দেখতে পায় সেই জাহাজ। তার আগুন, এবং এক অলৌকিক আকর্ষণ তার প্রতি। কেউ এখন পর্যন্ত প্রাণ হারায় নি। তবে কি সময়ের জন্য কেন যে এখানে এলেই জাহাজের ট্রানস্‌মিটাররুম ভুল রিডিং দিতে থাকে, নিকটবর্তী স্টেশন ধরা যায় না, তা কেউ বলতে পারে না। যাই হোক্ পরে এ নিয়ে আর আমরা মাথা ঘামাইনি। আমাদের সবাইকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত জাহাজ নিরাপদে মিসিসিপি নদীর মোহনার নীচে ফেলে খাড়ি নদী ধরে পোর্ট অফ সাল্‌ফারে পৌঁছেছিল। এ্যালবাট্রস পাখী দুটোর কথা আমার এখন কোন বিপদে পড়লে মনে হয়। পৃথিবীর পাখীদের ভেতর আমি এখনও সবচেয়ে বেশী-এই এ্যালবাট্রস পাখীদের ভালবাসি। কারণ তারা জীবন রক্ষা করেছিল। আমার জীবন রক্ষা করেছিল।

অতিন বন্দ্যোপাধ্যায়

একালের বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন পর্যায়ের নিরীক্ষা লক্ষণীয়। গত দুই দশকের কথাসাহিত্যে বহু লেখকের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে যে কয়েকজন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হতে পেরেছেন, অতীন-বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। প্রথম পর্যায়ে তাঁর লেখা অনেকাংশে অ্যাবস্ট্রাক্টধর্মী ছিল। সম্ভবতঃ সেই বিশেষ ভঙ্গির জন্যই তিনি

নিজস্ব এক প্রকরণও স্থির ক'রে নিয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর রচনা অনেক স্বচ্ছ অথচ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। তন্ময় কাব্যধর্মিতা তাঁর রচনা-শৈলীতে লক্ষ্য করা যায়। প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বাচনেও তিনি সমকালীনদের তুলনায় স্বতন্ত্র। তাঁর উপন্যাসে-গল্পে ভূগোলের অকল্পনীয় পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে অনেকগুলি অনাস্বাদিত-পূর্ব অভিজ্ঞতা। নগরজীবনের বহুমুখী কোলাহলময় জনযাত্রার নিপুণ রূপায়ণের সঙ্গে এসেছে গ্রামজীবনের পরিস্নিগ্ধ সহজ-সরলতা। তাঁর নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, অলৌকিক জলযান, রাজা যায় বনবাসে প্রভৃতি উপন্যাসে এর প্রমাণ মিলেছে। আধুনিক কালের এই বিশিষ্ট লেখক অতীন্দ্রিয় জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়েও কিছু লেখা আমাদের উপহার দিয়েছেন।

পিণ্ডদান



বিশু মুখোপাধ্যায়

সেবার স্কুলের ওঠাউঠির পর গ্রীষ্মের ছুটিতে মনে হ'ল কোথাও বেড়াতে গেলে মন্দ হয় না। ভালোভাবে ক্লাসে উঠেছি, বাবা-মার মনও ভালো, তাই ছুটি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলুম মা'র কাছে। মা সেটা নিয়ে আবার জানালেন বাবার কাছে। বাবার অনুমতি ছাড়া তো কিছু হবারজো ছিল না, তাই সরাসরি বাবার কাছে যেতে না পারলে, আমরা সব কিছুই পেশ করতুম মা'র থ্রু দিয়ে।

দু'একদিন পরে বাবা একদিন ডেকে বললেন, 'দেখ খোকা, আমার তো ছুটিছাটা নেই যে তোমায় নিয়ে কোথাও যাব, তাছাড়া এমন জানাশোনাও কেউ কোথাও যাচ্ছে না যে তার সঙ্গে তোমাকে পাঠিয়ে দেব।'…

বাবার কথা শুনে আমি তো হতাশ হয়ে পড়লুম। কিন্তু ভাগ্য-ক্রমে সেই সময় মা এসে সুরাহা করে দিলেন ব্যাপারটা। বললেন, 'কেন, দিন কয়েকের জন্যে ওকে ননদাই-এর কাছে পাঠিয়ে দাও না, তিনি তো ঘাটালে বদলী হয়ে এসে আমাদের সবাইকেই যেতে লিখে-

ছি:লন, তাছাড়া ওর পিসী তো ওকে কখনো দেখেনি, দেখলে খুশিই হবে।'

বাবা কি যেন ভে:ব নিয়ে বললেন, 'ওর কি সেই অজ পাড়াগাঁ ভালো লাগবে?—তা যেতে চায় যাক্, কমলার তো ছেলেপুলে হ'ল না, আদর-যত্ন পাবে ভালোই।.

বাবার মুখে এ-হেন কথা শুনে আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। শহ:রই ছেলেবেলা থেকে মানুষ' পাড়াগাঁ দেখবার সুযোগ কখনো হয়নি, তাই হিল্লী-দিল্লী পাহাড়-পর্বতের চেয়ে পাড়াগাঁ যাওয়ার কথা আমার ভালই লাগল।

মা বাবাকে বললেন, 'তাহলে তুমি একটা চিঠি লিখে দাও ওর পিশেমশাইকে।'

এর পর বেশ কয়েক দিন কেটে গেল চিঠিপত্র লেখালিখিতে। তারপর সত্যি-সত্যিই একদিন জানাশোনা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ঘাটাল যাবার ব্যবস্থা হ'ল। কলকাতার আউটরাম ঘাট থেকে হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমারে চে:প আমরা ঘাটালের পথে যাত্রা করলুম। সশব্দে পিছনের প্যাডেল-হুইলে জল-কেটে ষ্টীমার আমাদের নিয়ে চললো গঙ্গার উপর দিয়ে। গঙ্গা থেকে বাঁক নিয়ে সেই 'ধোঁয়া-কলের না' এসে ক্রমশঃ ঢুকল রূপনারায়ন নদীর মধ্যে। দু'দিকের গ্রাম্য-দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা চলতে লাগলুম। তার পর গেঁওখালি, তমলুক, কোলাঘাঠ পেরিয়ে এসে পৌঁছলুম আমাদের নামবার জায়গায়।

ঘাটালের ঘাট থেকে পিসেমশাই নিজেই এসে নিয়ে গেলেন আমাদের। ষ্টীমার ঘাট থেকে বাড়ি বেশী দূর নয়। পায়ে হেঁটে কয়েক মিনিটের পথ পেরিয়ে বাড়িতে পৌঁছতেই পিসীমা বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিলুম। তারপর সে কি আদর-যত্ন চললো কয়েক দিন! কলকাতার কথা, বাবা-মা'র কথা প্রায় ভুলেই যাবার দাখিল! শেষ পর্যন্ত পিসীমা-

পিসেমশাই দু'জনেই বললেন, 'ওকে আর যেতে দিও না, আমাদের কাছেই রেখে দাও। এইখানেই লেখাপড়া করুক, থাকুক আমাদের ছেলে হয়ে।'

হয়ত তাই থেকে যেতে হ'ত, কিন্তু ঈশ্বর বাদ-সাধলেন। কয়েক দিন যেতে-না-যেতেই আমায় সভয়ে ফিরে আসতে হ'ল আবার কলকাতায়। দুধ-মাছ, ক্ষীর-ছানা আর দই-সন্দেশের মায়া কাটাতে পারলেও, মিষ্টি পিসীকে এভাবে হঠাৎ ছেড়ে আসতে আমার দু'চোখ জলে ভরে এসেছিল।

ঘটনাটা ঘটল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। সেবার রূপনারায়ণ নদীতে তপসে মাছ হয়েছিল অপর্যাপ্ত। এমনটা নাকি পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে আর হয়নি। কুকুরের ল্যাজে ইলিশ মাছ বেঁধে ইলিশ মাছ ওঠা বন্ধ করার মত, তপসে মাছ ওঠাও অনেকে ঐ পদ্ধতিতে বন্ধ করতে চেয়েছিল। ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ ফেলে দিতে হয়েছিল জেলেদের ডাঙায় এনে। কেনবার লোক ছিল না। এক পয়সার পাঁচ-ছ কুড়ি মাছ জেলে-বৌ'রা জোর করে ঢেলে দিয়ে যেত বাড়িতে এসে। পয়সা দেব না বললেও তোয়াক্কা করত না। আর সে সব মাছের সাইজই বা ছিল কি! এখন ভাবলেও কষ্ট হয়। তেমন তপসে এখন আর চোখেই প'ড়ে না। যেমন পাকা চাঁপা ফুলের মত রঙ, তেমনি লম্বা লম্বা কেশর সমেত নধর চেহারা! তার উপর আবারপেট ফেটে যাচ্ছে ডিমে! এ-হেন তপসে মাছ সস্তায় পেয়ে শুধু তপসে মাছ খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছিল কত লোক। মুড়ির সঙ্গে মাছ ভাজা, ব্যাসন দিয়ে তপসে, তপসের ঝাল, অম্বল ক'দিন খেয়ে খেয়ে পাড়ার লোকের কথা তো কোন্ ছার, যে আমি এমন ভালোবাসি, সেই আমিই মাছের নামে আঁতকে উঠতুম —ভাবলেই গা-টা কেমন যেন গুলিয়ে উঠত। নিচু-ঘরের অনেক নিরামিষাশী বিধবারা পর্যন্ত এই মাছ খেয়ে ফেলেছিল সেবার। কিন্তু হলে কি হবে এতো কি সহ্য হয়, সব বাড়াবাড়িরই কেলেঙ্কারী

আছে, এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। কয়েক দিনের মধ্যেই গ্রামে ওলাওঠা দেখা দিল। প্রথমে কেওরা পাড়া, বাগদী পাড়া থেকে অসুখ ছড়াতে আরম্ভ করলো কায়েত পাড়া ও বামুন পাড়াতেও। পট পট করে লোক মরতে লাগল চারিদিকে। পিসেমশাই সাব্ডিভিশনাল অফিসার, তার দায়িত্ব অনেকখানি। ইতিমধ্যেই তিনি ঢেঁড়া দিয়ে মাছ বেচা, মাছ খাওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ওষুধ বিতরণ করছিলেন গরীবদের মধ্যে। কিন্তু সংক্রামক ব্যাধি একবার ছড়ালে তাকে রোধ করা মুস্কিল। দেখতে-দেখতে আশপাশের বাড়িতেও যখন রোগটা এগিয়ে এলো, তখন ভয় পেয়ে গেলেন পিসীমা পিসেমশাই দু'জনেই।

পিসীমা বললেন, 'না না, আর কোন মতেই নন্দকে এখানে রাখা উচিত নয়, আজই পাঠিয়ে দাও ওকে। অনেক মরা-হাজা আদরের ও, মা'র বাছা মা'র কাছে যাক্।'

অনেক কষ্টেই পিসীমা যদিও কথাগুলো বলেছিলেন, কিন্তু এ ছাড়া তার আর উপায়ই বা কি ছিল? পিসেমশাই বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক, তিনিও ঘটনার গুরুত্বটা উপলব্ধি করে, সেই দিনই আমায় কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেললেন।

আমি ফিরে এলুম কলকাতায়। ফিরে এসে ছিলুম তাই রক্ষে তা না হলে কি যে হ'ত তা ভগবানই জানেন। কারণ, কয়েক দিন পরেই ঘাটাল থেকে খবর এলো যে, পিসীমাদের বাড়িতেও এই ভয়াবহ রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল, একজন চাকর মারা গিয়েছে, এবং পিসীমারও বাঁচার কোন আশা ছিল না। সকলে হাল ছেড়ে দিয়েই শেষ অবস্থায় তুলসীতলায় নাবিয়ে ছিল তাঁকে, বাড়িতে কান্নাকাটিও পড়ে গিয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে আশ্চর্যরকম ভাবে ঐ তুলসীতলাতেই তাঁর আবার জ্ঞান ফিরে আসে, টাল সামলে ওঠেন তিনি এবং তাঁকে আবার ঘরে তোলা হয়। ঈশ্বরের অপার করুণার কথা ভেবে, বাড়িসুদ্ধ সবাই আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলুম।

এর পর পিসীমা ও পিসেমশাইয়ের কথা এইখানেই প্রায় শেষ হয়ে যায়। পিসেমশাই বদলী হয়ে যান চাট্গাঁয়ে। তখন তো আর পাকিস্তান হয়নি, সিভিল সার্ভিসের লোকদের সারা দেশ চ'ষে বেড়াতে হ'ত। শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গেই থেকে গিছলেন তিনি অনেক দিন। ঢাকাতে নাকি একটা বাড়িও করেছিলেন। মাঝে মাঝে হয়ত শুনতুম নোয়াখালিতে আছেন, আবার কখনো শুনতুম রঙপুরে, কখনো রাজসাহী। ঐ শোনাটুকুই যা! তাঁদেরও আর কখনো কলকাতায় আসা হয়নি, আর আমাদেরও তাঁদের কাছে যাওয়া হয়নি। এমনি করে দিন কেটে গিছলো—অনেক, অনেক বছর পেরিয়ে গিছলো। হিসাব করলে সে প্রায় দশ বছরের ধাক্কা। তারপর স্কুল-জীবন পেরিয়ে, কলেজে চার বছর কাটিয়ে, আমি যখন ইউনিভার্সিটির ফিপথ্ ইয়ারে পড়ছি, যখন পিসীমা ও পিসেমশায়ের কথা একেবারেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, তখন একদিন কলেজ থেকে ফিরে শুনি সেই কমলা পিসী ও পিসেমশাই এসেছেন আবার ক'দিনের জন্যে কোলকাতায়, আমাদের বাড়ি। ক্ষণিকের জন্যে ছায়াছবির মত আমার সেই বাল্যস্মৃতি ভেসে উঠল মনের পরদায়। যত দিনের পুরোনই হোক না কেন, সেই তপসে মাছ খাওয়ার কথা ভোলা যায় নাকি? তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখি, মা ও জ্যেঠিমা পিসীমাকে নিয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। আমি কাছে যেতেই মা বললেন, 'নমস্কার কর পিসীমাকে।' আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম। পিসীমা বলে উঠলেন, 'কী রে নন্দ চিন্‌তে পারিস? তুই যে জোয়ানমদ্দ হয়ে গেছিস একেবারে—মনে আছে পিসীমাকে তোর?'

—'চিন্তে পারবো না কেন পিসীমা, তুমি তো একটু বদলাও নি।' আমি হাসতে হাসতে বললুম বটে কথাটা, কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলুম তাঁর চেহারা দেখে। দশ বছর আগে যখন পিসীমাকে দেখেছি, তখন তাঁর বয়স ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে, কিন্তু তারপর এই দীর্ঘদিন কেটে গেছে অথচ তাঁর চেহারা একটুও বদলায় নি, বরং

তখনকার চেয়ে বয়স এখন যেন কমই মনে হচ্ছে। শুনলুম, ঘাটালে সেই যে পিসীমার কলেরা হয়েছিল, তারপর এই দশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও আর তাঁর জ্বর-জ্বারি বা সর্দি-কাশি পর্যন্ত হয়নি কখনো!

মা বললেন, 'খোকা বাইরের ঘরে তোমার পিসেমশাই আছেন, যাও তাঁকেও প্রণাম করে এসো গিয়ে।'

বাবার সঙ্গে পিসেমশাই গল্প করছিল বৈঠকখানায়। তাঁকে গিয়ে প্রণাম করলুম বটে, কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে যেন আর চেনাই যায় না, অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছেন তিনি। আমাকে আদর করলেন, তারপর লেখাপড়ার কথা, স্কলারশিপ পাবাব কথা তুলে খুব খানিকটা তারিফ করলেন পিঠ চাপড়ে।

বাবা বসেছিলেন পাশেই। গম্ভীর মানুষ। কাজের কথা ছাড়া বাজে কথা বলেন না। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কাজের কথা শোন খোকা, বেশী সময় নেই, তোমাকে এখুনি তৈরি হয়ে নিতে হবে। তুমি তোমার পিসীমা ও পিসেমশায়ের সঙ্গে আজই গয়ায় যাবে তিন-চার দিনেব জন্যে—কোন ওজর দেখিয়ে নাকচ করে দেবার চেষ্টা করো না।'

বাবার কথার উপর কোন দিনই 'না' বলার সাহস হয়নি আমার। তবু ছোট্ট করে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন?'

—'বুড়ো-ধাড়ি ছেলে, গয়ায় যায় কেন জান না?'

—'আহা, অন্য কাজেও তো হতে পারে, ও আর অতো জানবে কি করে?' বলে পিসেমশাই জিনিসটা বিশদভাবে আমায় বুঝিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। সম্প্রতি তিনি রীটায়ার করেছেন, অনেক দিনই পিতৃপুরুষের গয়ায় পিণ্ডি দেবার ইচ্ছে, কিন্তু কার্যগতিকে তা আর হয়ে ওঠেনি এতদিন. তাই এবার সেই কাজটা সারতে চান। নিজের বয়েস হয়েছে, তার উপর শরীরটাও খারাপ, তাই আমাকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে।

আমি রাজী হয়ে গেলুম। বাইরে যাবার কথায় আমি তো কোনদিনই না বলিনি, তাছাড়া যে বোধিদ্রুম তলে তথাগত বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাঁর পদরেণুরঞ্জিত সেই তীর্থস্থান দেখা হবে এতো সৌভাগ্যের কথা। বাবা ও পিসেমশাইকে বললুম 'তাহলে আমি তৈরী হয়ে নিই।'

পিসেমশাই বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, ট্রেন রাত ন'টায়, খেয়ে-দেয়ে আমরা আটটা নাগাদ রওনা হবো এখান থেকে।'

গয়ায় এসে আমরা উঠলুম আমাদেরই জানাশোনা এক পাণ্ডার বাড়ি। বাবা ঠিকানা-পত্র লিখে দিয়েছিলেন। বংশানুক্রমে আমাদের কাজ করে আসছেন তাঁরা। দেখে অত্যন্ত ভদ্র ধার্মিক লোক বলেই মনে হ'ল। নিজের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি সুন্দর বাড়ি। তারই দু'খানি ঘর আমাদের ছেড়ে দিলেন দোতালার উপর। পরের দিনই পিসেমশাই ফল্গুর তীরে বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদান করবেন, তাই প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের জন্য তাঁকে টাকাকড়ি সব হিসেব করে, সেই রাত্রেই দিয়ে দেওয়া হ'ল। আমাদের খাওয়া-দাওযার বন্দোবস্ত পাণ্ডাজী সব করলেন সেদিন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে আমি পাশের ঘরে শুতে গেলুম। পিসেমশাই বলেছিলেন, 'তুইও না হয় এই ঘরেই শো না।' কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। বরাবরই একলা শোওয়া আমার অভ্যাস, তাছাড়া পিসীমা রয়েছেন।

গয়ায় যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলুম, পিসীমা যেন কেমন গম্ভীর মন-মরা হয়ে গেছেন। আগের মত আর তেমন কথাবার্তা বলছেন না। অমন যে ঢলঢলে মুখ একরাত্রের ট্রেন-জার্নিতেই যেন আধখানা হয়ে গেছে তাঁর। পিসেমশাই ঠাট্টা করে দু'একবার বলেও ফেলেছিলেন, 'কী হ'ল কি তোমার, শরীর-টরির খারাপ হ'ল নাকি?'

—'না, কিছু না।' ব'লে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিলেন কমলা পিসী।

পাশের ঘরে বিছানা পাতাই ছিল, মশারী ফেলে, লণ্ঠনটা কমিয়ে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম।

ঘুম না আসা পর্যন্ত পাশের ঘর থেকে মধ্যে মধ্যে পিসীমা ও পিসেমশাইয়ের টুকরো-টুকরো কথাবার্তা ভেসে আসছিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি কখন তা আর মনে নেই।

হঠাৎ দোরের ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভেঙে গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে পিসেমশাই ডাকছেন, 'নন্দ একবার শীগগির উঠে আয়। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুললুম। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি ব্যাপার পিসেমশাই?' পিসেমশায়ের গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'তোমার লণ্ঠনটা নিয়ে একবার এ ঘরে এসো।' লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দিয়ে পিসেমশাইয়ের মুখটা যে দেখলুম তাতে আমিই ভয় পেয়ে গেলুম। সারা মুখটায় কে যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিয়েছে। কপালের উঁচু উঁচু শিরাগুলো ঠেলে আরো খানিকটা যেন উঁচু হয়ে উঠেছে। আর কোন কথা না ব'লে তাঁর সঙ্গে এসে ঢুকলুম পাশের ঘরে। ঘরে ঢুকেই আমি তো চমকে উঠলুম। দেখি, পিসীমা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন মেঝের উপর। মাথায় বালিশ নেই, চুল খোলা কাপড় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে তাঁর কাছে যেতেই পিসেমশাই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বললেন, 'ছুঁয়ো না ওকে!'

কি ব্যাপার কিছুই সঠিক যদিও বুঝতে পারছিলুম না, তবুও একটা কিছু সাংঘাতিক যে ঘটেছে ভেবেই আমি ব'লে ফেললুম, 'আপনি কি মেরে ফেললেন নাকি পিসীমাকে—ব্যাপার কি?'

—'আমি মেরে ফেলব!—ওই যে আমার মেরে ফেলেনি এতদিন এই রক্ষে!' উত্তেজিত হয়ে বেশ চেঁচিয়েই কথাগুলো বললেন পিসেমশাই। তারপর আমাকে কাছে বসিয়ে যা বললেন, তা শুনে আমি তো পাথর হয়ে গেলুম।

—'অসম্ভব, এ কখনো হতে পারে না!' ব'লে আমিও চেঁচিয়ে উঠলুম উত্তেজনায়।

আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে পিসীমা ধড়মড় করে উঠে বসলেন। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে তা থেকে। মুখের চেহারা বহুদিনের অসুস্থ রুগীর মত—বিমর্ষ, ম্লান। উঠে বসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'না বাবা, কথাটা মিথ্যে নয় সত্যিই। তোমাকে আমি ছেলের মত ভালবাসি মিথে বলব না—এই দেহটা তোমার পিসীর হলেও, আমি সত্যিকার তোমার পিসী নই। আমি ঘাটালের বাগদীপাড়ার কেওরাদের মেয়ে রূপী—আমি পেতনী!'

কথাটা শুনেই সমস্ত শরীরটা যেন আমার কেমন দুলে উঠলো। থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে কথাগুলো বলছিল ঐ বিদেহী রূপীর আত্মা। হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম আমি। এও কি কখনো সম্ভব! যার সামনে বসে কথা বলছি, সে মানুষ নয় পেতনী—মানুষের দেহ ধারণ করে রয়েছে! ভাবতে ভাবতে সর্বাঙ্গে আমার কাঁটা দিয়ে উঠলো -মাথার ভেতরটা কেমন যেন ঝিমঝিম করতে লাগল। শেষ রাতের জ্যোৎস্না জানালা দিয়ে এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, লণ্ঠন দুটো দাউ দাউ করে জ্বলছে, তবু যেন বড় অন্ধকার মনে হ'ল ঘরটাকে। পিসেমশাই রয়েছেন পাশে বসে—তবু যেন আমি নিঃস্ব, একাকী।

আমার চোখ-মুখের চেহারা দেখে পিসেমশাই আমায় একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, 'শুন্‌লি ··শুন্‌লি একবার কথাটা! দশ বছর আগে কমলা নাকি কলেরায় মারা যায়, তাকে তুলসীতলায় যখন নামান হয়, সেই সময় উনি পাশের এক নিম গাছ থেকে এসে তার দেহের মধ্যে ভর করেন—মৃত কমলা বেঁচে ওঠে। তারপর থেকে এই দশ বছর ঐ প্রেতিনীর সঙ্গে আমি ঘর করছি। ··ও বাবা! একি কাণ্ড রে, শুনেছিস কখনো এমন কথা ··কি করি, কোথায় যাই এখন তাই বল্ বাবা তুই!' ··বিহ্বলের মত হয়ে পড়লেন যেন পিসেমশাই। মনে বল এনে আমি ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'আপনি একটু স্থির হন পিসেমশাই, সব শুনতে দিন ও'র কাছ থেকে!'

—'না না শুনবি আর কি—বলছে ওরও *পিণ্ডি দিয়ে যেতে,*

কোনরকমে উদ্ধার ক'রে দিয়ে যেতে ওকে!'···কোথায় করতে এলুম মা-বাপের কাজ—তা নয়, একি রে বাবা!' ··ব'লে পিসেমশাই আবার হাঁপাতে লাগলেন।

আমি বললুম, 'বেশ তো গয়ালী পাণ্ডা ঠাকুরকে বলা হোক ব্যাপারটা; তিনি যা বলবেন তাই করা যাবে। যদি বলেন, হ্যাঁ, ওঁরও পিণ্ড দেওয়া চলবে, তাহাব তাই দিয়ে দেব আমরা।.

-'হ্যাঁ বাবা নন্দ, আমাকে উদ্ধার করে দাও বাবা, আমার ভোগের লালস সব মিটে গেছে বাবা · আমার কেউ নেই, তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমায় উদ্ধার করে দাও বাবা · এ সুযোগ আর পাব না আমি!' ব'লে হাউমাউ করে মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

দোতালায় আমাদের হইচই, কান্নাকাটি ও কথাবার্তায় নীচে পাণ্ডা ঠাকুরের ঘুম ভেঙ্গে গিছল। তিনি উপরে উঠে এলেন। কিন্তু এসে যা শুনলেন, তাতে তাঁর গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবার দাখিল।· তুব নিজেকে সামাল নিয়ে তিনি সাহস দিলেন আমাদের। বললেন, কুছ ডর নেই, হাম কাল ওনার ভি কাম ক'রে দেব।,

পেতনী-পিসী তখনও ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন আর ছটফট করেছিলেন মেছের ওপর। এ অবস্থায় আমাদের মানসিক বল হারানো উচিত নয় ভেবে, আমি তাঁর কাছে সাহস করে এগিয়ে গেলুম; তারপর মাথায় একটা বালিশ ও গায়ে একখানা চাদর ঢাকা দিয়ে দিলুম। কিন্তু গায়ে হাত লাগতেই দেখলুম, গা যেন ওঁর আগুন, হাত পুড়ে যাচ্ছে! ওঁর মাথায় বালিশ দিতে যাবার আগে পিসেমশাই আর একবার যদিও চীৎকার করে উঠেছিলেন কিন্তু আমি শুনিনি। সত্যিকার পেতনী হলেও, একদিন যে কারু কোন অনিষ্ট করেনি আজ আর সে তা করতে যাবে কেন? আমি তাঁকে বললুম, 'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন, কাল আপনার সব ব্যবস্থা করে দেব।'

—হ্যাঁ বাবা তাই করো, আমার সদ্গতি করে দাও বাবা, তোমার

ভাল হবে।...থাকতে পারিনি বাবা, গরীবের মেয়ে দুঃখে-কষ্টে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলুম অল্প বয়সে, তারপর তোমার পিসীমা মারা গেল, পিসেমশায়ের ঐশ্বর্যের লোভে পড়ে, সংসার সুখের লালসায় ঢুকে পড়েছিলুম তোমার পিসীর মৃত-দেহে।'—হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে, জড়িয়ে-জড়িয়ে কথা বলছিলেন তিনি। কিন্তু পিসেমশাই তাঁকে আর বলতে দিলেন না। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, এবং তুই-তোকারি করে বললেন, 'চুপ কর তুই, একটা কথাও আর বলতে হবে না তোকে!'

সে রাত পিসেমশাই ও আমার বসে-বসেই কেটে গেল। প্রতি মুহূর্তেই এই কাল-রাত কতক্ষণে কাটবে, সেই চিন্তাই তখন আমাদের মনকে পেয়ে বসেছিল। ক্রমশঃ ভোরের আলো দেখা দিল পূব আকাশে। সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আস্তে আস্তে। দিনের আলো রাতের বিভীষিকা অনেক কমিয়ে দিল বটে, কিন্তু সেই আলোতে পেত্নী-পিসীর মুখটা স্পষ্ট দেখে আবার আমার ভয় হয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টায় মধ্যে, এক রাত্রে মানুষটার গায়ের রঙ, চোখ-মুখ সব যেন বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। কোথায় আমার সেই পিসার ঢলঢলে মিষ্টি মুখ, আর কোথায় তাঁর সেই আদরের ডাক!

আমার দিকে চোখ পড়তেই তিনি নাকি সুরে 'জঁল, জঁল দেও একটুকু' বলে, উঠলেন। চিঁ চিঁ করছে যেন গলার স্বর। আমি গ্লাস থেকে গালে জল ঢেলে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেমন আছেন?' উত্তরে ঐভাবেই নাকি সুর টেনে টেনে তিনি বললেন, 'জ্বলে যাঁয় বাঁপ, জ্বলে যাঁয় রেঁ! ক্রমশঃ কথাগুলো কেমন যেন ইতর জনের ভাষার মত হয়ে আসছিল তাঁর। মাথায় হাত দিয়ে আমি জ্বর দেখতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু পিসেমশায়ের ধম্‌কানিতে আর হাত বাড়ালুম না। তাড়াছা তখন আর সময়ও ছিল না আমাদের। পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে তখুনিই বেরুতে হবে। তাঁর লোক এসে উপরেই দাঁড়িয়েছিল আমাদের কাছে।

সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত দিনটাই কেটে গেল শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপারে। পিসেমশায়ের সঙ্গে সারাক্ষণই আমি পাশে পাশে

রইলুম, ফাইফরমাশ খাটলুল। পেত্নী-পিসীর কাজও হল নানা হাঙ্গামা করে-- দাঁড়কাক বলি দিয়ে, চামচিকে পুড়িয়ে পাণ্ডা ঠাকুর এর জন্যে আলাদা বেশ কিছু টাকা নিলেন।

রাত্রি হয়-হয় এমন সময় আমরা আস্তানায় ফিরলুম। কিন্তু বাড়িতে যে লোকটিকে আমরা রোগিনীর তত্ত্বাবধানে রেখে গিয়েছিলুম, সে ঢোকবার মুখেই ছুটে এসে খবর দিলে যে, 'তিনি এইমাত্র হঠাৎ মারা গেলেন। আমরা ডাক্তার ডাকার কোন অবসর আগে পাই নি!'

পিসেমশাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাক্ বাঁচা গেল!'

সারাদিনের ক্লান্তির পর আমাদের নিজেদের শবদাহের আর কোন শক্তি ছিল না। অন্য লোকের সাহায্য নিয়ে টাকা দিয়ে, তাঁর সদ্গতি করিয়ে, পরের দিনই আমরা দু'জনে, পিসেমশাই ও আমি, এলুম কলকাতায়।

অবিশ্বাস্য এই ঘটনার কথা বাড়ির সবাই শুনে তো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিশ্বাস করে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবাই সান্ত্বনা দিলেন পিসেমশাইকে।

কিন্তু বাইরে আর যাকেই এ ঘটনা বলেছি সেই বিশ্বাস করেনি, আর কোনোদিন কেউ করবে বলেও মনে হয় না!

পিসেমশাইও আজ আর নেই, কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি, ভয়াবহ এই ঘটনার জীবন্ত সাক্ষী হয়ে।*

* এই ঘটনাটি আমি আমার স্বর্গতঃ বন্ধু পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রীর কাছে থেকে শুনি। এটি নাকি ঘটেছিল তাঁদেরই এক জানাশোনা আত্মীয়ের জীবনে। তবে এই ঘটনার স্থান, কাল ও পাত্রপাত্রীর নাম আমি আংশিকভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছি।

বিশু মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে প্রায় অর্ধ শতাব্দীর যোগসূত্র রক্ষা করে এখনও সক্রিয় রয়েছেন, এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই 'অঙ্গুলীমেয়'। বিশু মুখোপাধ্যায় সেই বিরল সংখ্যার অন্যতম। সুদীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখে তিনি ভাবীকালের জন্য অবিরাম চয়ন ক'রে চলেছেন মূল্যবান কিছু ফসল। বাংলা সাহিত্যজগতের তিনি একজন জীবন্ত অভিধান। তাঁর অসংখ্য সংকলিত গ্রন্থ বাংলার পাঠকদের প্রিয় সম্পদ। তাছাড়াও, রবীন্দ্র-সাগর সঙ্গমে পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রেমের গল্প, বিখ্যাত বিচার কাহিনী, বিখ্যাত শিকার কাহিনী এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাবলীর সম্পাদনা তাঁকে একটি স্মরণীয় অভিধায় চিহ্নিত করেছে। জীবনে তিনি সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তায় মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হতে পারেন নি। ১৯০৯ সালে এই সাহিত্যকর্মীর জন্ম হয়। তাঁর রচনার গভীরতা এবং বহুমুখিতা পাঠকসাধারণকে বিস্মিত করে। তিনি অলৌকিক কাহিনী রচনায়ও সমধিক পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। শিশু-সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে দৈনিক বসুমতী'র পাতায় 'বিষ্ণুশর্মা' হিসাবে সাংবাদিকতার কাজে লিপ্ত রয়েছেন।

বাঁদরের পায়ের ছাপ



চিরঞ্জীব সেন

সন্ধ্যার পর থেকেই জমিয়ে শীত পড়েছে। কনকনে ঠাণ্ডা। চারদিক স্যাঁতস্যাঁত করছে। ভাগ্যিস হাওয়া দিচ্ছে না, তাহলে না জানি অবস্থা কি হত!

ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালিয়ে যতদূর সম্ভব টেবিলটা কাছে নিয়ে গিয়ে বাবা আর ছেলে দাবা খেলতে বসেছে। কাছেই আর একটা চেয়ারে বসে মা কি যেন সেলাই করছেন।

বাবার নাম মিঃ হোয়াইট আর ছেলের নাম হার্বার্ট।

হোয়াইট বললেন: আজ আর বুড়ো এল না বোধ হয়, যা শীত--

— এল না কি, বাবা, ঐ শোনো পায়ের শব্দ—

সত্যিই তো। বলতে না বলতে বাইরের দরজায় কে করাঘাত করল। হার্বার্ট উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সার্জেণ্ট-মেজর মরিস ঘরে ঢুকলেন। মাথার টুপি ও গ্রেটকোট খুলে আলনায় রাখলেন, হাতের ছড়িটাও। তারপর একটা চেয়ারে বসে পকেট থেকে সিগার বার করে ধরালেন।

হার্বার্ট বললেন: মেজর, তাহলে একটু হুইস্কি হবে নাকি?

হার্বার্ট রোজই এই অনুরোধ করেন আর সার্জেণ্ট-মেজর মরিস বললেন: তা মন্দ কি, হক, মিসেস হার্বার্ট আপনার আপত্তি নেই তো।

এরপর হার্বার্ট বোতল, গেলাস্ ইত্যাদি সাজিয়ে দেন। সার্জেন্ট-মেজর হুইস্কি পান করতে করতে গল্প করেন। সেদিন আর খেলা হয় না। সার্জেন্ট-মেজরের গল্প শোনেন সকলে।

সার্জেন্ট-মেজর মরিস ব্রিটিশ আমলে ইণ্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন, সেই সূত্রে ভারতের নানা স্থানে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু ছিল ভারত। প্রধানতঃ তিনি নানারকম অলৌকিক কাহিনী বলতেন।

সেদিন বাঁদরের পায়ের ছাপ সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন, ভীষণ অপয়া নাকি সেটা। হোয়াইট বললেন।

—বাঁদরের পায়ের ছাপ নয় ছাঁচ, ও না শোনাই ভাল, একটা ছোট বাঁদরের একটা পায়ের ছাঁচ কে যেন তুলেছিল, ভারতবর্ষে একজন সন্ন্যাসী নাকি সেই ছাঁচটাকে মন্ত্রপূত করে দিয়েছিল।

বলুন বলুন মেজর বলুন, আমাদের দারুণ কৌতূহল হচ্ছে!

—তা কৌতূহলের ব্যাপার বৈ কি, এই তো ওটা আমার পকেটেই রয়েছে, বলতে বলতে সার্জেন্ট-মেজর তাঁর পকেট থেকে কালো মতো একটা ছাঁচ বার করলেন।

—দেখি, দেখি, হার্বার্ট সেটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে জিজ্ঞাসা করল : কিন্তু এটার বিশেষত্ব কি?

-বিশেষত্ব? বিশ্বাস করবে কি? এর বিশেষত্ব একটা আছে তবে আমি কখনও পরীক্ষা করে দেখি নি।

সিগারে দুটো টান দিয়ে এক চুমুক হুইস্কি পান করে বললেন : আমরা তখন শিয়ালকোট ক্যাণ্টনমেণ্টে ছিলুম। ঐ ছাঁচটা আমি প্রথম দেখি ক্যাপ্টেন লাম্‌সডেনের টেবিলে, তিনি ওটা তাঁর টেবিলে অ্যাস-ট্রে হিসেবে ব্যবহার করতেন। ওটা তিনি আমাকে দিয়ে দেন। কে একজন সাধু ওটা তাঁকে দিয়েছিল। সেই সাধুর গুরু ওটাকে মন্ত্রপূত করেছিল। তিনজন লোক পৃথক পৃথক ভাবে ওর কাছে যা চাইবে তাই নাকি পাবে এবং প্রতিজন

তিনবার চাইতে পাবে, ভারতীয়রা একে বর চাওয়া বলে। আমরা যাকে উইশিং বলি।

—তাই নাকি ? তা আপনি নিজে কিছু চেয়েছিলেন ? হোয়াইট জিজ্ঞাসা করলেন।

—না চাইনি, শুনেছি জিনিসটা ভীষণ অপয়া, কিছু চাইলে হয় তো পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বিপদও ডেকে আনতে পারে।

—ও সব কুসংস্কার এবং অবিশ্বাস্য। বলতে বলতে হার্বার্ট পায়ের ছাঁচটা সার্জেন্ট-মেজরের সামনে টেবিলেব ওপর রেখে দিল।

ইতিমধ্যে মেজরের সুরা পান শেষ হয়েছিল। তিনি বাড়ি ফেরবার উপক্রম করছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন তারপর কি মনে করে সেই ছাঁচটা হাতে তুলে নিয়ে, 'এই সব আন্‌লাকি গিমিক না থাকাই ভাল'। বলতে বলতে সেটা ফায়ারপ্লেসে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

মেজরের লক্ষ্য ভুল হল। ছাঁচটা ফায়ারপ্লেসের কোণে ধাক্কা লেগে হার্বার্টের পায়ের কাছে পড়ল। হার্বার্ট সেটা তুলে নিয়ে বলল : আহা-হা ওটা নষ্ট করতে চাইছেন কেন ? আমি ওটা পরীক্ষা করে দেখব।

কিন্তু সাবধান হার্বার্ট। পরে আমাকে দোষ দিয়ো না, ওসব জাদুর ব্যাপার, কি থেকে কি হয় কে জানে, আমি জানি না।

মেজর আর অপেক্ষা করলেন না এখনি যেন তাঁর কোনো বিপদ ঘটবে! তাড়াহুড়ো করে তিনি গায়ে কোঠ চড়িয়ে মাথায় টুপি পরে ছড়িগাছটা নিয়ে 'গুড নাইট' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হার্বার্টের হাত থেকে হোয়াইট সেই ছাঁচটা তুলে নিলেন। নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন : মেজর যা বলে গেল তা কি সত্যি ? অথচ নিজে তো কিছু চাইলে পারত।

—সত্যি মিথ্যের কি আছে, ওটা হাতে রয়েছে যখন তখন তো কিছু চেয়ে ফেললেই পার বাবা, বেশ তো ওটার কাছে তুমি দুশো পাউণ্ড চেয়ে দেখই না, দেখাই যাক না কি হয়।

হোয়াইট একটু হাসলেন। তারপর বললেন : বেশ যখন বলছিস তখন চেয়ে দেখা যাক। এই কথা বলে হোয়াইট ছাঁচটা ডান হাতে ধরে, সামনে এনে ছাঁচটাকে লক্ষ্য করে বললেন : আমি দুশো পাউণ্ড চাই

কথা শেষ হতে না হতেই তাঁর মনে হল তাঁর হাতে কে যেন আঘাত করল আর ছাঁচটা যেন নড়ে উঠল। এ কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার হোয়াইটের মুখ সাদা হয়ে গেল। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। বাইরে জোর বাতাস বইতে লাগল। বাতাসের আঘাতে জানালাগুলো নড়ে উঠলো। তিনজনে নির্বাক।

হার্বার্টের মা বললেন : তোমরা টাকা চেয়ে ভুল করলে। ওটারই সঙ্গে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে মানসিক শান্তি বা ঐরকম কিছু চাইলে ভাল করতে, এ সব মায়ার ব্যাপার।

—দেখাই যাক না কি হয়, পরে না হয়, তাই চাওয়া যাবে, আমরা তিনজনে মিলে এখনও তো আটবার কিছু চাইতে পারব, হোয়াইট বললেন।

—কিন্তু বাবা টাকাটা কি ভাবে আসবে? তুমি কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠে বালিসের তলায় হাত দিয়ে দেখ তো।

হোয়াইট কোনো জবাব দিলেন না। তিনি ছাঁচটা ফায়ারপ্লেসের ওপর ম্যান্টেলপিসে রেখে দিলেন।

পরদিন সকালে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে গত রাত্রের ঘটনা নিয়ে হাসাহাসি হল। স্রেফ ধাপ্পা। আজকাল কি আর অঘটন ঘটে নাকি? কে জানে কাকতালীবৎ কিছু ঘটে যেতেও পারে তো! আশার ওপর আশা! ওই ধরনের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকফাষ্ট শেষ হল।

হার্বার্ট তার সাইকেল নিয়ে কাজে বেরিয়ে গেল। সে এক কারখানায় কাজ করে।

তখনও বিকেল হয় নি। হোয়াইট ও তাঁর পত্নী বারান্দায় বসে চা পান করছেন। এমন সময় ওরা লক্ষ্য করলেন একজন অপরিচিত

ব্যক্তি গেটের ওপাশে যেন পায়চারি করছে, নাকি গেট খুলে ঢুকতে দ্বিধা। ওরা দুজনেই লোকটিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত লোকটি ছোট কাঠের গেট খুলে ভেতরে ঢুকেই পড়ল। হোয়াইটের সামনে এসে মাথার টুপি নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ

—আপনিই কি মিঃ হোয়াইট ? আর ইনি মিসেস হোয়াইট ?

দুজনেরই বুক দুরুদুরু করছে। এই অপরিচিত ব্যক্তি কে ? অত গম্ভীর কেন ? এই লোক কি ওদের দুশো পাউণ্ড দিতে এসেছে ?

— আমি হোয়াইট আর ইনি আমার পত্নী, কি ব্যাপার ?

-আমি আসছি ম অ্যাণ্ড মেগিন্স কম্পানি থেকে, হার্বার্ট ঐ কম্পানির কারখানায় কাজ করে। সেখান থেকে হঠাৎ লোক এল ? কি ব্যাপার ? মিসেস হোয়াইট উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

- হার্বার্টের কোনো বিপদ হয় নি তো ?

লোকটি কয়েক সেকেণ্ড কোনো কথা বলল না। মিঃ হোয়াইট বেশ জোরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

– কি বলুন না মশাই, হার্বাটের কি হয়েছে ?

---সাংঘাতিক একটা অ্যাকসিডেণ্টে ঘটনাস্থলেই সে মারা গেছে

মিসেস হোয়াইট চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। মিঃ হোয়াইট তাঁর পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। লোকটি আর কিছু বলতে পারল না। টেবিলের ওপর একটি পুরু খাম রেখে সে এই ফাঁকে চলে গেল। ম অ্যাণ্ড মেগিন্স কম্পানি হার্বার্টের সৎকার বাবদ আপাততঃ দুশো পাউণ্ড পাঠিয়েছেন। কিন্তু এভাবে দুশো পাউণ্ড তো ওরা চান নি ! বৃদ্ধ সার্জেণ্ট-মেজর ঠিকই বলছিল ; ছাঁচটা ভীষণ আনলাকি।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু। হার্বার্টের লাস ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠান হয়েছে। প্রতিবেশীরা এসে শোকবিহ্বল বাবা ও মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

সেদিন রাত্রে শয্যা ত্যাগ করে মিসেস হোয়াইটহঠাৎ বলে উঠলেন

— তোমার সেই বাঁদরের পা কোথায় ? তাকে নিয়ে এস।

—কেন ? সেটা নিয়ে কি হবে ?

—তুমি তো আরও দুবার কিছু চাইতে পার। তুমি আমাদের ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চাও। তাকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে বল।

সে কি হয় নাকি? ওসব চাইলে পাওয়া যায় না। তার চাইতে বরঞ্চ আমরা যাতে পুত্রশোক সহ্য করতে পারি সেই বরই চাই।

—না, আমি আমার ছেলেকে ফিরে চাই।

মিসেস হোয়াইট স্বামীকে বার বার এমন আকুলভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন যে হোয়াইট আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি সেই পূর্বের মতোই ছাঁচটিকে ডান হাতে ধরে সেদিকে চেয়ে বললেন আমি চাই আমার ছেলে আবার যেন উঠে আমাদের কাছে ফিরে আসুক।

হোয়াইটের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাঁচটা তাঁর হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। মিসেস হোয়াইট জানালার পর্দা সরিয়ে খড়খড়ি তুলে বাইরে চেয়ে রইলেন। হোয়াইট একটা চেয়ারে চুপ করে বসে রইলেন।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। মিসেস হোয়াইটের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। সে কি আসবে? মা ভাবছে

হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে কার পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। অত্যন্ত লঘু সেই আওয়াজ। তারপর দরজায় মৃদু করাঘাত। হোয়াইট চমকে উঠলেন। তাঁর বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল। সত্যিই কি হার্বার্ট এসেছে? মা চিৎকার করে উঠলেন; সে এসেছে! হার্বার্ট এলি? তিনি দরজার দিকে ছুটলেন। সেদিকে অন্ধকার। তিনি দরজার খিল ও ছিটকিনি খুলতে না পেরে আকুল স্বরে স্বামীকে ডাকছেন। ওদিক দরজার করাঘাত থামছে না।

হোয়াইট কি করবেন? যেই এসে থাকুক সে নিশ্চয় হার্বার্ট নয় তাহলে সে 'মা' 'মা' বলে ডাকত। নিশ্চয় তার অশরীরী রূপ। তাকে আসতে দেওয়া যায় না। কিন্তু হোয়াইট কি করবেন?

ওদিকে মা চিৎকার করছেন। একটা খিল তিনি খুলে ফেলেছেন

হোয়াইটের সহসা মনে পড়ল পায়ের ছাঁচের কাছে তাঁর আরও একটা ইচ্ছা চাইতে বাকি আছে। তিনি ছুটে গিয়ে মেঝে থেকে ছাঁচটা তুলে নিলেন। দ্রুত নিঃশ্বাস পতনের সঙ্গে হোয়াইট শেষ ইচ্ছাটি পূরণ করতে বললেন। বাইরের দরজায় করাঘাত থেমে গেল। বাইরে কেউ নেই।

সত্যিই কি হার্বার্ট এসেছিল ?

চিরঞ্জীব সেন

গত তিন দশক ধরে বাংলার কথাসাহিত্যে সাংবাদিকতা মেশানো সাহিত্যেরও একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। অনেকে এই ধারায় অতি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এনেছেন। এই ক্ষেত্রে ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ-দর্শন বা সমকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রসারও লক্ষ্য করা গেছে বাংলা রচনায়। চিরঞ্জীব সেন এই ধারায় একজন সতত অগ্রগামী লেখক। তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্য সমভাবে চর্চা করে গেছেন। জীবনে অজস্র বই লিখেছেন তিনি। তাঁর রচনায় বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যায়।



একদিন রাত্রে

পূর্ণেন্দু পত্রী

ছোট পরিবার। ছোট্ট ভাড়া বাড়ি। বিয়ের পর কলকাতায় নতুন সংসার। বেলগাছিয়া। বাড়িওয়ালা বিপত্নীক। কঞ্চির মতো লম্বা। বেতের মত শক্ত। এক ছেলে। বাবার ধারে কাছে ঘেঁষে না। বাইরে বাইরে থাকে। বিবাহিতা এক মেয়ে মাঝে মাঝে ছুটে আসে বাবাকে দেখতে। মেয়ে এলে ঝি ছাঁটাই। রোজ সকালে সারাদিনের দেশলাইকাঠি বের করে দেন মেয়েকে। গোণাগুণতি সেই মাপে তেল-নুন, ঝাল-মসলা। সেই মাপে ব্যবহারটাও। ভাড়াটে মাত্রেই লোভী। অন্ততঃ একটা বিষয়ে। সেটা ছাদ। ছাদে উঠে একটু আকাশ দেখা, বাতাস মাখার লোভ! লোভটা আমাদেরও ছিল। বাড়িওয়ালার অনুমতিটা ছিল না। নিষেধটা তালা হয়ে ঝুলত সিঁড়ির দরজায়।

ছেলের নতুন সংসার, নাতির নতুন-ওঠা দাঁতের বাহার দেখতে মা এলেন কিছুদিন পরে দেশ থেকে। শ্রীমানী মার্কেটের একটা এঁদো ঘরে তখন আমার আঁকাজোঁকার কারবার। একটু রাত করে বাড়ি ফিরি। আড্ডায় জড়ালে আরো রাত। একদিন তেমনি রাত করে বাড়ি ফিরছি। শেষ ট্রামে। শহরতলী প্রায় ঘুমন্ত। লম্বা টানা রাস্তাটা বুকের চাপা শোকের মত ফাঁকা আর স্তব্ধ। বড় রাস্তা পেরিয়ে গলির মুখে বাঁকতেই চোখে পড়ল, বাসায় ঢোকার প্যাসেজের মুখে কারা দাঁড়িয়ে। একটু এগোতেই বুঝলাম, ওরা কারা। মা

এবং স্ত্রী। গরম তেলেব ছ্যাঁকা লাগল হঠাৎ মনে। কারও অসুখ হয়তো! কিংবা কোন দুঃসংবাদ?

কাছাকাছি আসতেই প্রথম উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন স্ত্রীব। এত দেরী হল কেন? তারপরেই মায়ের বিপন্ন জিজ্ঞাসা—হ্যাঁরে, তুই কি এখনই ফিরছিস? না কি আগে একবার এসেছিলি? অবাক হলাম প্রশ্ন শুনে। না-তো! আগে আবার আসব কি করে? এই তো আসছি। কেন? কি হয়েছে?

হাতমুখ ধুয়ে ফ্যানের হাওয়ায় গায়ের ঘাম জুড়োতে জুড়োতে অতঃপব যে কাহিনী সেদিন শুনতে হল, তাকে ভুতুড়ে বলে উড়িয়ে দেবার মত সাহস ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সে-কাহিনীর নায়ক যেহেতু আগাপাশতলা আমারই আদলে গড়া, শিরশিরে একটা ভয় শিরায় শিরায় হাঁটতে লাগল সারারাত। কাহিনীটা বলি।

রাত তখন ন'টা। প্যাসেজে আমার স্যাণ্ডেলের আওয়াজ পেয়ে মা জানালা দিয়ে তাকান। তিনি দেখতে পান আমাকে। আমি ঘরে না ঢুকে সোজা চলে যাই বাথরুমের দিকে। দীর্ঘ সময় চলে যায়। বাথরুমের দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তাঁর অধীরতা বাড়ে। বৌমাকে ডাকেন। দু'জনে চার পাশের যেখানে যত সুইচ্ টিপে আলো জ্বালিয়ে খোঁজেন। আমাকে দেখতে পান না অতঃপর শাশুড়ী ও বৌমার মধ্যে সংশয়-বিহ্বল আলোচনা। আপনি ঠিক দেখেছেন তো মা? মা-র উত্তর দ্বিধাহীন। ঠিকই তো দেখলাম বৌমা। মাথা ভর্তি চুল। চোখে চশমা। ও যে-রকম পাঞ্জাবী পায়জামা পরে বেরিয়েছে, সবই তো সেই রকম। তবে পুরো মুখটা দেখতে পাইনি। শুধু চশমাই চোখে পড়েছে। ওরই মত লম্বা। ফর্সা।

খুব একটা জোরদার ঘটনা নয়। তবে প্রতিক্রিয়াটা জোরালো। আর সেই ঘটনার বজ্র-আঁটুনী ফস্‌কা গেরো হল পরের দিন। মেয়েদের মুখ থেকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ছড়িয়েছিল ঘটনাটা। তখনই

প্রতিবেশী পক্ষের একজন ব্যক্ত করলেন অলৌকিকের পিছনে লৌকিক উপকরণটুকু। বাড়িওয়ালার ছোট ছেলে আত্মহত্যা করেছিল ছাদে। হুবহু আমারই মতো বয়েসে। আত্মহত্যার সময় তার পোশাক ছিল পায়জামা, পাঞ্জাবী। চোখে চশমা। মাথায় চুল আমার মত ঝাঁকড়া। সেই সঙ্গে আরও জানা গেল তালা-বন্দী ছাদের ইতিহাস। আমাদের আগে ভাড়াটে ছিল যারা, তারা অনুমতি পেয়েছিল ছাদে ওঠার কিন্তু একদিন রাত্রে ছাদটা কেঁপে উঠেছিল চীৎকারে, আর্তনাদে। ভাড়াটেদের একজন, আমার মায়ের মতোই, একটি যুবক-বয়সী ধপ্‌ধপে ছেলেকে ছাদে হাঁটতে দেখছিল হঠাৎ।

ভাড়াটেরা পালিয়ে যায় দু'-চার দিন বাদেই। কিন্তু ছাদের দরজায় তালা, পরের দিন সকাল থেকেই।

পূর্ণেন্দু পত্রী

বাংলা সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে পূর্ণেন্দু পত্রীর নাম অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনেই এখন ব্যবহৃত। তিনি তাঁর বয়সের তুলনায় অনেক বেশী অভিজ্ঞ এবং বিচিত্রগামী। একাধারে কথাসাহিত্য এবং কবিতা রচনা করেন তিনি। অন্য দিকে ছবি আঁকা এবং চলচ্চিত্র সৃষ্টি। একই সঙ্গে শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের বিবিধ তরঙ্গে পূর্ণেন্দুর সঞ্চরণ রীতিমত বিস্ময়কর। সাহিত্য রচনার শুরুতেই তিনি উপন্যাস লিখে 'মানিক স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন। পরবর্তী-কালে লিখেছেন অজস্র মূল্যবান কবিতা, প্রবন্ধ এবং রম্যরচনা। শিশুদের জন্য উপাদেয় এবং মূল্যবান রচনায়ও তিনি পারদর্শী। সাংবাদিক-সাহিত্যেও তাঁর বিবিধ বিষয়ের রচনা পাঠককে মুগ্ধ করে। পূর্ণেন্দুর সমগ্র সত্তা শিল্পের জন্যই নিবেদিত।



শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সেবার আমার দিদিমা পড়লো ভারী বিপদে।

দাদামশাই রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনও ছোট্ট—ইজের-পরা খুকী। তখন এত সব শহর নগর ছিল না; লোকজনও এত দেখা যেতো না। চারধারে কিছু গাছ-গাছালি, জঙ্গল-টঙ্গল ছিল। সেই রকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দো-মোহানীতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায় সময়েই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনো এক নাগাড়ে তিন-চার কিংবা সাতদিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিন মাত্র বাসায় থাকতেন। ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট ন'জন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলেমেয়েরা সবাই তখন ছোটো ছোটো, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

এমনিতেই দোমোহানী জায়গাটা ভারী সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচু গাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজন বেশি নয়। একধারে রেলের সাহেবদের পাকা কোয়ার্টার, আর অন্যধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা

কোয়ার্টার, একটা স্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ ছিল, যেখানে প্রতি বছর দু'তিনবার কেদার রায় বা টিপুসুলতান নাটক হত। রেলের বাবুরা দল বেঁধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড় সাহেবরা সে খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দল বেঁধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চড়ুইভাতিতেও যাওয়া হত। ছোট আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানী।

দোমোহানীতে যাওয়ার পরেই কিন্তু সেখানকার পুরোনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোরকীপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বলেন, "এ জায়গাটা কিন্তু তেমন ভালো নয় চাটুজ্যে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন হুট্‌হাট্‌ যাকেতাকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না।" কিন্তু আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত গিন্নী এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, "নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ-কান-নাক সব খোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলেপুলেদেরও সামলে রাখবেন। এখানে যারা সব আছে, তারা ভাল নয়।"

দিদিমা ভয় খেয়ে বললেন, "কাদের কথা বলছো দিদি?"

পালিত-গিন্নী শুধু বললেন, "সে আছে, বুঝবেন না।"

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়েই থাকতে লাগলেন।

একদিন হল কী, পুরনো ঝি সুখীয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে, তার ভাসুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। একমাসের ছুটি নিয়ে সুখীয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা আধ-বয়সী বউ এসে বলল, "ঝি" রাখবেন?

দিদিমা দোনোমোনো করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায়-দায়, বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত-

গিন্নী একদিন সকালে এসে বললেন, "নতুন ঝি রাখলেন না কি দিদি? কই দেখি তাকে।"

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত-গিন্নী মুচ্‌কি হাসি হেসে বললেন, "ওদের ও-রকমই ধারা। ঝি-টার নাম কি বলুন তো?"

দিদিমা বললেন, "কমলা।"

পালিত-গিন্নী মাথা নেড়ে বললেন, "চিনি হালদার বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।"

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

পালিত-গিন্নী শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, "সব কি খুলে বলা যায়? এখানে এই হচ্ছে ধারা। কোন্‌টা মানুষ আব কোন্‌টা মানুষ নয় তা চেনা ভারী মুশকিল। এবাব দেখে শুনে একটা মানুষ-ঝি রাখুন।"

এই বলে চলে গেলেন পালিত-গিন্নী, আর দিদিমা আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এলো। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

সে মাথা নিচু করে বলল, "মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড় লজ্জা পাই।"

কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনেব খট্‌কা ভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিস্তব্ধ রাতে মালগাড়ী যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। দাদামশাই ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্ট্‌সম্যান আর অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশনমাষ্টারেরা অনেক সময়ে রাত-বিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে, সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে আমলে এরকম হামেশা হত। সেরকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে,

পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন। পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড় ভালবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাঁট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামায়, মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় ইঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যান কয়লার ঢিবির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাক পেয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন ইঞ্জিন হুইশ্‌ল দিল, গাড়িও ক্যাঁচ কাঁচ করে চলতে সুরু করল। তিনি তো অবাক! ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়বার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে। ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাই পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তার দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে গেল।

বহুকষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছিলেন।

সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসর ভট্টাচার্য চা-বাগানগুলিতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানীতে এসে পৌঁছালেন। তিনি এলেবেলে খেলা দেখাতেন। দড়িকাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার

খেলা। তা দোমোহানীর মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক ভেঙে পড়ল। ভট্টাচার্য স্টেজেব ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন, ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র নয়, আপনারা যদি কৌশল ধবে ফেলেন তাহলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন। কেউ যেন স্টেজে টর্চের আলো ফেলবেন না ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনও শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হঠাৎ হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজী খেল তারপর আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে। প্রথমেই এই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচণ্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশী লিখলেন, আব প্রফেসর ভট্টাচর্য চোখ বাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রফেসর ভট্টাচার্যের এই লেখাটা মোটেই সেরকম হল না। দর্শকেরা কে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে এ ওকে ঠেলছেন,প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচী আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন—চলে আসুন, সঙ্কোচের কিছু নেই, আমি বাঘ ভাল্লুক নই····ইত্যাদি। সে সময় হঠাৎ দেখা গেল, কেউ যাওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা চকের টুক্‌রোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল, এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের উপর লিখতে লাগল, প্রফেসর ভট্টাচার্য ইজ দি বেষ্ট ম্যাজিশিয়ান অব্ দি ওয়ার্লড। এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকেরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো কাঁদো হয়ে চোখ বাঁধা অবস্থার বলতে লাগলেন, কী হয়েছে! অ্যাঁ, কী হয়েছে! এবং তারপর তিনি আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন। কিন্তু তারপরেই দেখা গেল ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তার মুখ থেকে সাপের জিবের মতো আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে

আসছে। পরের তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনো দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হল্‌কা বেরোয়। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল। কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো কাঁদো মুখে চার, পাঁচ, সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হল্‌কা বেরোয়।

তখনকার মফঃস্বল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলা-টেলা দেখাত এলে তাঁকে কিংবা তার দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য আমার মামার বাড়িতে উঠেছিলেন। রাত্রে খেতে বসে দাদামশাই বললেন' "আপনার খেলা গণপতির চেয়েও ভালো। অতি আশ্চর্য খেলা!"

ভট্টাচার্যও বললেন, "হ্যাঁ, অতি আশ্চর্য খেলা। আমিও এরকম আর দেখিনি।"

দাদামশাই অবাক হয়ে বলেন, "সে কী! এতো আপনিই দেখালেন।"

তাঁকে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানীতে। বাসায় পা দিয়েই বললেন,"তোদের ঘর দোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?"

সবাই বলল, "আঁশটে গন্ধ! কৈ আমরা তো পাচ্ছি না।"

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পণ্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, "আলবৎ আঁশটে গন্ধ। সে শুধু তোদের বাসাতেই নয় স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলাম। পুরা এলাকাতেই যেন আঁশটে আঁশটে গন্ধ।"

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এলো না। দিদিমার তখন ভারী মুস্কিল। একা হাতে সব করতে কম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখে শুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন,"এ সব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

সেদিনই বিকেলে স্টেশনমাষ্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললো, "কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমাব শ্বশুর ধার্মিক লোক সে ভালো। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশী করেন, ঠাকুব দেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তা হলে কমলা এ-বাড়িতে থাকে কী করে?"

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন, "এ সব কী কথা বলতো মাসীমা? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?"

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনী নেড়ে দিয়ে বললেন, "ও হরি, তুমি বুঝি জানো না? তাই বলি! তাই বলি বাছা, দোমোহানীর সবাই জানে যে, এ হচ্ছে ও দলেরই রাজত্ব। ঘরে ঘরে সবাই সব ঝি-চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।"

"কারা?" দিদিমা তবু অবাক।

"বুঝবে বাপু, রোসো।" বলে সমাদ্দারেব মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানীতে তখন ঝি-চাকর কিংবা কাজের লোকেব বড় অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোন লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না গিয়ে উপায় নেই —তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেতো, কারো বাসায় ঝি-চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশনমাষ্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, "ওরে কে আছিস?" বলামাত্র একটা ছোকরা মতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, "যা, এটা ডাকে দিয়ে আয়।"

দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটাকে নতুন রেখেছেন না কি?" সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, "না না ফাই ফরমাস খেটে দিয়ে

যায় আব কি ! খুব ভাল ওরা, ডাকলেই আসে। লোক-টোক নয়, ওরা ওরাই।"

মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফর্সা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিহি গলায় মেয়েলী পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না ছেলে। সেবার সিবাজদ্দৌলা নাটকে তিনি লুৎফা, গিরীশ ঘোষের নাটক, কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া চাগিয়ে উঠল, লেপচাপা হয়ে কোঁ-কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে। কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুৎফার অভাব হয়নি। একেবারে ধর্মরাজ মাষ্টাব মশাই-ই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয করে গেলেন। কেউ কিছু টেব পেল না। কিন্তু ভিতরকাব কয়েকজন ঠিকই জানত যে সেদিন ধর্মদাস মাষ্টারমশাই মোটেই স্টেজে নামেন নি, নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, "দেখলেন কেমন কার্যোদ্ধার হযে গেল। একটু খোনাসুরও কেউ টের পায়নি।" দাদামশাই তখন চেপে ধবলেন সমাদ্দারকে, "মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন ?"

সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, "সবই তো বোঝেন মশাই। একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদ্‌ভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।"

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়, তারা বাইরে খেলে বেড়াত, মা আর বড় মাসী তখন কিছু বড় হয়েছে। অন্য মামা-মাসীরা নাবালক নাবালিকা। মার বড় লুডো খেলার নেশা ছিল। মা আর মাসী রোজ দুপুবে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক দিত "আয় রে!" অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সীই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত। মামাদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে, সেই বড় আর মেজো মামা যেত বল খেলতে। দুজো পার্টিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোটো জায়গা তো, বেশী লোকজন ছিল না।

কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত, "কে খেলবি আয়।" অমনি চার পাঁচজন এসে হাজির হত, মামাদের বয়সীই সব ছেলে। খুব খেলা জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কাণ্ড হল একবার। দোমোহানীর ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা-বাগানের টিমের ম্যাচ। চা-বাগান থেকে সাঁওতাল আর আদিবাসী দুর্দান্ত চেহারার খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানীর বাঙালী টিম জুত করতে পারছে না, হঠাৎ দোমোহানীর টিম খুব ভাল খেলা শুরু করল, দুটো গোল শোধ দিয়ে আরো একখানা দিয়েছে, এমন সময়ে চা-বাগান টিমের ক্যাপ্টেন খেলা থামিয়ে রেফারীকে বলল "ওরা বারোজন খেলছে," রেফারী গুণে দেখলেন না, এগারোজনই, ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারীই খেলা থামিয়ে দোমোহানীর ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, 'তোমাদের টিমে চার পাঁচজন একস্ট্রা লোক খেলছে।'

দুর্দান্ত সাহেব রেফারী, সবাই ভয় পায়, দোমোহানীর ক্যাপ্টেন বুক ফুলিয়ে বলল, "গুণে দেখুন।" রেফারী গুণে দেখে আহাম্মক। এগারোজনই।

দোমোহানীর টিম আরো তিনটে গোল দিয়ে দিয়েছে। রেফারী আবার খেলা থামিয়ে রেগে চেঁচিয়ে বললেন, "দেয়ার আর অ্যাট লীসট্ টেন একস্ট্রা মেন-ইন দিস টিম।"

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুণে দেখা যায় এগারোজন, কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিংবা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিল্ পিল্ করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারী দোমোহানীর টিমকে লাইন-আপ করিয়ে সকলের মুখ ভাল করে দেখে বললেন, "শেষ তিনটে গোল যারা করেছে, তারা কই তাদের তো দেখছি না। একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর মোটা, আর একটা ষাঁড়ের মতো তারা কই ?"

দোমোহানীর ক্যাপ্টেন মিন মিন করে সাফাই গাইল তারা

রেফারী আরো রেগে টং। চা-বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাফ্‌সে পড়েছে। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলাব হালচাল দেখে বললেন, "আবার সেই গন্ধ। এখানেও একটা রহস্য আছে, বুঝলে সমাদ্দাব।"

স্টেশন মাষ্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, "ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।"

"কে? কাদের কথা বলছো?"

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়েব বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।" দাদামশাইয়েব বাবা সবই লক্ষ্য করতেন আর বলতেন, "এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বৌমা এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট্ কবে বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুশ্ করে মিলিয়ে যায়। কাল মাঝবাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে ব কেবলমাত্র আপনমনে বলেছি একটু তামাক খাই। অমনি এক কে যেন বলে উঠল, এই যে দাদামশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি। অবা হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসি দিয়ে গেল, এরা সব কারা?"

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাই বেশী উচ্চবাচ্য করেন না। বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বা কেবলই চারধারে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান, আর বলেন, "এ ভা কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তায় ঘ লোকজন কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার ক সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশলপ্রশ্ন করত, কি দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, "রোসো বাপু, আগে তোমাকে ভা দেখি, গায়ের গন্ধ শুঁকি, তারপর কথাবার্তা।" এই বলে তিনি বা

সঙ্গে দেখা হত তাদেব গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন, তা তাঁর দোষ দেওযা যায় না। সেই সময় দোমোহানীতে রাস্তায় ঘাটে বা হাটে-বাজারে যে সব মানুষ দেখা যেত তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। ও নিযে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেবই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারী অদ্ভুত। যেমন বড়মামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারী ভূতের ভয় ছিল। তাঁবও দোষ দেওয়া যায না। এবয়সে কারই বা ভূতের ভয় না থাকে। তাঁর কিছু বেশী ছিল। সন্ধ্যের পর ঘবের বার হতে হলেই ওঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমোহানীতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধ্যেবেলা বসে ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের কাছে ন একা, বাড়ির সবাই পাড়া বেড়াতে গেছে; ঠিক সেই সময়ে ... বাথরুমে যাওয়াব দরকাব হল। মাস্টারমশাইকে তো আর বলতে ...রেন না—আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান তাই বাধ্য হয়ে ভিতর বাড়িতে ...স অন্ধকারকে উদ্দেশ্য কবে বললেন, "এই শুনছিস?"

অমনি একটা সমবয়সী ছেলে এসে দাঁড়াল, "কি বলছো?"

"আমি একটু বাথরুমে যাবো, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি চল তো।"

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি, বলল, "দাঁড়াবো কেন? তোমাব কিসের ভয়?"

বড়মামা ধমক দিয়ে বললেন, "ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না। দাঁড়াতে ...তে ...ড়াবি।"

...টা অবশ্য দাঁড়াল, বড়মামা বাথরুমে কাজ সেরে এলে ছেলেটা ...কিসের ... বললে না?" বড়মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভূতের'। ...টা ...তে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়মামা রেগে ...করে বললেন, "খুব ফাজিল হয়েছো তোমরা ...

...রকম সব হত দোমোহানীতে। কেউ গা করত ...